কৃত্তিবাসী রামায়ণ

।। উত্তরাকাণ্ড ।।

শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী
প্রেসিডেন্সী কলেজ ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালযেব বাংলা বিভাগেব ভূতপূর্ব প্রধান
অধ্যাপক, মুবলীধব গার্লস্ কলেজ ও মহাবাণী কাশীশ্ববী কলেজেব ভূতপূর্ব
অধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয, চট্টগ্রাম কলেজ ও কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালযেব বাংলা বিভাগেব প্রাক্তন অধ্যাপক, কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালযের কমলা লেকচারাব
ও
শ্রীনরেশচন্দ্র জানা এম্ এ পি এইচ্. ডি. ডি লিট্
লেকচারাব, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কর্তৃক সম্পাদিত।

ভারত বুক এজেন্সি
২০৬ বিধান সরণি / চার নম্বর ঘর / দোতালা
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশ করেছেন :
ভারত বুক এজেন্সির পক্ষে
শ্রীমোহিত বসু
২০৬ বিধান সরণি
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৭৮

ছেপেছেন :
গৌরাঙ্গচন্দ্র বেরা
ইজি প্রেস
১৫এ ছিদাম মুদি লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

নিবেদন

কৃত্তিবাস বাঙালীর কবি। তাঁর রামায়ণ বাঙালীর জাতীয় কাব্য। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত আর কোন রচনা বাঙালীর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয় না। অথচ দুঃখের বিষয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনে স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর কোন পর্যায়েই এতাবৎ কৃত্তিবাসী রামায়ণ স্থান পায়নি। কেউ কেউ 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' পাঠ্য করার অসুবিধার উল্লেখ করে থাকেন। এঁদের অভিমত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ যেরূপে পাওয়া যায়, তাতে মূল রচনার ছিঁটে ফোটা আছে কিনা সন্দেহ। যেখানে মূল রচনা লুপ্ত, সেখানে সাত নকলে খাস্তা রচনার পঠন-পাঠন নিরর্থক। কথাটিতে যুক্তি যে নেই, তা নয়। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাস্য, প্রাচীন রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দুটিও তো বহু প্রক্ষেপে পূর্ণ, এমনকি এক যুগের একই লোকের লেখা নয়, তথাপি এদুটির পঠন-পাঠনে কই আমরা তো পরাঙ্মুখ নই। 'উত্তরকাণ্ড' যার অনুসরণে কৃত্তিবাসের উত্তরাকাণ্ড—তা নাকি পুরোটাই প্রক্ষিপ্ত। অথচ এ অংশটুকু বাদ দিয়ে তো রামায়ণ চর্চা করা হয় না। সুতরাং কৃত্তিবাসের অবিকৃত মূল রচনা উদ্ধারের আশা যখন সুদূরপরাহত তখন প্রচলিত রামায়ণ যা মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে এবং জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের পরিমার্জনায় একটি নির্দিষ্ট রূপ পেয়েছে, তাই অবলম্বনে আমরা কবিকৃত্তিবাসের কাব্যরস উপভোগ করি না কেন? এই 'জয়গোপালী কৃত্তিবাস' বটতলায় ছাপা হয়ে হয়ে গত দেড়শ বৎসর ধরে বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌছে গিয়েছে—এখন তারই নাম কৃত্তিবাসী রামায়ণ—তা কৃত্তিবাসেরও যেমন, তেমনি সকল বাঙালীর; "এ যেন বাঙালীর লোকরামায়ণ"। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকেরা, ঢাকার নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি পণ্ডিতরা খাঁটি কৃত্তিবাসী রচনা খুঁজেও উদ্ধার করতে পারেন নি। প্রয়োজনই বা কি? তাছাড়া, প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে একেবারেই খোলনলচে বদলে গেছে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা নিতান্তই একটা মনগড়া ধারণা পোষণ করেন। প্রাপ্ত কৃত্তিবাসের রামায়ণের বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথিগুলির পাঠ মিলালে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ঐক্য দেখা যাবে। এ থেকে মূল রচনা হুবহু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এমনটি মনে হয় না (ভূমিকাতে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি)।

একথা যথার্থ যে, কৃত্তিবাসের মূল রামায়ণ দুষ্প্রাপ্য। প্রাপ্ত বিভিন্ন পুথিতে পাঠের প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। কোন্ পাঠটি সঠিক তা নির্ণয় দুরূহ। তদুপরি প্রাচীন পুঁথিগুলির ন্যায় বিভিন্ন প্রকাশকের দ্বারা মুদ্রিত রামায়ণগুলিতেও প্রচুর পাঠ ভেদ বর্তমান। এমতাবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের যাতে অসুবিধা ও বিভ্রান্তি না হয়, সে কারণে **বহুল প্রচলিত বটতলায় মুদ্রিত রামায়ণ অবলম্বনে সাহিত্যরত্ন শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত শোভন সংস্করণটির পাঠ গৃহীত হয়েছে।** আমরা হুবহু সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত রামায়ণ-এর উত্তরাকাণ্ডের পাঠ মুদ্রিত করেছি। কোন্ পুথির কিংবা কোন্ প্রকাশিত রামায়ণের পাঠ প্রকৃত তা নির্ণয় দুঃসাধ্য বলেই পাঠান্তর সংযোজন অহেতুক জটিলতা বাড়াবে বিবেচনায় আমাদের সম্পাদিত গ্রন্থে কোনরূপ ভিন্ন পাঠ পাদটীকায় কিংবা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হয়নি। শিক্ষণক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও সারস্বত সেবাধিকারের এই ফলটুকু সহৃদয় শিক্ষক ও জিজ্ঞাসু ছাত্রসমাজের হাতে তুলে দিয়ে এর স্বাদগ্রহণের এবং স্বাদুতা বিচারের আমন্ত্রণ জানালাম। ইতি—

'দ্বিপান্বিত', অমাবস্যা
১৩৮৫

শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী
শ্রীনরেশচন্দ্র জানা

ভূমিকা

কবির নাম কৃত্তিবাস, পণ্ডিত তাঁর পরিচয়, কতকটা নামেরই অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভণিতায় ˊ-প্রযুক্ত নাম-পরিচয়ের একটি নিদর্শন, "কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ"। কবির কৌলিক উপাধি ওঝা। কৃত্তিবাস নামটি শিবঠাকুরের। পূর্ণতর তৎসম শব্দটি কৃত্তিবাসস্ (প্রথমান্ত বিভক্তিযুক্ত হয়ে কৃত্তিবাসাঃ)। ব্যুৎপত্তি, কৃত্তি (চর্ম) বাসস্ (পরিধান) যাঁর, বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন নিত্যসমাস-সিদ্ধ শব্দ। কুমারসম্ভব-কাব্যের প্রথম সর্গে কালিদাস বলেছেন, "স কৃত্তিবাসাস্তপসে যতাত্মা"—তপস্যার জন্য আত্ম-নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন দেবতা কৃত্তিবাস। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের প্রারম্ভে নান্দীশ্লোকে কবি দেবতাকে স্মরণ করেছেন এই নামে, "যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ"। ব্যঞ্জনান্ত কৃত্তিবাসস্ শব্দের অন্ত্য স্-কার বাংলায় পরিত্যক্ত হয়েছে।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত—
নাম-পরিচয়

মেঘনাদ-বধের চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভিক বাল্মীকি-প্রণাম-পূর্বক কবিবন্দনায় কোন-কোন সংস্করণে কৃত্তিবাস-নামটির রূপান্তরিত পাঠ 'কীর্তিবাস' পাওয়া যায়। "কীর্তিবাস কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলংকার"। এই পাঠ ধরলে শব্দমন্ত্রের সিদ্ধসাধক কবি-মধুসূদনের শব্দের যাদু, অর্থগৌরব এবং অলংকার-ব্যঞ্জনা অনেকখানি অন্তরালে চলে যায়। আমাদের মনে হয়, কবির অভিপ্রেত পাঠ "কৃত্তিবাস, কীর্তিবাস কবি," অথবা, "কীর্তিবাস কৃত্তিবাস কবি'। পাশাপাশি দুটি প্রয়োগের একটি কৃত্তিবাস, কবির নাম, অপরটি কীর্তিবাস বিধেয় বিশেষণ, যার অর্থগৌরব, অলংকারচাতুর্য এবং ধ্বনিগুণে বিচিত্র, কীর্তিতে বাস বা বসতি যাঁর, কীর্তি বাস বা পরিধেয় বসন যাঁর, এবং কীর্তি বাস বা সৌরভ যাঁর।

কবির প্রায় পাঁচ শতাব্দী পরে, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে, কবির আত্মবিবরণী পাওয়া গিয়েছে। হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি এর আবিষ্কর্তা। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯০১ খৃষ্টাব্দ) এই আত্মবিবরণী প্রকাশ করেন। প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর সংগ্রহে নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই আত্মবিবরণী দেখেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারেও আত্মবিবরণীর পুঁথি সংরক্ষিত হয়েছিল।

কৃত্তিবাসের
আত্মবিবরণী

একই সূত্র থেকে, সংভবতঃ ভক্তিনিধি মহাশয়ের কাছ থেকে এর প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত মনীষিগণ আত্মবিবরণীকে অকৃত্রিম মনে করেছেন। পরবর্তী পণ্ডিতেরা কেউ কেউ এর প্রামাণিকতায় অনাস্থা প্রকাশ করেছেন।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আত্মবিবরণীর ভাষা, বিষয়বস্তু ও বর্ণিত স্থানকালের পরিবেশ পর্যালোচনা করে আমাদেরও মনে হয়েছে, আত্মবিবরণী অকৃত্রিম। একে জাল মনে করবার অনুকূলে অপর পক্ষ গ্রহণযোগ্য যুক্তি দিতে পারেননি, অনুমানাশ্রয়ী স্বাভিমত-প্রীতিই তাতে প্রকাশ পেয়েছে।

আত্মবিবরণীর বিশ্লেষণ ও প্রামাণিকতা-বিচার

আত্মবিবরণী এবং স্ব-রচিত রামায়ণের ভণিতায় প্রায় সর্বত্র কবি স্ব-নামের সঙ্গে পণ্ডিত-শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। মধ্যযুগের বাঙালী কবিরা ব্রাহ্মণ হলে ভণিতাংশে স্ব-নামের সঙ্গে দ্বিজ, এবং অব্রাহ্মণ হলে কৌলিক বা সাম্মানিক উপাধি ব্যবহার করতেন, যেমন দ্বিজ চণ্ডীদাস, দ্বিজ বংশীদাস, বসু রামানন্দ, রায় বসন্ত, কবিকঙ্কণ, কবিরঞ্জন, রায়গুণাকর। কৃত্তিবাসের নামের সহচর পণ্ডিত-শব্দটি কবির পাণ্ডিত্য এবং পাণ্ডিত্য-সচেতন আত্মপ্রত্যয় দুই ই সূচিত করে। কথকের মুখে রামায়ণ শুনে তিনি পয়ার-প্রবন্ধে রামকথা গেঁথেছিলেন, এরূপ অনুমান এর দ্বারা নিরস্ত হয়। কবি সংস্কৃতজ্ঞ, নানা শাস্ত্রে নিষ্ণাত এবং বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণে এবং রামকথাশ্রিত সংস্কৃত সাহিত্যে অধীতী ছিলেন।

আত্মবিবরণী অনুসারে "এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ" তখন কবি বিদ্যাশিক্ষার জন্য বড়গঙ্গার পার গুরুগৃহে যাত্রা করেন। প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণতনয় অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে প্রথম যৌবনেই বহুশাস্ত্রের অনুশীলন ও কাব্যচর্চা করেন—

কবির বিদ্যাভ্যাস এবং বিদ্যাসমাপনান্তে রাজদর্শন

"সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে।।"

গৌড়েশ্বরকে তিনি পাঁচটি শ্লোকের ভেট পাঠিয়ে রাজদর্শনার্থী হয়েছিলেন। "পঞ্চশ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে।" রাজানুচরের 'হাতসানি'তে ত্বরান্বিত হয়ে রাজসান্নিধ্যে গমন এবং 'চারিহাত অন্তরে' অবস্থান করে আমাদের কবি উপস্থিতমতো আরও সাতটি শ্লোক পড়েন। সাকুল্যে দ্বাদশটি শ্লোক নিশ্চয়ই সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হয়েছিল। পয়ার-প্রবন্ধে গাঁথা শ্লোক, কৃত্তিবাসের কালে, বর্ণিত রাজসভার পরিবেশে সমাদৃত হবার সম্ভাবনা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পুরস্কার' কবিতায় অনামা কবিকে স্ব-রচিত সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে স্ব-পরিচায়িত করে রাজসভায় হাজির করেছেন।

মুনিমধ্যে বাল্মীকি এবং পণ্ডিতমধ্যে কৃত্তিবাস অগ্রগণ্য। এমন একটি কবিম্মন্য পাণ্ডিত্যাভিমান কৃত্তিবাসের কবি-ব্যক্তিত্বের অঙ্গীভূত ছিল। এটি অস্বাভাবিক নয়। কারণ মহাপ্রভুর-আনা দৈন্যবিনয়ের হাওয়া তখনও বাঙালীর জীবনে ও সাহিত্যে বইতে শুরু করেনি।

"মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী।"

কৃত্তিবাসের দুশো বছর পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিতে বলেছেন—

"চৈতন্যচরিতামৃত যেইজন শুনে।
তাহার চরণ ধুঞি্য়া করোঁ মুই পানে।।"

কৃত্তিবাস তাঁর আত্ম-সচেতন ভাব নিয়ে পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বরের মহিমা ও বদান্যতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন—

"পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা।।"

কিন্তু পাণ্ডিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত কবি ছিলেন নির্লোভ, অযাচক ও অপ্রতিগ্রহশীল। সেজন্যেও তিনি যথেষ্ট অভিমান পোষণ করতেন। জনাকীর্ণ রাজসভায় 'চন্দনের ছড়ায়' সুবাসিত এবং 'পুষ্পমালে' বিভূষিত হয়ে তিনি কোনও যাচ্ঞা বা দানগ্রহণ করেননি। যদিও,

"পাত্রমিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে।।"

পাণ্ডিত্য ও ব্রাহ্মণ্যের গৌরব সমুন্নত শিরে বহন করে মধ্যযুগের 'দ্বিজরাজ' মহারাজের সভাকে বুঝিয়ে দিলেন—

"কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরবমাত্র সার।।
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে।।"

যে-দেবতাটির নাম কৃত্তিবাস-কবি বহন করতেন, তমোগুণের পরমাশ্রয় সেই দেবতার স্বভাবেরও অংশকলা তাঁর চরিত্রে বর্তেছিল। আত্মাদর, স্বল্পে সন্তুষ্টি, রোষতোষাশ্রিত গুণাবলী শিবকল্প কবির কবিব্যক্তিত্বের বিভূতি রচনা করেছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রৌদ্র, ভয়ানক, অদ্ভুত, বীভৎস প্রভৃতি বিচিত্র রসের স্ফুরণ রামায়ণের সর্বাতিশায়ী করুণ রসের প্রবাহকে কিঞ্চিৎ স্তিমিত করেছিল। সাক্ষাৎ-শিক্ষাগুরুর প্রশংসা করতে গিয়ে কবি তাঁর গৌরব-প্রকাশে 'উম্মাকার' পরিচয়টি তুলে ধরেছেন—

"ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিদ্যা-সমাপন ॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উদ্মাকার।
হেন গুরুব ঠাঁই আমার বিদ্যার উদ্ধার ॥"

কিন্তু এই রুদ্র-প্রচণ্ড উদ্মাকার গুরুও কৃতী শিষ্যের প্রতি স্নেহে প্রশংসায় তরল।

"গুরুস্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥"

এ-কালে আমরা যেমন প্রখ্যাত গুরুর প্রশংসাপত্র পকেটে করে পদ ও পদবী দখল করবার জন্য অভিযান করি, কবি কৃত্তিবাসও তেমন গুরুর প্রশংসা-পাথেয় সম্বল করে সারস্বত অভিযানে ও কবিকর্মে অগ্রসর হয়েছিলেন।

ভাষা-রামায়ণ রচনার প্রবর্তনা কবিকে স্বয়ং 'গৌড়েশ্বর'ই দিয়েছিলেন।

"সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥"

এই গৌড়েশ্বরকে রুকনুদ্দীন বারবক্‌শাহ্‌ বা অপর কোনও মুসলমান শাসক অনুমান করবার পক্ষে তেমন যুক্তি নেই।

কবি আরও বলেছেন,

"বাপমায়ের আশীর্বাদে গুরু আজ্ঞাদান।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান ॥
সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥"

কবির আত্মরতি ও গুরুগৌরবের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁর স্বস্থান এবং স্ব-বংশীয় স্বজন সম্পর্কে গৌরববুদ্ধি। বঙ্গদেশে প্রমাদ উপস্থিত হলে (অনুমান, সম্রাট বলবনের বিরুদ্ধে বাংলার শাসক তুঘ্‌রীল খাঁর বিদ্রোহ) বেদানুজ (যে দানুজে বা দনুজমর্দন?) রাজার পাত্র নরসিংহ ওঝা গঙ্গাতীরে স্থান খুঁজে খুঁজে ফুলিয়া গ্রামে এসে 'চেপে' বসতি করলেন। ফুলিয়া গ্রামখানি পূর্বে মালিজাতির হাতে-গড়া মনোহর মালঞ্চ ছিল।

কবির স্বস্থান ও স্ববংশ

"গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী ॥"

ফুলিয়ায় নরসিংহ ওঝার "ধনধান্য পুত্রপৌত্রে বাড়য়ে সন্ততি"। গর্ভেশ্বর নরসিংহের 'মহাশয়' পুত্র। গর্ভেশ্বরের 'সংসারে বিদিত' সাত পুত্র। জ্যেষ্ঠপুত্র ভৈরব, "রাজসভায় তার অধিক গৌরব"। অন্যতম পুত্র মুরারি,

"জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত"। কবির এই পিতামহ ছিলেন অশেষ গুণালঙ্কৃত, বিদ্যাবদাত, 'সুন্দর মূরতি' এবং 'মদরহিত'।

"মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্মচর্চায় রত মহান্ত যে মানী ॥
মদরহিত ওঝা সুন্দর মূরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি।"

পিতামহের 'মদরহিত' চরিত্র আত্মাভিমানী কবির বিশেষ শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের বিষয় ছিল। মুরারি সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে, "বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার"। এই সুখ, স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তার বর্ণনার সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি আমাদের বিশেষ বিবেচ্য, "দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার"। তুর্কী-আক্রমণোত্তর দ্রুত-বর্ধমান ইসলাম-প্রভাবিত গৌড়বঙ্গে এই উক্তি কি কোনও ব্রাহ্মণাধিপতির সংকেত বহন করে না ?

"কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঁই প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে ॥"

প্রাক্-চৈতন্য যুগে 'গোসাঁই'-শব্দটি ঈশ্বরার্থে ব্যবহৃত হত। 'ঠাকুরাল' বা 'ঠাকুরালি' শব্দ ঠাকুরের ভাব বা ব্রাহ্মণোচিত গুণ এবং প্রভুত্ব দুই-ই বুঝাত। মুরারি-পুত্র বনমালী কৃত্তিবাসের পিতা। মাতা মালিনী, "মাতা পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি"। কবির "ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী।" 'গুণশালী' ছয় ভাইয়ের মধ্যে "ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড়্-উপবাস", "ভাই শ্রীধর নিত্য উপবাসী"। এ-কালে রাজনৈতিক কারণে অনশন-সত্যাগ্রহ আরম্ভ হবার ছ-শো বছর আগে কৃত্তিবাসের পুণ্যকামী সহোদরগণ উপবাসের কৃচ্ছ্রবরণে পরমাগ্রহী ছিলেন। কবির অপরাপর সহোদর "সহোদর শান্তিমাধব সর্বলোকে ঘুষি," "বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর"। সহোদরদের কথা বলেই কবি ক্ষান্ত হননি। মুখটি বংশের জ্ঞাতিগোত্র, সূর্যপণ্ডিত, তাঁর পুত্র বিভাকর, যিনি "সর্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত বাপের সোসর"। সূর্যপুত্র নিশাপতি, যাঁর "বড় ঠাকুরাল", "সহস্র-সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাঁহার", যাঁকে "রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া। পাত্রমিত্র সকলে দিলেন খাসাজোড়া" ॥ আরও ছিলেন,

"গোবিন্দ জয়আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাহার কোঙর ॥
ভৈরবসুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্যন্ত কীর্তি ঘোষয়ে যাঁহার।
মুখটী বংশের পদ্ম শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জন শিখে যাঁহার আচার ॥"

স্ববংশের মুখ্য ব্যক্তিদের নামপরিচয় 'বাখানি' কবি পাঁচালী-ছন্দে গাঁথা কুলপ্রশস্তি শেষ করেছেন।

"কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্যগুণে।
মুখটী বংশের যশ জগতে বাখানে।।"

মুখটী সন্তানগণের সদাচার, বিদ্যা, বিনয়, প্রতিষ্ঠা, উপবাসাদি তপস্যা, তীর্থযোগ প্রভৃতি গুণাবলীর কবিপ্রদত্ত বর্ণনা পড়তে গিয়ে আমাদের অনিবার্যভাবে কৌলীন্য-জ্ঞাপক পারিভাষিক শ্লোকটি মনে এসে যায়—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্।।"

সমগ্র আত্মবিবরণীতে উল্লিখিত নামগুলি এবং সভা-পরিবেশের বর্ণনা থেকে মনে হয়, গৌড়েশ্বরের সভা ছিল হিন্দু রাজসভা, মুসলমান দরবার নয়। 'রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে' পাণ্ডিত্য-সচেতন এবং আচার-পরায়ণ এই ব্রাহ্মণতনয় রাজসভার সমাশ্রয় চেয়েছিলেন। সংস্কৃত শ্লোকের ভেটও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-শোভিত হিন্দু রাজসভাকে সূচিত করে। দ্বারী থেকে পাত্রমিত্র সকলের নাম এবং আচার-আচরণ ততখানি ইসলামীয় আদব-কায়দার নয়, যতখানি হিন্দুয়ানি ধরণধারণের পরিচায়ক। 'সপ্তঘটি বেলা'য় গৌড়েশ্বর সভাসীন হবার আগেই এত্তেলা দিয়ে 'রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি' কবি প্রতীক্ষারত ছিলেন। 'সুবর্ণ লাঠি হাতে' দ্বারী 'শীঘ্র ধাই' হাঁক দিল—

"কার নাম ফুলিয়ার মুখটী কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ।।"

রাজদর্শনার্থী কবি নয়টি দেউড়ি পার হয়ে রাজদর্শনে নেত্রসুখ অনুভব করলেন। "সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে।"

রাজার ডাহিনে পাত্র জগদানন্দ, তাঁর পাশে 'ব্রাহ্মণ সুনন্দ'। বামেতে কেদার খাঁ (খাঁ-উপাধিধারী সম্ভবতঃ রাজার স্বশ্রেণীর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ), ডাহিনে নারায়ণ। কবির প্রবেশ-মুহূর্তে পাত্রমিত্র নিয়ে গৌড়েশ্বর 'পরিহাসে মন' দিয়েছেন। সভাতে আরও বিরাজমান ছিলেন গন্ধর্ব রায় (রায় উপাধি, রাজ-শব্দের অপভ্রংশ, প্রথমে ছিল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের, পরে সার্বজনিক কৌলিক উপাধি হয়ে উঠেছে)। গান্ধর্ব রায়ের পরিচয়, "রাজসভায় পুজিত তিঁহ গৌরব অপার"। রাজসভার প্রায় একটি চলমান চিত্র কবি দিয়েছেন।

"ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্মাধিকারিণী।।
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর।।

রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
চারিদিকে নাট্যগীত সর্বলোকে হাসে।
চারিদিকে ধাওয়াধাই রাজার আওয়াসে ॥''

আঙিনায় 'রাঙা মাজুরি' বিছানো, উপরে 'নেতের পাছুড়ি', মাথার উপরে 'পাটের চাঁদোয়া'। এ-হেন সভায় ''মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর''। কবির জন্ম এবং রাজদর্শন দুই-ই পুণ্য মাঘ মাসে। 'রাজা', 'গৌড়েশ্বর' এবং 'রাজা গৌড়েশ্বর' এই তিন ভাবে কবি পৃষ্ঠপোষকের উল্লেখ করেছেন।

রাজসভায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা কবি-কর্তৃক 'নানা ছন্দে রসাল' শ্লোকপাঠ, কবির পুষ্পমাল্য লাভ এবং রাজ-পারিষদ কেদার খাঁ কর্তৃক তাঁর শিরে চন্দনের ছড়াবর্ষণ। এই সবিস্তার সভাপরিবেশ ও ঘটনাবিবৃতির মধ্যে অনুক্তনামা রাজা গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীন বারবক্ শাহ্, না, রাজা গণেশ? এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগুরু আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মতে মধ্যযুগে ভাষা-সাহিত্যের স্বীকৃতি এবং বাংলাভাষার দ্রুত প্রসারের মূলে মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রধান কারণ হিসাবে কাজ করেছিল। হিন্দুর সারস্বত জগতে এই নূতন আবহসঞ্চার নাকি অ-বাঞ্ছিত ছিল। এর সমর্থনে ''কৃত্তিবেসে কাশীদেসে আর বামুনঘেঁষে, এ তিন সর্বনেশে'' এই ছড়াটি এবং একটি সংস্কৃত শ্লোকের তিনি উদ্ধার করেছেন—

''অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥''

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-গ্রন্থের অষ্টম সংস্করণ, ৭৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন ''মুসলমান সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্যই বাজদ্বারে দীনহীনা বঙ্গভাষার প্রথম আহ্বান পড়িয়াছিল। গৌড়েশ্বর যে-ভাষাকে উৎসাহপ্রদান করিলেন, হিন্দু রাজগণ তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না।'' বাংলা ভাষায় প্রথম ভাগবত-পাঁচালীকার মালাধর বসু এবং ভাষা-মহাভারতের রচয়িতা পরমেশ্বর মুসলমান শাসনকর্তাদের নিকট থেকে যথাক্রমে গুণরাজ খাঁ ও কবীন্দ্র উপাধিলাভ করেছিলেন, এ-কথা সত্য। কিন্তু কৃত্তিবাস তার আগেই রামগুণগান করে রামায়ণ প্রচার করেন। পূর্ববর্তী পাল ও সেন রাজগণের সময়ে এবং হয়ত তারও পূর্বে গৌড়বঙ্গে রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতশাস্ত্রের প্রচার ছিল। বাঙালী 'কলিকাল-বাল্মীকি' সন্ধ্যাকর নন্দী ও গৌড় অভিনন্দের রামচরিত সংস্কৃত ভাষায়

রচিত হলেও বাঙালীর রসানুভূতির পরিপুষ্টি সাধন করেছিল। বাঙালী ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটক রচনা এবং তাতে দ্রৌপদীর মহিমময়ী ক্ষাত্র নারীমূর্তির নাট্যরূপায়ণ এ-দেশে দীর্ঘকালের মহাভারতানুশীলনেব সাক্ষ্য বহন করে। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এবং অধুনা-বিস্মৃত 'গৌড়ের ইতিহাস'গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১৩৬ পৃষ্ঠায় রজনীকান্ত চক্রবর্তী মদনপালদেবের (১১১৫-১১৩০ খৃীঃ) তাম্রশাসনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছিলেন, "রাজমহিষী চিত্রমতিকা দেবী বটেশ্বর স্বামি নামক ব্রাহ্মণকে মহাভারত পাঠে নিযুক্ত করেন। মহাভারত-পাঠের দক্ষিণাস্বরূপ ইহা প্রদত্ত হয়। 'ভগবন্তম্ বুদ্ধ ভট্টারকমুদ্দিশ্য' অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধদেব প্রীত হইবেন মনে করিয়া রাজা মহাভারত-পাঠককে দক্ষিণাদান করেন। ইহা হইতে প্রতীতি হইতেছে যে, এই সময়ে রাজসংসার হইতে হিন্দু ও বৌদ্ধের পার্থক্য তিরোহিত হইয়াছিল।" গৌড়ের ইতিহাসে প্রদত্ত এই তথ্য এ-কালের সুধীও ব্যবহার করেছেন।

জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস প্রাচ্য ভারতে ভাগবত-প্রচলনের সাক্ষ্য বহন করেন। সুতরাং মুসলমান-পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান প্রভাবের যুগে হিন্দুর জাতীয় সংহতিরক্ষার জন্য রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবত প্রচার হয়েছিল, এটি একটি অর্ধসত্য বলে মনে হয়। কারণ, মুসলমানাধিকার এবং মুসলমান শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রসারের নিমিত্ত-কারণ নয়, এটি অনুষঙ্গী ব্যাপার। পূর্বাপর পাল ও সেন রাজন্যবৃন্দের উৎসাহ ও প্রেরণায় শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রচারের লোকায়ত প্রয়াসের ক্রীড়াকন্দুকটি গড়িয়ে গড়িয়ে চলে আসছিল, ক'জন মাত্র উদারচেতা বিদ্যোৎসাহী মুসলমান শাসক তাতে নতুন গতিবেগের সঞ্চার করেন। কৃত্তিবাসের 'লোক বুঝাবার তরে' পরিকল্পনার উপর গীতার 'লোকসংগ্রহ'এর ছায়াপাত হয়ে থাকতে পারে। এই আদর্শের আনুগত্যে এবং রাজাদেশে পণ্ডিত-কবি কৃত্তিবাস সংস্কৃতানভিজ্ঞ স্বজাতীয়দের মধ্যে ভাষা-রামায়ণ প্রচার করেন। মধ্যযুগের হিন্দুসামন্ত রাজাদের উৎসাহে ও আনুকূল্যে বহু হিন্দুকবি রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণেতিহাস-সংক্রান্ত কাব্য রচনা করেন।

আত্মবিবরণীর সন-তারিখ

এইবার আত্মবিবরণীতে প্রাপ্ত সনতারিখ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে হয়। এ-দেশের প্রাচীন কবিরা সোজাসুজি গ্রন্থরচনার সনতারিখ উল্লেখ করা পরিহার করে চলেছেন। পিছনের দিক থেকে পেঁচিয়ে নাক দেখাবার মতো তাঁরা যে-ভাবে সন-তারিখের সংকেত দিয়েছেন হেঁয়ালির মতো, তার সত্যোদ্ধার করতে গেলে গাণিতিক, জ্যোতিষিক ও আভিধানিক বিশারদ হতে হয়। ফুলিয়ার পণ্ডিত-কবি আত্ম-সংক্রান্ত অনেক কথা বলে এখানে এসে বক্রপন্থা অনুসরণ করে বলেছেন—

"আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।।"

এই কুহেলীময় উক্তি থেকে তথ্য পাওয়া গেল, কবিজন্মের দিন মাঘ মাস, রবিবার, শুক্লা পঞ্চমী তিথি, সরস্বতী পূজা এবং সংক্রান্তি অর্থাৎ মাঘমাসের শেষ দিন। সব আছে, নেই শুধু সনটি। এরূপ যোগাযোগ কখন হয়েছিল, জ্যোতিষিক গণনার সাহায্যে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সে-সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করেন, ১৪৩২ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে মাঘ, রবিবার কৃত্তিবাসের জন্মদিন। রাজা গণেশের রাজ্যকাল ১৪১৪-১৪১৮ খ্রীস্টাব্দ। এই গণনায় ব্রাহ্মণ নরপতির সঙ্গে কৃত্তিবাসকে যুক্ত করা যায় না। 'পূর্ণ' মাঘ মাসের পরিবর্তে 'পুণ্য' মাঘ মাস ধরে পুনর্বিচার করা হয়। মাঘ মাসটি পুণ্য মাস, কারণ এই মাসে বহু পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান হয়। সুতরাং পুণ্য মাঘ মাস পাঠই অধিকতর রীতিসম্মত। তাই মাঘী সংক্রান্তির তথ্যটি বাদ দিয়ে অপর তথ্যগুলির সমাবেশে গণনায় পাওয়া গেল ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দ। এই বৎসর জন্ম নিলে কবির রাজা গণেশের সভায় উপস্থিতি এবং প্রায় বিশ বছর বয়সের কাছাকাছি সময়ে পাঠসমাপ্তির সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হয়। ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দে দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন করেন। কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে মালাধর খানী মেল এবং পিতৃব্যপুত্র লক্ষ্মীধরের পৌত্র অর্থাৎ কবির ভ্রাতুষ্পৌত্র গঙ্গানন্দের নামে ফুলিয়া মেল প্রবর্তিত হয়। তাঁরা দুজন নিশ্চয়ই সামাজিক প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং কবি সম্ভবতঃ তখন লোকান্তরিত হয়েছিলেন। তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর তখন বয়স হ'ত আশির উপরে এবং নিঃসংশয়ে কুলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে তাঁকে নিয়েই মেলবন্ধন হ'ত। ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে রচিত ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশে "কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্ সাম্যশান্তিজনপ্রিয়ঃ" এবং তাঁর সহোদরেরা উল্লিখিত হয়েছেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, বিদ্যানিধি যোগেশচন্দ্র রায়, প্রত্নতত্ত্ববিশারদ নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ নিয়ে বিচার ও আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার গহনে প্রবেশ করবার কতকটা দুঃসাধ্য অধ্যবসায় থেকে আমরা বিরত হলাম।

আমাদের মনে রাখতে হবে, মহাপ্রভুর আবির্ভাব ১৪০৭ শকাব্দের অর্থাৎ ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে

কৃত্তিবাসের রামনাম ও মহাপ্রভুর কৃষ্ণনাম— দুইয়ের সম্পর্ক

কৃত্তিবাসের জন্ম মহাপ্রভুর ৮৮ বৎসর পূর্বে। পবিত্র পঞ্চদশ শতাব্দীর বহুলাংশ ধরে কৃত্তিবাস রামনাম গান করে মহাপ্রভুর ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর কীর্তনের আসর প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ এক হিসাবে মহাপ্রভুর আগমনী

গান। রামনামের সঙ্গে হরি ও কৃষ্ণ দুটি নাম যোগ করে মহাপ্রভু নামাক্ষরের রহস্যমধুর বিচিত্র সমাবেশে নামমালা গেঁথে গিয়েছেন—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

হরিনাম ৮ বার + রামনাম ৪ বার + কৃষ্ণনাম ৪ বার = ১৬ নাম, বত্রিশ অক্ষর। মহাপ্রভুর পূর্বে জয়দেব ও বিদ্যাপতি 'মাধবনাম', পদকর্তা চণ্ডীদাস 'শ্যামনাম' এবং কৃত্তিবাস 'রামনাম' গান করেছেন। আমাদের কালে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন কবি-মধুসূদন 'কৃত্তিবাস'-শীর্ষক 'চতুর্দশপদী'তে বলেছেন—

"গাওগো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি॥"

'হরিনামমূর্তি' মহাপ্রভু নিত্যাকর্ষক পরতত্ত্ব-বাচক কৃষ্ণ নামটির উপর জোর দিয়েছেন—

"কৃষি ভূর্বাচকঃ শব্দঃ ণশ্চ নিবৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

কালিদাসের কাব্যে কৃষ্ণ ও বিষ্ণু সমার্থক, ভগবৎ-সত্তার নামভেদরূপে পাওয়া যায়। মেঘদূতে পাই, 'বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ' (গোপ-বেশধারী বিষ্ণুর, অর্থাৎ কৃষ্ণের, চূড়াশোভী ময়ূরপুচ্ছের ন্যায়), এবং কুমারসম্ভবে আছে, 'ব্যাদিশ্যতে ভূধরতামবেক্ষ্য কৃষ্ণেন দেহোদ্বহনায় শেষঃ।' (তৃতীয় সর্গ, ১৩শ শ্লোক)—অর্থাৎ অনন্তনাগের পৃথিবী ধারণের ক্ষমতা দেখে কৃষ্ণ (বিষ্ণু) তাঁকে ক্ষীরাব্ধি-শয়নকালে স্বদেহ-বহনের আদেশ দিয়েছিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণে উত্তরাকাণ্ডে রাবণ কর্তৃক যমপুরী আক্রমণের বৃত্তান্তে পাওয়া যায়—

"করেছে বিষ্ণু কীর্তন যেবা নিরন্তর।
তাঁহার সম্পদ দেখি হৃষ্ট লঙ্কেশ্বর॥"

প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কৃত্তিবাস বিষ্ণুকীর্তনরত পুণ্যাত্মার সম্পদ বর্ণনা করেছেন, চৈতন্যোত্তর যুগে হরিভক্তি-বিলাস-কার কৃষ্ণনাম-কীর্তনের মহিমা কীর্তন করেছেন—

"মধুরমধুরমেতন্ মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী-সৎফলম্ চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

ভগবদ্বাচক নামমালার সুচিরশ্রুত অনুচ্চ জপনিঃস্বন বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দ-মঠের উদাত্ত সন্ন্যাসি-কণ্ঠে শুনিয়েছিলেন। 'কৃষ্ণবিষ্ণু' সমার্থক দুটি নামই সেখানে পরতত্ত্ব-বাচক—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণবিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥"

বাল্মীকি-রামায়ণের প্রারম্ভে বালকাণ্ডে প্রথম দুটি সর্গে ব্রহ্মা ও নারদ-কর্তৃক বাল্মীকিকে রামায়ণ রচনার উপদেশ প্রদান বর্ণিত হয়েছে। কৃত্তিবাস রাম-নামের মাহাত্ম্যে দস্যু রত্নাকরের ঋষি বাল্মীকিতে পরিণতির কাহিনী দিয়ে কাব্য আরম্ভ করেছেন। মধুসূদন মেঘনাদবধের প্রারম্ভিক বাণী-বন্দনায় আর্ষ রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের দুটি কাহিনীর চমৎকারিতাকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন—

"যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন),
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা।
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি।
হে বরদে, তব বরে চোর-রত্নাকর
কাব্য-রত্নাকর কবি।"

রত্নাকরের কাহিনীর জন্য কৃত্তিবাস সম্ভবতঃ অধ্যাত্ম-রামায়ণের নিকট ঋণী। কিন্তু বারংবার মরা-মরা-মরা-মরা জপে, বর্ণবিপর্যয়ে রামনাম গ্রহণের ফললাভ বাঙালী কবির স্বানুভব-লব্ধ। এইখানেই কৃত্তিবাসের সঙ্গে মহাপ্রভুর নামপ্রেম-ধর্মের সম্পর্ক। এ-বিষয়ে ক্রমশঃ আরও আলোচনা করা যাবে। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর সমগ্র রূপটি এখানে দেওয়া হল—

পূর্বেতে আছিল যে দনুজ মহারাজা।
তার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা ॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর ॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে ॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হৈল ওঝা শুতিল তথায় ॥
পোহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি ॥

কুঁকড়ার ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়।
হেনকালে আকাশবাণী শুনিবারে পায়॥
মালী জাতি ছিল পূর্বে মালঞ্চ এ থানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাহার বসতি।
ধনধান্যে পুত্রপৌত্র বাড়য়ে সন্ততি॥
গর্ভেশ্বর নাম পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি সূর্য গোবিন্দ তাঁহার তনয়॥
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তাঁর অধিক গৌরব॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্মচর্চায় রত মহান্ত যে মানী॥
মদরহিত ওঝা সুন্দর মূরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি॥
সুশীল ভগবান্ তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী॥
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোঁসাই প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে॥
মাতা পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস॥
সহোদর শান্তিমাধব সর্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিন হৈল সতাই উদর॥
মালিনী নামেতে মাতা পিতা বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥

আপনার জন্মকথা কহিব যে পাছে ।
মুখটী বংশের কথা আরো কৈতে আছে ।।
সূর্য পণ্ডিতের পুত্র হৈল নাম বিভাকর ।
সর্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত বাপের সোসর ।।
সূর্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল ।
সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার ।।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া ।
পাত্রমিত্র সকলে দিলেন খাসাজোড়া ।।
গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর ।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাহার কোঙর ।।
ভৈরবসুত গজপতি বড় ঠাকুরাল ।
বারাণসী পর্যন্ত কীর্তি ঘোষয়ে যাঁহার ।।
মুখটী বংশের পদ্ম শাস্ত্র অবতার ।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে যাঁহার আচার ।।
কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্যগুণে ।
মুখটী বংশের যশ জগতে বাখানে ।।
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস ।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ।।
শুভক্ষণে গর্ভ হৈতে পড়িনু ভূতলে ।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা লৈলা কোলে ।।
দক্ষিণে যাইতে পিতামহের উল্লাস ।
কৃত্তিবাস করি নাম করিলা প্রকাশ ।।
এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ।।
বৃহস্পতিবারে ঊষা পোহালে শুক্রবার ।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গাপার ।।
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার ।
যথা তথা যাই তথা বিদ্যার বিচার ।।
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে ।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে ।।
বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন ।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন ।।

ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিদ্যা সমাপন॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উষ্মাকার।
হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিদ্যার উদ্ধার॥
গুরুস্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে॥
রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চশ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে॥
দ্বারিহস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥
সপ্তঘটী বেলা যথা দেওয়ালে পড়ে কাঠি।
শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠি॥
কার নাম ফুলিয়ার মুখটী কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ॥
নয় দেউটী পার হৈয়া গেলাম দরবারে।
সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে॥
রাজার ডাইনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাশে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥
গন্ধর্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজপাশে।
পাত্রমিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে॥

চারিদিকে নাট্যগীত সর্বলোক হাসে ।
চারিদিকে ধাওয়াধাই রাজার আওয়াসে ।।
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি ।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি ।।
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর ।
মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর ।।
দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজা বিদ্যমানে ।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাতসানে ।।
রাজ আদেশ কৈল পাত্র ডাকি উচ্চৈঃস্বরে ।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে ।।
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাতচারি অন্তরে ।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে ।।
পঞ্চ দেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে ।
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে ।।
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায় ।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় ।।
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল ।
খুসি হৈয়া মহারাজ দিল পুষ্পমাল ।।
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া ।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া ।।
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান ।
পাত্রমিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান ।।
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা ।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ।।
পাত্রমিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে ।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে ।।
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার ।
যথা যাই তথায় গৌরবমাত্র সার ।।
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে ।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ।।
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক ।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ।।

প্রসাদ পাইয়া বাহির হৈলাম সত্বরে।
অপূর্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে ।।
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ।।
মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী ।।
বাপ মায়ের আশীর্বাদে গুরু আজ্ঞাদান।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ডগান ।।
সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ।।
রঘুবংশের কীর্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতী বরে ।।

ভারতীয় জীবনাদর্শের ও ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির যদি কোনও অন্যত্র-দুর্লভ বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে তার অনেকখানি এদেশের দুটি মহাকথাকে আশ্রয় করে। পুরাতন ও সুমহতী সেই দুটি কথা রামকথা ও কৃষ্ণকথা। এদেশের সুচিরাগত সংস্কার, এই দুই বিস্ময়কর কাব্যকথা ইতিহাস-কথা নিয়ে গড়ে উঠেছে। মহাকাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আলঙ্কারিক বলেছেন "ইতিহাস-কথোদ্ভূতম্ ইতরম্বা সদাশ্রয়ম্।" মহাকাব্য ইতিহাসকথা হতে উদ্ভূত অথবা সজ্জনাশ্রয়। রামায়ণ মহাভারতকে সাধারণভাবে মহাকাব্য বলা হয়, রামায়ণ মহাভারতের যুগকে পাশ্চাত্ত্য ভারতেতিহাস-রচয়িতারা এপিক যুগ বলেছেন। রামায়ণ আদি-কবি বাল্মীকির রচনা, মহাভারতের সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের নাম গ্রথিত। রামায়ণ-মহাভারত আশ্রয় করে সংস্কৃত সাহিত্যের অধিকাংশ কবির প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছে, উৎকৃষ্ট কাব্যনাটক রচিত হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারতের পরবর্তী বুদ্ধকথাকে নিয়ে বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ কাব্য সংস্কৃতে রচিত হয়েছে, যদিও বুদ্ধকথার অধিকাংশই প্রাকৃত-পালিসাহিত্যে গ্রথিত। ভগবান তথাগতের নাকি অনুশাসন ছিল, "ন বুদ্ধবচনং ছন্দসো আরোপেতব্বম্।"

রামায়ণের প্রাচীনতা ও মৌলিকতা

আগে রামকথা, পরে কৃষ্ণকথা, দু'টি কথার ঐতিহাসিক পারম্পর্য সম্বন্ধে, এইটিই এদেশের মজ্জাগত এবং ঐতিহ্যাগতসংস্কার। এই দুই কথা যখন ভাগবতী লীলার পর্যায়ে ঊর্ধ্বায়িত হয়েছে, তখনও এই সংস্কার কাজ করেছে, রামলীলা পূর্ণ, কৃষ্ণলীলা পূর্ণতর। গীতায় দশম বিভূতিযোগ-অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণোক্তি রয়েছে, "রামঃ শস্ত্রভৃতাম্ অহম্," আমি শস্ত্রধারীদের মধ্যে রাম। এই রাম রাবণবিজয়ী দাশরথি রাম। জয়দেবের দশাবতার বন্দনাতেও

আগে 'পৌলস্ত্যং জয়তে', পরে 'হলং কলয়তে'। আগে পৌলস্ত্য-বিজয়ী রাম, পরে হলধর কৃষ্ণাগ্রজ রাম। পদ্মপুরাণের অন্তর্গত মথুরা-মাহাত্ম্যেও আগে অযোধ্যা, পরে মথুরা—"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।"

সম্প্রতি এদেশের অগ্রগণ্য ভারততত্ত্ববিদ্ রামায়ণ-সম্পর্কে কতকগুলি সংশয়াত্মক সিদ্ধান্ত প্রচার করেছেন। পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকেরা পূর্বেই রামায়ণের মৌলিকতা, ঐতিহাসিকতা ও ঐতিহাসিক কালক্রম নিয়ে এই-জাতীয় অভিমত প্রকাশ করে গিয়েছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে সংক্ষেপে সেগুলির উল্লেখ ও কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ বলা হয়েছে, রামকথা বুদ্ধোত্তর যুগের, হোমারের গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াডের ব্রাহ্মণ্য অনুকরণ। একই সঙ্গে বলা হয়েছে, দশরথ-জাতকের সংক্ষিপ্ত রামকথার পল্লবিত বর্ণাশ্রমী অনুকরণ বাল্মীকি-রামায়ণ। তার সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণভারতের নানা কথার জোড়াতালি দিয়ে বাল্মীকি-রামায়ণ রূপ নিয়েছিল। সুমাত্রা যবদ্বীপ বলিদ্বীপ ও ভারতমহাসাগরের অপরাপর দ্বীপপুঞ্জে ও উপদ্বীপে রামকথার নানা বিকৃত রূপ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, আগে মহাভারত পরে রামায়ণ। কারণ মহাভারতে এক স্ত্রীর বহু পতি, বাহুপত্য (polyandry), রামায়ণে এক পতির বহুপত্নী, বাহুপত্ন্য (polygamy)। সামাজিক প্রথা মহাভারতে বর্বর-তর এবং প্রাচীনতর। তৃতীয়তঃ, রামচন্দ্র অবতার-জাতীয় কিছুই নন, বাল্মীকি-রামায়ণে রামচন্দ্র মানুষ, দেবতা নন। পরে পরে তিনি দেবতা, অবতার ও বৈষ্ণবীয় ভক্তির বিষয় হয়ে উঠেছেন।

রামায়ণের মৌলিকতা সম্পর্কে এ-কালের সংশয়—গ্রীক ও বৌদ্ধ প্রভাব-কল্পনা

মনীষীদের প্রচারিত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পক্ষে আমাদের যে সমস্ত অসুবিধা আছে তা নিয়ে কিছু আলোচনা অবশ্য-কর্তব্য। প্রথমতঃ, রামায়ণ মৌলিক ও ভারতোত্থ (autochthonous in India), না গ্রীক-প্রভাবজাত, এই বিষয়টি দেখা যেতে পারে। ভারতের ইতিহাস-বিদিত গ্রীক-সম্পর্ক খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণের সময়ে ঘটে। এর পরেই চন্দ্রগুপ্ত-কর্তৃক মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস-কর্তৃক ভারত-বিবরণী প্রণয়ন এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের রচনা। ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাব, তারও দুশো বছর আগে, খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। জাতকগুলির সংকলন তার পরে বৌদ্ধসঙ্গীতিতে হয়েছিল বলে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে গ্রীক প্রভাব ও বৌদ্ধপ্রভাব কিভাবে বাল্মীকি রামায়ণের মূল হতে পারে? একটি সিদ্ধান্ত অপরটিকে খণ্ডন করে না কি?

ট্রয়ের কনিষ্ঠ রাজপুত্র প্যারিস-কর্তৃক মেনেলাস-পত্নী পরমা সুন্দরী হেলেনের অপহরণের এবং গ্রীকবীরবৃন্দ কর্তৃক ট্রয়ের অবরোধ এবং ট্রয় ধ্বংসের সঙ্গে রাবণের সীতাহরণ, বানরসৈন্য-সহায় রামচন্দ্র.কর্তৃক লঙ্কার অবরোধ ও লঙ্কাধ্বংসের আখ্যানগত সাদৃশ্য থাকতে পারে। কিন্তু দুই দেশের এই দুই বিশাল মহাকাব্যের আর কোনও সাধারণ বৈশিষ্ট্য নেই। গ্রীক প্রভাব সম্পর্কে ভিণ্টারনিজ তাঁর 'Indian Literature' গ্রন্থের ৫১৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'And it is quite out of the question that, as was once suggested by Weber, the Homeric poems should have had any sort of influence on Valmiki's composition. There is not even a remote similarity between the stealing of Sita and the rape of Helen and between the advance on Lanka and that on Troy''—"ওয়েবার এক সময় বাল্মীকির রচনার উপর হোমরীয় কবিতার প্রভাবের বিষয়ে যা বলেছিলেনঃ সে প্রশ্ন ওঠেই না। সীতা ও হেলেনের অপহরণ এবং লঙ্কা ও ট্রয় অবরোধের মধ্যে সুদূর সাদৃশ্যও নেই।" শুধু তাই নয়, আমরা বলব, সীতা ও হেলেন দু'টি চরিত্রের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমরা গ্রীক শিখিনি। কিন্তু রামায়ণ ও মধুসূদন প্রসঙ্গে ইলিয়াডের নির্ভরযোগ্য ইংরাজি অনুবাদ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। সেখানে রামায়ণের সঙ্গে ইলিয়াডের কাহিনী ও চরিত্রগত এমন সাদৃশ্য পাইনি যাতে রামায়ণকে ইলিয়াডের অনুকরণ বলা যায়। ইলিয়াডের Book III (A Truce and Duel) অধ্যায় থেকে স্বল্পাংশ উদ্ধার করি। ট্রয়.রাজপ্রাসাদে আনীতা হেলেনের প্রতি অপহর্তা প্যারিসের উক্তি এর অঙ্গীভূত—

"Paris had his answer ready. 'My dear' he said, 'do not put me on my mettle by abusing me. Menelaus has just beaten me with Æthene's help. But I too have gods to help me, and next time I shall win. Come, let us go to bed together and be happy in love. Never has such a desire overwhelmed me......never till now have I been so much in love with you or felt such sweet desire.' As he spoke, he made a move towards the bed, leading her to it. His wife followed him and the two lay down together on the well-made wooden bed." "প্যারিসের উত্তর তৈরি ছিল। তিরস্কার করে আমার শৌর্য উদ্দীপন করতে যেও না, প্রিয়ে। এথিনির সাহায্য নিয়ে এবার মেনেলাস আমাকে পরাস্ত করেছে। কিন্তু আমারও দেবতা সহায় আছেন, পরের বার আমি জয়ী হব। এস, আমরা শয্যাগ্রহণ করি এবং

ভালবেসে সুখী হই। ...আমি এমন কামনা-বিবশ কোনদিন হইনি। তোমার প্রতি আমার এই মুহূর্তের মধুর মোহময় অনুরাগ অননুভূতপূর্ব। এই বলে, প্যারিস শয্যার দিকে হেলেনকে নিয়ে অগ্রসর হলেন। প্যারিসের স্ত্রী তাঁর অনুগামিনী হলেন। দু'জনে কাষ্ঠনির্মিত সুখশয্যায় একত্রে শয়ন করলেন।" হোমরের কাব্যে প্রচণ্ড যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে যুদ্ধবিরতির মুহূর্তে অসংখ্য বৃষহনন, প্রচুর মদ্যমাংসসেবা ও শত্রুপক্ষীয়া লুণ্ঠিতা সুন্দরীদের বণ্টন নিয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রীক বীরদের বিজাতীয় ক্রোধ ও কলহের উদ্দীপনাপূর্ণ বর্ণনা হোমরের কাব্যের অন্যতম আকর্ষণ। পাশ্চাত্ত্য বৃষঘ্ন আর্যদের এই মহাকাব্যের পার্শ্বে ভারতের ফলমূলাহারী আশ্রমবাসী আদি-কবি বাল্মীকির মহাকাব্য থেকে বিষাদ-নীহারে আচ্ছন্ন মা জানকীর ম্লান করুণ মূর্তিটির ঈষৎ আভাস দিই।

রামায়ণ ও ইলিয়াডের রচিত চরিত্রের তুলনা

আসন্ন রাজ্যাভিষেকের মুহূর্তে রামের বনবাস বিহিত হয়েছে। বিমাতার ইচ্ছায় এবং সত্যবন্ধ অসহায় পিতার মৌন সম্মতিতে রাম প্রসন্নমনে পিত্রাদেশ পালনের সংকল্প নিয়েছেন। এ-কথা শুনে অযোধ্যার কুলবধূ ভাবী রাজেন্দ্রাণী পুণ্যশ্লোকা বৈদেহী স্বেচ্ছায় সানন্দে স্বামীর অনুগমনের অনুমতি চাইছেন। প্রতিনিবৃত্তকারী স্বামীকে তিনি বলছেন—

"অহং গমিষ্যামি বনে সুদুর্গমম্ মৃগায়ুতং বানরবারণৈশ্চ।
নিবৎস্যামি যথা পিতুর্গৃহে তবৈব পাদাবুপগৃহ্য সম্মতা॥'

'সুদুর্গম বনে আমি যাব। থাক্ না সেখানে হরিণের পাল, বানরের দল আর হাতীর ঘটা। তোমার পা-দুখানি ধ'রে আমি সুখে বনে বাস করব, যেমন সুখে ছিলাম বাবার বাড়ীতে। সেই আমার পরম সম্মান। অরক্ষিত কুটির থেকে অপহরণের মুহূর্তে ত্রিভুবনবিজয়ী 'বৈদেহী-হর'কে বৈদেহী বলেছেন—

"তথাহং ধর্মনিত্যস্য ধর্মপত্নী দৃঢ়ব্রতা।
ত্বয়া স্প্রষ্টুং ন শক্যাহং রাক্ষসাধম পাপিনা॥....
ইদং শরীরং নিঃসঙ্গং বন্ধ বা ঘাতয়স্ব বা।
নেদং শরীরং রক্ষ্যং মে জীবিতং বাপি রাবণ॥"

'যিনি নিরন্তর ধর্মে সুস্থির, ব্রতে যিনি অটল, তাঁর ধর্মপত্নী আমি। পাপী রাক্ষসাধম, আমি তোমার স্পর্শযোগ্য নই। আমার এই শরীর প্রাণশূন্য হোক্, আমি রক্ষা করব না, আমাকে বধ অথবা বন্ধন, যা খুশি করতে পার।"

লংকামহাসমরের অবসান হয়েছে। সুদীর্ঘ চতুর্দশবৎসরব্যাপী অশোকবনের অকথ্য নির্যাতন ও বিভীষিকা থেকে উদ্ধার পেয়ে সদ্যোমুক্তা বন্দিনী

স্বামীর চরণোপান্তে আনীতা হয়েছেন। সাগরতীরে বিশাল বানর ও রাক্ষস জনতার সমক্ষে সীতাকে অপাপবিদ্ধা ও পাবক হতে পবিত্রতরা জেনেও গূঢ়াশয় সীতাপতি সতীচরিত্রে কৃত্রিম সংশয় প্রকাশ করে অতি কঠোর বাকশল্যে তাঁকে বিদ্ধ করেন। সাধ্বী অনলগর্ভ বাক্যে পাতিব্রত্যের দীপ্ত তেজ বিচ্ছুরিত করে উত্তর দেন—

"কিং মাম্ অসদৃশং বাক্যম্ ঈদৃশং শ্রোত্রদারুণম্।
রুক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব ॥"

'হে বীর, এ-কি অনুচিত বাক্য তুমি আমাকে শোনালে, ইতর পুরুষ ইতর নারীকে যেমনভাবে শুনায় ?

"যদহং গাত্রসংস্পর্শং গতাস্মি বিবশা প্রভো।
কামকারো ন মে তত্র দৈবং তত্রাপরাধ্যতি ॥
মদধীনং তু যৎ তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ততে।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরা ॥'

'হে আমার প্রভু, পাপী আমার গাত্রস্পর্শ করেছে, আমাকে বিবশ করে, আমার ইচ্ছায় নয়। অপরাধ আমার নয়, দৈবের। আমার অধীন যে-বস্তু সে আমার হৃদয়। সে হৃদয় তোমারই, তোমাতেই সমর্পিত। পরকবলিত দেহে আমার অধিকার ছিল না। বিবাহমন্ত্রে আজিও আবৃত্তি করা হয়, "যদেতৎ হৃদয়ং তব তদেতৎ হৃদয়ং মম।' 'সম্প্রিয়ৌ রোচিষ্ণু সুমনস্যমানৌ।" রামায়ণ হোমগন্ধী শ্রৌতযুগের জীবন-ভাষ্য।

জাহ্নবীতীরে বাল্মীকি-তপোবনের প্রত্যন্তভাগে আনীতা আসন্নমাতৃত্বা সতী পতি-প্রদত্ত নির্বাসনের আদেশ পেয়ে অনুশোচনাক্লিষ্ট দেবরকে বলছেন, হে সুমিত্রা-মায়ের বীরসন্তান, আমাকে ত্যাগ করে নির্দ্বিধায় তুমি রাজাদেশ পালন কর। প্রভুর চরণে আমার বার্তাটি পৌঁছিয়ে দিও। আমার প্রতিনিধিরূপে করজোড়ে নতমস্তকে মহারাজের চরণযুগলে প্রণাম করে শ্বশ্রূমাতাদের কুশল জিজ্ঞাসা করবে ; তার পরে বলবে আমার অন্তরের কথাটি। আমি জানি, প্রভু, আমি শুদ্ধা, তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি, তা জেনেও তুমি আমাকে *ত্যাগ করেছ। ভাইদের প্রতি তোমার যে আচরণ, প্রজাপুঞ্জের* প্রতিও সেই আচরণ তুমি নিশ্চয়ই করবে। তাতেই তোমার অনুত্তমা কীর্তি। আমার জন্য আমার কোনও দুঃখ নেই। তোমাদের সমুচ্চকুলের অপবাদের জন্য আমার দুঃখ। তার পরে দেবরকে তিনি বললেন, ভাই, আমার দিকে চেয়ে দেখ, সুমহৎ ইক্ষ্বাকু-কুলের বংশধরকে আমি এই দেহে ধারণ করছি। এইজন্য সযত্নে আমি প্রাণরক্ষা করব। উত্তরে সাধ্বীর অশ্রুত দেবরটিও বললেন—

"দৃষ্টপূর্বং ন তে রূপম্ পাদৌ দৃষ্টৌ তবানঘে।
কথমত্র হি পশ্যামি রামেণ রহিতাং বনে ॥"

হে নিষ্পাপা, আমি এতদিন নয়নভরে শুধু তোমার পা দুখানি দেখে এসেছি, রূপ তো দেখিনি কোনদিন। আজ অগ্রজের অসাক্ষাতে কিরূপে তোমার দিকে চাইব? আর একদিন সীতাহারা দুই ভাই ঋষ্যমূক পর্বতে সীতার অন্বেষণে আকুল হয়ে লঙ্কাসমর-সহায় পঞ্চবানর সুহৃদের সাক্ষাৎ পান, যাঁরা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন অপহ্রিয়মাণা ক্রন্দনাতুরা সতীর নিক্ষিপ্ত অলঙ্কাররাজি। সেগুলি পেয়ে জানকী-বল্লভ রাম ভাই লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করেন, দেখ তো ভাই, অলংকারগুলি সীতার তো? লক্ষ্মণ শুধু নূপুরযুগল মাথায় ঠেকিয়ে বলেন,এ-টিকেই আমি চিনি, নিত্য পাদবন্দনার অভিজ্ঞতায়। কেয়ূরকুণ্ডল তো দেখিনি কোনদিন।

"নাহং জানামি কেয়ূরং নাহং জানামি কুণ্ডলে।
নূপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ ॥"

বাল্মীকি-রামায়ণের এমন অগণিত ভুবনপাবন চিত্রের মধ্যে মাত্র একটি চরিত্র-চিত্রের অতি স্বল্পাংশ এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এমন কত চরিত্রের মহাপ্রদর্শনী বাল্মীকির মহাকাব্য। আচার্য দীনেশচন্দ্র তাঁর 'রামায়ণী-কথা'তে আর ক'টি মাত্র চরিত্র তুলে ধরেছেন। রাম থেকে গুহক পর্যন্ত, সীতা থেকে সরমা পর্যন্ত চরিত্রাবলীর পরম লোভনীয় এই চিত্রশালায়, ভারতের সার্বজনীন গণমানসের, শতাব্দ নয়, সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ ধরে, আনাগোনা চলেছে।

বাল্মীকি-রামায়ণে অধীতী পাশ্চাত্ত্য মনীষী ভিন্টারনিজকে বলতে হয়েছে, বাল্মীকি-রামায়ণ ও হোমরের ইলিয়াড স্বতন্ত্র সৃষ্টি এবং দুই মহাকাব্য প্রকৃতিতে বিভিন্ন। প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীর অক্ষসীমার দুইপ্রান্তে এই দুই মহাকাব্য অবস্থিত। আমরা সসংকোচে বলব, অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য অতীতবেদী এবং একালের ভারততত্ত্ববেত্তাদের ভগবান্ তথাগতের পূর্বে ভারতীয় সংস্কৃতিকে স্থাপন করে দেখবার মতো মানসিক প্রস্তুতি নেই। একটি অনির্দেশ্য ঐতিহাসিক সংস্কারের বশবর্তী হয়ে তাঁরা খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত আটশো বছরের মধ্যে বেদোপনিষৎ ছাড়া ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির আর যা-কিছু মহান্ তাকে স্থাপন করতে চান। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ কাব্য স্মৃতি জ্যোতিষ-দর্শন সবই বুদ্ধোত্তর যুগের রচনা, প্রকাশ্যভাবে অথবা ইঙ্গিতে, অনেক সময়ে পরস্পর-বিরোধী অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাঁরা এ-কথা বলে গিয়েছেন। এ'দের মধ্যে ব্যতিক্রম, পাশ্চাত্ত্য মনীষী বুলেক, থিওডোর গোল্ডস্টুকর, ভারতীয় মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র দত্ত, যাঁরা রামায়ণ-মহাভারতকে ভগবান্ তথাগতের বহু পূর্ববর্তী যুগের বলেছেন।

বহুভাষাবিদ্ ও বহুসাহিত্যরসিক পণ্ডিত-কবি শ্রীমধুসূদন গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ অধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁর মেঘনাদবধে হোমরের বিচিত্র সৃষ্টি থেকে বহু চিত্রকল্প গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে গ্রীক প্রভাবের কল্পনা ঘূণাক্ষরেও তিনি প্রকাশ করেননি। তাই বোধ হয়, বিশ্বসায়স্বত বাঙালী কবি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় কবিদের উদ্দেশে তাঁর নবসৃষ্ট চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে বাল্মীকি কালিদাস ভারবি মাঘ কৃত্তিবাস কাশীরাম কবিকঙ্কণ রায়গুণাকর প্রমুখ কবিদের সাযুজ্যে 'কবিবর ভিক্টর হ্যুগো,' 'কবিগুরু দান্তে', 'কবিবর আলফ্রেড টেনিসন'-এর সঙ্গে 'পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডস্টুকরকে' স্মরণ ও বন্দনা করেছেন। আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, 'কবিবর'দের সভায় এই একমাত্র 'পণ্ডিতবর'কে সমান আসন দেওয়ার মূলে মধুসূদনের রয়েছে বাল্মীকির আনুগত্য এবং পণ্ডিতবর গোল্ডস্টুকর কর্তৃক বাল্মীকি রামায়ণের প্রাচীনতা ও মৌলিকতার উপলব্ধি। বাল্মীকির উদ্দেশ্যে মধুসূদনের প্রাণস্পর্শী আন্তরিকতাপূর্ণ বৈষ্ণবীয় দৈন্যবিনয়-প্রকাশের বিষয় সকলেই জানেন।।

রামায়ণের প্রাচীনতা ও মৌলিকতা ধারণায় মধুসূদন

"নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি, হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।"

এই সঙ্গে মধুসূদনের 'পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডস্টুকর' শীর্ষক স্বল্প-পঠিত এবং অনালোচিত চতুর্দশপদীটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কবিতাটির কিয়দংশ এই—

আছে যত পিকবর ভারত-কাননে,
সুসঙ্গীত.রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে।
কোন্ রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে ?
বাজায়ে সুকল বীণা বাল্মীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমার আদরে . . .
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে ?"

এর সঙ্গে কৃত্তিবাস বন্দনার সুরটিও বেশ মিলে যায়,

"গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি।"

দশরথ-জাতক এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা কাহিনীর সঙ্গে

হোমরীয় মহাকাব্য-কথার সংমিশ্রণ করে বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধোত্তর যুগে রামায়ণ সংকলন করেন; এই অভিমতের অসম্ভাব্যতা সাধারণ বুদ্ধিরও অগোচর নয়। ভারতের বহু শতাব্দীর ঐতিহ্যাগত সংস্কার ও আমাদের মতে অখণ্ডনীয় কতকগুলি প্রমাণের বিরোধী এই অভিমত। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বুদ্ধাবির্ভাব, তার বহুপূর্বে রামায়ণ-মহাভারতের সমগ্র কাহিনী ভারতময় প্রচলিত ছিল এবং ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে রূপ দিয়েছিল। ভারতের বহিঃপ্রকৃতি ও অধ্যাত্মপ্রকৃতি উভয়স্থলেই রামনামাবলীর ছাপ পড়েছিল। শুধু রামায়ণ মহাভারত নয়, প্রায় সমস্ত দর্শনগুলি স্মৃতি, জ্যোতিষ, গীতা, পুরাণ ও পৌরাণিক ভাগবত-ধর্ম প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগের। এর সমর্থনে আমি বিনীতভাবে এ-কালের পণ্ডিতদের নিকট ক'টি সাধারণ প্রশ্ন উত্থাপন করি।

রামায়ণ ও বৌদ্ধযুগের পৌর্বাপর্য-সম্পর্কে ক'টী তথ্য অবলম্বনে আমাদের প্রশ্ন

ভগবান্ তথাগতের গৌতম-নামটি কোথা থেকে এল? গৌতম ঋষি গোত্রপ্রবর্তক, সুতরাং ঐতিহাসিক নাম। ন্যায়দর্শনের প্রবর্তক গৌতমও কবিকল্পনা নন। রামায়ণে অহল্যার স্বামী গৌতম। শাক্যবংশীয় শুদ্ধোদন-পুত্র সিদ্ধার্থও গৌতম। সিদ্ধার্থের গর্ভধারিণী মায়াদেবী। বেদান্তদর্শন ছাড়া মায়া-নামটি কোথা থেকে এল? আমাদের মনে হয়, শুদ্ধোদন নামটিতেও স্মার্ত আচার-কল্পনার প্রভাব রয়েছে। পালিতে জাতক কাহিনীগুলির আরম্ভ এইরূপ, "অতীতে বারানসিয়াং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো" ইত্যাদি। 'ব্রহ্মদত্ত' নামটি বৈদান্তিক প্রভাব সূচিত করে না কি? শুধু তাই নয়, গীতার ব্রহ্মার্পণের জীবনদর্শনও এতে ব্যঞ্জিত হয়নি কি? সিদ্ধার্থের জ্ঞাতিপুত্র 'দেবদত্ত'-নামটিও কি গীতার জীবনদর্শন স্মরণ করিয়ে দেয় না?

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতেজ্যা যান্তি ভূতানি যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥"

শ্রেষ্ঠী 'অনাথ-পিন্ডদ' ভগবান্ তথাগতের জন্য ভিক্ষা মেগে চলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' নামক একটি শ্রেষ্ঠ কবিতায় তার উল্লেখ আছে। আমরা অপরপক্ষে পিতৃপুরুষের তর্পণকালে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক যাঁদের সলিলতর্পণ করি তাঁদের মধ্যে আছেন—

"যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥"

'অনাথ-পিন্ডদ' নামটি থেকে মনে হয় শ্রাদ্ধতর্পণাদি স্মার্তধর্ম প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগের। গীতার নির্বাণমোক্ষ আগে, না, ভগবান্ তথাগতের মহাপরিনির্বাণ

আগে ? গীতার ''জন্মমৃত্যু-জরা ব্যাধি-দুঃখ দোষানুদর্শনম্ ।। অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু । নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বম্ ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ।।'—আগে. না, ভগবান্ তথাগতের পরিব্রজ্যা গ্রহণের নিমিত্তকারণ 'চত্তারি পুব্বনিমিত্তানি' আগে ? বৌদ্ধ পঞ্চশীল পূর্ববর্তী, না স্মৃতিশাস্ত্র-প্রোক্ত ধর্মলক্ষণ পূর্ববর্তী ?

''ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ।।''

রামায়ণ বৌদ্ধ জাতকের অথবা গ্রীকমহাকাব্য ইলিয়াডের অনুকরণ, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পক্ষে আর একটি প্রবল বাধা এই যে, ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের গভীর উপলব্ধি ন হি সত্যাৎ পরো ধর্মঃ, 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্', । সত্য শিব সুন্দর ভারতের পরতত্ত্ব । রামায়ণেও 'সত্যমূলানি হি সর্বাণি', 'সত্যান্নাস্তি পরং পদম্ ।' আদ্যোপান্ত সত্যের জয়জয়কার। পিতৃসত্য পুত্রের অবশ্যরক্ষণীয় । সত্য কারো একলার নয় সত্য সার্বজনিক । স্মার্ত ধর্মেও সত্য এবং অস্তেয় পরিকল্পনার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । চৌর্য সর্বকালেই নিন্দিত । অস্তেয় বৌদ্ধ পঞ্চশীলেরও অন্তর্গত । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ভারতবর্ষ যা চায়, রামায়ণে তাই পেয়েছে । অথচ রামায়ণের মতো এত বড়ো গগনচুম্বী জীবনাদর্শের আকরগ্রন্থ এমন একখানি মহৎ কাব্য বর্ণাশ্রম-প্রচারক ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ জাতক অথবা গ্রীক নারীহরণের কাহিনী অপহরণ করে রচনা করলেন, যার বনিয়াদ সত্যের উপর নয় ! আশ্চর্যের বিষয়, একটা সমগ্র জাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী সেটিকে সত্যবুদ্ধিতে মেনে নিয়ে জীবন গড়েছে এবং ভাস কালিদাস থেকে মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতের দুই সহস্র বৎসরের শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা সেই কাব্যের আশ্রয়ে আত্মোপলব্ধি ও অনবদ্য আত্মপ্রকাশ করেছেন ।

পাণিনি ব্যাকরণে বাসুদেবার্জুন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির নামের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে । পাণিনি খৃস্টীয় পঞ্চম শতকের পরবর্তী কিছুতেই হতে পারেন না, পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকদের মতও তাই । মহাভারত নিঃসংশয়ে প্রাক্-পাণিনীয় এবং রামায়ণ মহাভারতেরও পূর্ববর্তী । ভারতীয় ঐতিহ্য এই সিদ্ধান্তের সুদৃঢ় ভিত্তি ।

''ব্যাসং বশিষ্ঠ-নপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্ ।
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্ ।।''

বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর, পরাশরাত্মজ ব্যাস । ব্যাসপুত্র শুকদেব গোস্বামী । প্রাচীন ঋষি-পারম্পর্যের এই শ্লোকবন্ধ সুচিরাগত ধারণা ঠিক বংশলতিকার সমগ্র পুরুষপরম্পরা নির্দেশ না করলেও ঐতিহাসিক কালক্রমের পারম্পর্যের অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে । বশিষ্ঠ রামায়ণের ঋষি,

মহাভারতের নয়। 'বশিষ্ঠনপ্তা' কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস মহাভারতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও মহাভারত-রচয়িতা বলে প্রসিদ্ধ।

মহাভারতে একাধিকবার সমগ্র রামায়ণের বিবৃতি রয়েছে। বনপর্বে হনুমদ্ভীমসংবাদে তীর্থযাত্রী ভীম ও বয়োভারনত অতিকায় হনুমান্ এই দুই পবন-তনয়ের মধ্যে কদলীবনে সাক্ষাৎকার, শক্তিপরীক্ষা, নাটকীয়ভাবে পরিচয় স্থাপন এবং হনুমান্ কর্তৃক শ্রদ্ধালু মধ্যম পান্ডবের নিকটে সমগ্র রামায়ণের সশ্রদ্ধ বিবৃতি পাওয়া যায়।

এই বিবৃতিতে ছটি অধ্যায়ে (১৪৬—১৫১ অধ্যায়, বনপর্ব) রামায়ণের কাহিনী, চরিত্রাবলী ও মনুষ্যমহিমা, এককথায় রামায়ণের সিদ্ধরস ব্যঞ্জিত হয়েছে। একই বনপর্বে আছে, পঞ্চপাণ্ডবের দ্রৌপদীসহ কাম্যকবনে অবস্থিতিকালে জয়দ্রথ মহাভাগা দ্রৌপদীকে অপহরণ করবার চেষ্টা করেন। জয়দ্রথকে যথোচিত শাস্তি দিয়ে ভীম দ্রৌপদীকে মুক্ত করেন। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় ম্রিয়মাণ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মার্কণ্ডেয় ঋষি দুটি কাহিনী বিবৃত করেন, একটি সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনী, অপরটি রামায়ণের রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ এবং সীতা উদ্ধারের কাহিনী। সাবিত্রী-উপাখ্যান মহাভারতের বনপর্বের সাতটি অধ্যায়ে (২৯২—২৯৮) এবং রামায়ণের কাহিনী উনিশটি অধ্যায়ে (২৭২—২৯০) বর্ণিত হয়েছে। সাবিত্রীউপাখ্যান রামায়ণ-মহাভারত উভয়ত্র আছে। রামায়ণোপাখ্যান মহাভারতে আছে। কিন্তু মহাভারতের অনুরূপ দ্রৌপদী-হরণ কাহিনী রামায়ণে নেই। তিনটি কাহিনীতেই তিন সাধ্বী স্বামীর সঙ্গে বনানুগমন করেন। সুতরাং দেখা যায়, কাহিনীত্রয়ের প্রাচীনত্বের ক্রমানুসারে প্রথম সাবিত্র্যুপাখ্যান, তার পরে রামায়ণে সীতার কাহিনী, সর্বশেষ মহাভারতে দ্রৌপদীর কাহিনী। সৌভাগ্যক্রমে এ-কালের পণ্ডিতেরা প্রক্ষেপবিচারে মহাভারতের সমগ্র বনপর্ব প্রক্ষিপ্ত বলে ঘোষণা করেননি।

মহাভারতের বহু-ব্যবহৃত ক'টি শ্লোকের মূল আমরা রামায়ণে পেয়েছি। আমাদের পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি কার্যে ব্যবহৃত হয় মহাভারতের এই দুটি শ্লোক—

"দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখাঃ।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে (ফলপুষ্পে) সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী॥
যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জুনো ভীমসেনোঽস্যাশাখাঃ।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণ ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥"

এই তাৎপর্যপূর্ণ দুটি রূপক-শ্লোকের মূল আমরা রামায়ণে পেয়েছি।

"ধৃতিঃ প্রবালঃ প্রসবাগ্রপুষ্পস্তপোবলঃ শৌর্যনির্বন্ধমূলঃ।
রণে মহান্ রাক্ষসরাজবৃক্ষঃ সংমর্দিতো রাঘবমারুতেন ।।
....
মূলং হ্যেষা মনুষ্যাণাং ধর্মসারো মহাদ্যুতিঃ ।।
পুষ্পং ফলঞ্চ পত্রঞ্চ শাখাশ্চাস্যেতরে জনাঃ ।।'

রাবণবধের পর শোকার্ত বিভীষণের উক্তিরূপে লঙ্কাকাণ্ডের একাদশাধিক শততম অধ্যায়ে এই শ্লোকগুলি পাওয়া যায়।

ন্যায়শাস্ত্রে যাকে ব্যতিরেকী প্রমাণ বলে, এমন একটি ব্যতিরেকী প্রমাণের প্রতি সম্প্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, রামায়ণ মহাভারতের পূর্ববর্তী কিনা, তার বিচার করতে বলি। রাম বনবাসান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন। সংবাদ এল, লবণদৈত্য প্রবল হয়ে যজ্ঞবিঘ্ন উৎপাদন এবং ঋষিদের প্রাণ-সংহার করছেন। ভাইয়েরা লবণ-দমনে তৎপর হয়ে এগিয়ে এলেন। রাম ত্যাগী এবং কৃতী ভরত বা লক্ষ্মণকে ভার না দিয়ে আগ্রহী কনিষ্ঠ শত্রুঘ্নের প্রার্থনা পূরণ করলেন। লবণ-বিজয়ে শত্রুঘ্নের যাত্রাপথে পড়ল মথুরা, মধুরা বা মধুপুরী। এই পুরী লবণের সুকীর্তিমান্ শিববর-প্রাপ্ত পিতা মধুদৈত্যের স্থাপিত। রামায়ণে যমুনাতীরে অর্ধচন্দ্রের ন্যায় শোভমানা রম্যা নগরী মথুরার চিত্তহারী শোভার বিস্তৃত বর্ণনা আছে—

"ক্ষেত্রাণি শস্যযুক্তানি কালে বর্ষতি বাসবঃ।
অরোগবীরপুরুষা শত্রুঘ্নভুজপালিতা ।।
অর্ধচন্দ্র প্রতীকাশা যমুনাতীরশোভিতা।
শোভিতা গৃহমুখ্যৈশ্চ চত্বরপণবীথিকৈঃ ।।'

মথুরা বা মধুপুরী ও যমুনাপুলিনের মনোহারিণী শোভার বর্ণনা রামায়ণে রয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণ বা কৃষ্ণলীলার সঙ্গে সংশিলষ্ট অপর কোনও চরিত্রের উল্লেখ অথবা সংকেত সেখানে নেই। রাবণের ভগ্নী কুম্ভীনসীর স্বামী মধু রাক্ষসের কথা রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গেও রয়েছে। এই মধু-প্রতিষ্ঠিত মধুপুরীর নামটি খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকে মৈথিল বিদ্যাপতিও ব্যবহার করেন। "হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।" মধুপুরী, মধুরা, মথুরা সব নামগুলিই কৃষ্ণকথায় ব্যবহৃত। শত্রুঘ্নের যাত্রাপথে গিরিব্রজপুরেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু জরাসন্ধ, ভীম, কৃষ্ণ বা মহাভারতের অপর চরিত্র সেখানে উল্লিখিত হয়নি। মহাভারত রামায়ণের পূর্ববর্তী রচনা হলে, রামায়ণের এই সমস্ত স্থলে কৃষ্ণ এবং মহাভারতীয় চরিত্র ও ঘটনার উল্লেখ অবশ্য প্রত্যাশিত হয়ে উঠত। যমুনা পাওয়া গেল, অথচ সেই যমুনার "কিশাল

অটে রূপের হাটে" যে 'নীলকান্ত-মণি বিকাত' তাঁর কোনও সন্ধান মিলল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে সম্প্রতি আমার দেওয়া বরদাকান্ত শ্যামাসুন্দরী বক্তৃতামালায় রামায়ণ-প্রসঙ্গে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক বক্তৃতার প্রকাশ প্রত্যাশিত ও প্রতিশ্রুত।

বাল্মীকির রামায়ণ যে বৌদ্ধ জাতক-কথা, উত্তর ভারতের রামকথা, দক্ষিণ ভারতের কপিপূজা এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার হোমরীয় গ্রীক কাব্যকথার, চাতুর্যপূর্ণ চৌর্যাশ্রয়ী জোড়াতালি নয়, তার আর একটি প্রমাণ এই যে, সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যে কণিষ্কের সমকালবর্তী অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে ও সৌন্দরানন্দ কাব্যে সমগ্র রামকথায় পরিণত রূপের প্রভাব দেখা যায়। অশ্বঘোষের পূর্ববর্তী ভাস তাঁর অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে-আবিষ্কৃত নাটকচক্র বা তেরোখানি নাটকের দুখানি রামায়ণীয় ঘটনা অবলম্বনে রচনা করেন। কালিদাসের নাটকে উল্লিখিত কালিদাস-পূর্ববর্তী ভাস তাঁর 'প্রতিমা' ও অভিষেক' নাটক সমগ্র এবং উন্নত রামকথার প্রভাবে রচনা করেন। প্রতিমা-নাটকে দশরথের প্রস্তরময়ী প্রতিমা বা মূর্তিনির্মাণ এবং মাতুলালয়-প্রত্যাগত ভরতের তদ্দর্শনে এবং রাম-বনবাসের বৃত্তান্ত-শ্রবণে বিলাপ বর্ণিত হয়েছে। 'অভিষেক'-নাটকে অভিষেক শুধু রামের নয়, রাম, সুগ্রীব ও বিভীষণ, এই তিনজনের। সুতরাং ভাসের পূর্বে সমগ্র রামায়ণের ভারতময় প্রচলন অনিবার্য অনুমানের বিষয় হয়ে ওঠে। রামকাহিনী ও তার রসব্যঞ্জনা আদি-কবি বাল্মীকির পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবিদের সকলের কাব্যনাটকে সুপরিস্ফুট হয়েছিল। এই কবিপরম্পরায় আছেন ভাস, অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভবভূতি, মুরারি মিশ্র, কবিরাজ-পণ্ডিত, 'গৌড়-অভিনন্দ' ও সন্ধ্যাকর নন্দী। ভাষা-রামায়ণে কৃত্তিবাসে ও তুলসীদাসে রামকথা কালোপযোগী রূপ নিয়েছে। আমাদের কালে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র এই পুরাতনী কথাকে আশ্রয় করে আমাদের অধ্যাত্মলোকে এই মহতী-কথার রসসংবেদন পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য রামকথার রূপক ব্যাখ্যা করে মৌলিক সৃষ্টিমূলক নতুন কথা বলেছেন, যার প্রতিফলন আমরা একালের কোনও ভারতেতিহাস-ব্যাখ্যাতার লিখিত বাল্মীকি-রামায়ণের ভূমিকায় দেখেছি। কৃষিসভ্যতার প্রতীক নয়নমনোভিরাম রাম এবং সীতা হলকর্ষিতা ভূমি হতে উদ্ভূতা। রামকর্তৃক অহল্যাভূমির উদ্ধার, এই রূপকের আভাস রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের রামায়ণীয় রূপকব্যাখ্যার আরও একটি দিক্‌ আছে। ভারতে আর্য-অনার্যের যুগযুগব্যাপী সংঘর্ষ

প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃত কাব্য-নাটকে সমগ্র রামকথার ভারতময় প্রচলনের প্রমাণ

রবীন্দ্রনাথের রামায়ণীয় রূপক-ব্যাখ্যা

এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ্য ও ব্রহ্মবাদী ক্ষাত্রশক্তির দ্বন্দ্ব রামকথায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের রূপকব্যাখ্যা মনস্বিতা ও সূক্ষ্ম ইতিহাস-চেতনার পরিচায়ক। কিন্তু রূপক ব্যাখা সম্বন্ধে আমাদের প্রথম ও প্রধান অভিযোগ এই যে এই ব্যাখ্যায় কালানৌচিত্য দোষের সম্ভাবনা থেকে যায়। কৃষি-সভ্যতা ও যান্ত্রিক-শৈল্পিক সভ্যতার সংঘর্ষ এবং তার থেকে উদ্ভূত সভ্যতা-সংকটের ঘটনা ও ধারণা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের। একটা সমগ্র জাতি রামকথার বাস্তব ঐতিহাসিক ভিত্তি ও ভৌমন্ডলিক ঘটনাবৃত্তে বিশ্বাস করে বহু শতাব্দী ধরে বিরাট ও উন্নত সাহিত্য রচনা করেছে এবং এই কাব্যকথা দিয়ে প্রাচীনকালে আর্য ও অনার্য ভারত এবং এ-কালের সর্বধর্মাবলম্বী ভারতীয়েরা তাঁদের জীবন গড়েছেন। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সুবর্ণযুগে ভারতের মহৎ সর্বকিছুই গড়ে উঠেছিল, রামায়ণ-মহাভারত, গীতা-ভাগবতপুরাণ ও কাব্যকথা—গুপ্তশাসনের যাদুদন্ড-স্পর্শে শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটার মতো দেখা দিয়েছিল—এ-কথা স্বদেশীয় ও বৈদেশিক ঐতিহাসিকেরা বারংবার ঘোষণা করলেও প্রমাণ-সাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে রামকথার ঐতিহাসিকতার চেয়ে কবি-কল্পনার ঐশ্বর্যের উপর বেশি জোর দিয়ে 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় বলেছেন, "কবি তব মনোভূমি রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।" সেই সঙ্গে তাঁর একই অতুলনীয় কবিতায় রামায়ণের যে সারোদ্ধার করেছেন আমরা তারই অনুপ্রাণনায় রামায়ণের ইতিহাসমূলকতায় আস্থাবান। 'ভাষা ও ছন্দের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয় আমাদের স্মরণ নিকষে চিরকালের জন্য সুবর্ণরেখাপাত করেছে—

রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্রের রামায়ণীয় মানবতার উপলব্ধি

"কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করেনি অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মত,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম,
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,—
কহ মোরে সর্বদর্শী, হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্যনাম,
নারদ কহিলা ধীরে, অযোধ্যার রঘুপতি রাম।"

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'Bengali Ramayanas' গ্রন্থে রামায়ণের মূল-নির্ধারণে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু কথার এবং বৌদ্ধ ও

জৈন রামায়ণের সমাবেশের কথা বলেছেন। এই অভিমত পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতিধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে 'রামায়ণী-কথা'য় তিনি বাল্মীকি-রামায়ণের যথার্থ মর্মোদ্ঘাটন করেছেন, মুখ্য ক'টি চরিত্রের আলোচনার সাহায্যে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায্য এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় অভিনন্দিত দীনেশচন্দ্রের 'রামায়ণী-কথা'কে আমরা তাঁর গবেষণামূলক অভিমতের উপরে স্থান দিই।

রামচন্দ্রের অবতারত্ব-কল্পনার প্রাচীনত্ব

এই প্রসঙ্গে রামায়ণ-সম্পর্কিত আর একটি অভিমতের উল্লেখ করি। এ-কথা পুরোপুরি ঠিক নয় যে, বাল্মীকি রামায়ণের পরিকল্পনা সবখানি মানবিক, তাতে রামের দেবত্বের পরিকল্পনা আদৌ ছিল না, এবং ক্রমশঃ আদি ও উত্তরকাণ্ডের মাধ্যমে রামায়ণের দেবতন্ত্র ও দেববাদ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। বাল্মীকি-রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে দেবতাদের প্রকাশ এবং রামচন্দ্রের স্বরূপ-কথনে রামের দেবত্ব এবং অবতারত্ব স্বীকৃত হয়েছে। প্রাগাধুনিক কালের রামায়ণাশ্রয়ী সমস্ত উৎকৃষ্ট কাব্যনাটকে রামের দেবত্ব-ধারণার প্রসার ঘটেছে। কালিদাসের রাম "রামাভিধানো হরিঃ"। রঘুবংশের সমগ্র দশম সর্গ পরতত্ত্ব-বোধে রামচন্দের দর্শন-সম্মত স্তুতি। ভট্টিকাব্যের প্রথম সর্গের আদি শ্লোকে "গুণৈর্ব্বং ভুবনহিতচ্ছলেন যং সনাতনং পিতরমুপাগমৎ স্বয়ম্।"

শ্রীরামচন্দ্রের অবতারত্ব নিয়ে বৈজ্ঞানিক যুগে বিস্তৃত আলোচনার তেমন সার্থকতা নেই। এইটুকু মাত্র বলা চলে, অবতার-তত্ত্বের একটি দার্শনিক ভিত্তি আছে যা তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেবার মত বস্তু নয়। আর অবতার-তত্ত্বের সঙ্গে ঐতিহাসিকতার কোনও বিরোধ নেই। শ্রীচৈতন্য ঐতিহাসিক মানব ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের কালের ব্যবধান পাঁচশো বছরেরও কিছু কম। কিন্তু তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক-বেদান্তী বাসুদেব সার্বভৌম বিশ্বাস করেছিলেন, তিনি "বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।" আমাদের খুব কাছের মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। আধুনিক কালের বিচারপরায়ণ মনঃশক্তিসম্পন্ন একজন মনীষী শ্রীরামকৃষ্ণের স্তোত্ররচনা করেছেন। "অবতার-বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।" কিন্তু তাই বলে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা, ভূমণ্ডলে প্রকটিত মানবতা, মিথ্যা হয়ে যায়নি। রামায়ণে রাম ও মহাভারতে কৃষ্ণ সম্পর্কে আমরা এইরূপ চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি নাকি? গীতার অবতারতত্ত্ব যেমন দর্শন-সম্মত তেমন এ-কালের বিচারবুদ্ধি দিয়ে গ্রহণের একেবারে অযোগ্য নয়।

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥"

জন্মরহিত ক্ষয়রহিত হয়েও সর্বভূতের ঈশ্বর প্রকৃতিকে আশ্রয় করে মায়াশক্তিতে আবির্ভূত হন। এর চেয়েও সহজে বিশ্বাস্য—

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥"

যা কিছু বিভূতিযুক্ত, শ্রী-ময় ও বলশালী, তাকেই মনে করবে, আমার তেজ ও অংশ থেকে সম্ভূত। এই উক্তির আলোকে অবতার-পরিকল্পনা সহনীয় হ'তে পারে না কি? রামায়ণের রাম ও মহাভারতের কৃষ্ণ একালের রাম-কৃষ্ণের মতোই বিগ্রহধারী ঐতিহাসিক মহামানব হয়ে উঠতে পারেন না কি? মনে রাখতে হবে, ভৌগোলিক ভারতের নদ-নদী অরণ্যানী এবং অধ্যাত্ম-ভারতের অন্তর্লোক স্মরণাতীত কাল ধরে একখানি পবিত্র রামনামাবলীর আবরণে মন্ডিত হয়ে রয়েছে।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত শুধু বাল্মীকি-রামায়ণেই অধীতী ছিলেন তা' নয়, কালিদাসের রঘুবংশ এবং সম্ভবতঃ ভবভূতির উত্তরচরিত ও মহাবীরচরিত এবং ভর্তৃহরির ভট্টিকাব্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। 'রঘুবংশের কীর্তি কেবা বর্ণিবারে পারে' আত্মপরিচয়ের এই-জাতীয় উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয় কালিদাসের বিনয়-বচন, "ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।" ভাসের রামায়ণাশ্রয়ী দু'খানি নাটক মুরারি মিশ্রের 'অনর্ঘরাঘব', কবিরাজ পন্ডিতের 'রাঘব-পান্ডবীয় কাব্য, গৌড় অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের সঙ্গে হয়ত কৃত্তিবাসের পরিচয় ছিল না। কারণ কৃত্তিবাসের কালে এই সমস্ত কাব্যের বহুল প্রচার ঘটেনি। কিন্তু জৈমিনি ভারত, অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মার্কন্ডেয় পুরাণ এবং অপরাপর নানা পুরাণের অন্তর্গত রামকথার সঙ্গে কবি-কৃত্তিবাসের পরিচয় ছিল এবং গৌড়বঙ্গে এই সকল গ্রন্থের প্রচার ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃত্তিবাস ও তাঁর যুগে ভক্তির আবহ, মহাপ্রভুর আনীত নামপ্রেমের আভাস

উনবিংশ শতাব্দীর জাগৃতির যুগে কবি-মধুসূদনের কবিপ্রতিভার উন্মেষ ও কবিকৃতির উপর কৃত্তিবাসের প্রভাব আমাদের বিশেষ প্রণিধানের বিষয় হওয়া উচিত। মেঘনাদবধের চতুর্থ-সর্গের প্রারম্ভিক বাল্মীকি-প্রণাম এবং রামায়ণাশ্রয়ী কবিকুলের বন্দনার কথা আমরা পূর্বেই বলেছি, "কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলংকার।" ফরাসীদেশে রচিত স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বিশ্বসারস্বত-নিবহের চতুর্দশপদীপ্রশস্তি-কবিতায় কৃত্তিবাস রয়েছেন। 'কৃত্তিবাস' ও 'কাশীরামদাস' শিরোনামযুক্ত দুটি সম্পূর্ণ চতুর্দশপদী কবিতা মধুসূদন রচনা করেছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম 'কমলে কামিনী' এবং 'শ্রীমন্তের টোপর'

কবিতায় এবং ভারতচন্দ্র 'ঈশ্বর পাটনী' ও 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' চতুর্দশপদীতে পরোক্ষভাবে বন্দিত হয়েছেন। নূতন-পুরাতনের সন্ধিযুগের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকেও মধুসূদন একটি সম্পূর্ণ চতুর্দশপদী নিবেদন করেছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে 'কৃত্তিবাস -শীর্ষক কবিতাটি সমগ্রভাবে উদ্ধৃতির যোগ্য।

''জনক-জননী তব দিলা শুভক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা !—কীর্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে,
কোকিলেব কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি,
নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে ! আপনি ভারতী,
বুঝি কয়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে,
পূর্বজনমের তব স্মরি হে ভকতি !
পবন-নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর,ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী ;
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ-মণ্ডলে
গাওগো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি।''

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কবি-মধুসূদন কৃত্তিবাসের কবিকৃতির অন্তর্নিহিত যে মুখ্যপ্রেরণা বা অনুভবের কথা এই চতুর্দশপদীতে ব্যক্ত করেছেন, আমাদের মতে, সেটি 'রামের নাম' এবং 'ভকতি'। 'প্রেম একবারমাত্র পৃথিবীতে রূপপরিগ্রহ করিয়াছিল, সে বঙ্গদেশে।' আচার্য দীনেশচন্দ্রের এই উক্তির লক্ষ্য প্রেম ও ভক্তির ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দ কালে প্রকটিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর আবির্ভাবের সূচনা পূর্বেই হয়েছিল। জাতির মর্মমূলে 'ভক্তিলতা'র বীজ দৃঢ় প্রোথিত ছিল। বাঙালী জয়দেব ও চণ্ডীদাসে এবং মৈথিল বিদ্যাপতিতে ভক্তির এই সুরটি বেজেছিল। কৃত্তিবাসে তার অনুরণন শোনা গিয়েছিল। মূল রামায়ণ-বহির্ভূত ও রামায়ণাতিরিক্ত দস্যু রত্নাকরের রামনামের মাহাত্ম্যে ঋষি বাল্মীকিত্বে পরিণতির কাহিনী অধ্যাত্ম রামায়ণ অথবা অপর যে কোন উৎস হতে নিয়ে থাকুন না কেন, কবি কৃত্তিবাসের এবং তাঁর যুগের নামনিষ্ঠা ও বাঙালীর বৈষ্ণবীয় ভক্তিপ্রাণতা এই কাহিনীকে নূতন রূপ দিয়েছিল। কাহিনীতে আছে, পাপে জড় রত্নাকরের রসনায় রামনামের স্ফূর্তি না হওয়ায়, ব্রহ্মা ও নারদ কৃপাকৌশল প্রকটন করেন। রত্নাকর লুন্ঠন ও নরহত্যার পাতকে লিপ্ত থেকেও বৃদ্ধ পিতামাতা

ও ভার্যার ভরণ পোষণ করতেন। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" তাই কৃপা ও দুর্লভ সাধুসঙ্গের তিনি অধিকারী হলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, শুষ্ককাষ্ঠখণ্ড এবং শবদেহকে কি বলা হয়? রত্নাকর সাধুদের প্রশ্নোত্তরে বললেন, 'মড়া'। তাঁরা রত্নাকরকে 'মড়া' নয়, 'মরা' বারংবার উচ্চারণ করতে বললেন। অবিরত উচ্চারণ হতে থাকল "মরা-মরা-মরা-মরা-ম।" বর্ণবিপর্যয়ে ধ্বনিত হতে থাকল "রাম-রাম-রাম-রাম"। নামাভাসেও নাম গ্রহণের ফল লভ্য হয়, এই সুমহান্ আশ্বাসপ্রদ শাস্ত্রবচন সত্য হ'ল রত্নাকরের জীবনে।

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।।"

আমরা পূর্বেই বলেছি, মহাপ্রভু হরি, রাম ও কৃষ্ণ এই তিনটি নামের বিভিন্ন স্থান ও সংখ্যা-সন্নিবেশ (permutation and combination) করে ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষরের মালা গেঁথে এক মহামন্ত্রের সৃষ্টি করেন। এই মহামন্ত্র নামকীর্তনের অবলম্বন হয়ে গণমানসে ভক্তির প্লাবন বহিয়ে দিয়েছিল। কৃত্তিবাসের প্রচলিত রামায়ণে আদিকান্ডে গঙ্গার উৎপত্তি-প্রসঙ্গে পাওয়া যায়।

"শিঙ্গা বলে শ্রীরাম ডমরু বলে হরি।
পঞ্চমুখে রামনাম গান ত্রিপুরারি।।"

জয়দেবের "নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্" এবং চণ্ডীদাসের "না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে" প্রাক্‌চৈতন্য যুগের নামতত্ত্ব-ভিত্তিক ভক্তিবাদের উপর আলোকসম্পাত করে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণবীয় প্রভাবের অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে, কিন্তু মহাপ্রভুর নাম-প্রেমাশ্রয়ী ভক্তিবাদের উপর কৃত্তিবাসের রামনাম-গান কাজ করেছিল কিনা, সে সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত কেউ আলোচনা করেননি। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ এবং আদি চরিতকার মুরারি গুপ্ত এবং জীবগোস্বামীর পিতা বল্লভ-অনুপম রামোপাসক ছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, কৃত্তিবাস মহাপ্রভুর জন্য নামকীর্তনের আসর প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন। "শমনদমন রাবণরাজা/রাবণ দমন রাম/শমনভবন না হয় গমন/যে লয় রামের নাম।" অতিকায় ও তরণীসেনের এবং স্বয়ং রাবণের অন্তকালে বৈরিভাবে রামভক্তি এবং রামের ভক্তবাৎসল্য পরবর্তীকালের পরিকল্পনা ও বৈষ্ণবীয় প্রক্ষেপ হ'তে পারে; কিন্তু নামাশ্রয়ী ভক্তি এ-দেশের অন্তর্লোকের সুচিরলব্ধ সম্পদ, যার ধারা শ্রৌত যুগ থেকে প্রবাহিত। কৃত্তিবাসের রামায়ণে ভগীরথ, "একদিনে ভগীরথ কোটি মন্ত্র জপে"। রাবণ নর্মদাতীরে লক্ষ শিবনাম জপ করেন। মধ্যযুগের

বাংলা মঙ্গলকাব্য-কথায় অন্তঃসলিল ফল্গুপ্রবাহের মতো এবং চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে কূলপ্লাবী স্ফীত উচ্ছ্বাসের মতো ভক্তির এই ধারা বয়ে এসেছে। বাঙালীর মধ্যযুগের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে এইরকম একটি ঐক্যসূত্রে অন্বিত করে ব্যাখ্যা করবার অবকাশ নেই কি ?

বাল্মীকি-রামায়ণের প্রচলিত রূপে শ্লোকসংখ্যা চবিবশহাজার। কৃত্তিবাস পাঁচালী-প্রবন্ধে পয়ার ও লাচাড়ি ছন্দে 'লোক বুঝাবার তরে' তার সংক্ষেপসাধন করেছেন। বাল্মীকি-রামায়ণের মতো কৃত্তিবাসী রামায়ণেও সাতটি কাণ্ড ; আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা, লঙ্কা ও উত্তরা। সংস্কৃত রামায়ণে আদি ও লঙ্কাকাণ্ডের নামান্তর যথাক্রমে বালকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ড। 'সুন্দরা' ও 'উত্তরা' কাণ্ডের আ-কারের টানটি বাংলা রূপান্তর মাত্র। আদি ও উত্তরাকাণ্ড বাল্মীকি-রামায়ণে পরবর্তী কালের যোজনা, পণ্ডিতদের এই অভিমত অমূলক না হতে পারে। দুটি কাণ্ডই পুরাণের লক্ষণাক্রান্ত, স্বর্গ ও মর্ত্যের, দেবতা ও ও মানুষের, লৌকিক ও অলৌকিক নানা কাহিনী এর অন্তর্নিবিষ্ট হয়েছে। কৃত্তিবাসের ভাষা আশ্রয় করে বলা যায়, 'দেবলোকে নরলোকে হইল মিশাল।' 'আদিকাণ্ডে রামজন্ম, বিবাহ সীতার।' বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের চারি অংশে দশরথের চারি পুত্ররূপে প্রকাশ, বাল্মীকি-রামায়ণে এ-কথা নেই। জনকের হলকর্ষণে সীরোৎকর্ষণ ভূমি থেকে অযোনিসম্ভবা সীতার উৎপত্তি উভয় রামায়ণেই ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে রয়েছে। দস্যু রত্নাকরের ঋষি বাল্মীকিতে পরিণতির নামমাহাত্ম্য-সূচক কাহিনী বাল্মীকি-রামায়ণ-বহির্ভূত এবং কৃত্তিবাসের অতিরিক্ত সৃষ্টি। এই সৃষ্টি অবশ্য মৌলিক নয়। অধ্যাত্ম-রামায়ণ এবং স্কন্দপুরাণ এই কাহিনীর মূল। পূর্ববঙ্গে ঢাকা ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথিতে এই কাহিনী পাওয়া যায় না, আচার্য দীনেশচন্দ্র ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেছেন। ভগীরথের জন্মের অদ্ভুত কাহিনীটিও বাল্মীকি রামায়ণ-বহির্ভূত, এটি বশিষ্ঠ রামায়ণ ও পদ্মপুরাণ হতে গৃহীত। কাণ্ডার মুনির কাহিনীটি স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড থেকে নেওয়া।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবি বাল্মীকিকে অনুসরণ ও মৌলিক সৃষ্টি

শুধু আদিকাণ্ডে নয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রায় সব কাণ্ডেই বাল্মীকি-রামায়ণ-বহির্ভূত ঘটনার সন্নিবেশ রয়েছে, যেগুলির মূল কতকগুলি জানা গিয়েছে এবং কতকগুলি অজ্ঞাত-মূল অথবা কবিকল্পনার পুরাণ-লক্ষণাত্মক সৃষ্টি (myth-making)। লঙ্কাকাণ্ডে কুম্ভকর্ণ বধে চৌষট্টি যোগিনীর আবির্ভাব অদ্ভুত রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে। শক্তি-

শেলাহত লক্ষ্মণের পুনরুজ্জীবনের জন্য হনুমানের গন্ধমাদন আনয়ন এবং অযোধ্যার আকাশে গমনকালে ভরতকর্তৃক বাটুল-প্রহার এবং পর্বত ও কক্ষতলে সূর্যসহ হনুমানের ভূমিতলে পতনের অদ্ভুত কাহিনীও অদ্ভুত রামায়ণ থেকে গৃহীত।

"নাহিক এসব কথা বাল্মীকি বচনে।
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে ॥"

রামচন্দ্র-কর্তৃক দেবীদুর্গার অকালবোধন ও শারদীয়া দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ থেকে গ্রহণ করে কবিকল্পনাব সাহায্যে কৃত্তিবাস কাহিনীর উৎকর্ষ বিধান করেছেন। বাল্মীকি-রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের সর্বশেষ অধ্যায়ে আছে, বানর ও রাক্ষসগণ রামের রাজ্যাভিষেকের পরে বিদায় নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় ও লঙ্কায় স্ব স্ব স্থানে যাত্রা করলেন। এই সময়ে রাম স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ সকলকে যথাযোগ্য মধুর বচনে আপ্যায়িত এবং মূল্যবান্ উপঢৌকনে পুরস্কৃত করেন। রামের নির্দেশে সীতাদেবী অতি মূল্যবান চন্দ্রকান্তি-তুল্য গৌরবর্ণ হার কণ্ঠ হতে উন্মোচন করে অদ্ভুত-কর্মা বীর ভক্ত হনুমানকে উপহার দেন। কৃত্তিবাস এই সূত্র অনুসরণ করে অতি সুন্দর এবং প্রাণস্পর্শী করে হনুমানের ভক্তি ও সীতারামের অনুগত-বাৎসল্য প্রকাশ করেছেন। কৃত্তিবাসে পাওয়া যায়, সীতাপ্রদত্ত হার হনুমান ভক্তিভরে গ্রহণ করে দন্তের দ্বারা চর্বণ করে দূরে নিক্ষেপ করলেন। বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে লক্ষ্মণ এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। হনুমান বললেন, হারে সীতারাম নাম লিখিত নেই। সুতরাং তাঁর কাছে এর মূল্য নেই। লক্ষ্মণ বললেন, তোমার শরীরে তো রামনাম লিখিত নেই, তবে তুমি কেন দেহধারণ করছ? হনুমান্ তৎক্ষণাৎ নখে বুক চিরে দেখালেন, তাঁর বক্ষে "অস্থিময় রামনাম লেখা লক্ষ লক্ষ"। কৃত্তিবাসের এই জাতীয় কবি-কল্পনা ও সুন্দর সৃষ্টিকে উত্তরকালের বৈষ্ণবীয় প্রলেপ মনে করবার কোন হেতু দেখা যায় না। ভক্তিভাবুকতা অনবচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো এদেশের জাতীয় চিত্তে বহমান থেকে মহাপ্রভুর প্রভাবে নতুন করে মহাশক্তি অর্জন করেছে।

উত্তরাকাণ্ডে কৃত্তিবাস অল্পবিস্তর ব্যতিক্রম সহকারে বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসরণ করেছেন। লঙ্কাসমরের অবসানে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে রাজ্যভার গ্রহণ করলে অগস্ত্য-প্রমুখ ঋষিগণ তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এলেন। তাঁরা লঙ্কাসমরবিজয় ও সবংশে রাবণের বধসাধন করে ত্রিলোকে শান্তিস্থাপন করার জন্য রামচন্দ্রের শৌর্যের প্রশংসা করলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁরা লক্ষ্মণকর্তৃক ইন্দ্রজিৎ-বধের প্রশংসা করে এই ব্যাপারকে অসাধ্যসাধন এবং সীতা-উদ্ধারের

প্রধান সহায়ক ঘটনা বললেন। মেঘনাদ-বধ সর্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য ব্যাপার মনে

কৃত্তিবাসের উত্তরাকাণ্ডের বিশেষ আলোচনা—কাহিনী ও চরিত্র কল্পনায় কবির কৃতিত্ব

করবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় অগস্ত্য ইন্দ্রজিতের তপস্যা, বরলাভ এবং মেঘনাদ-কর্তৃক দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয় ও বন্ধন বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। কৃত্তিবাস পণ্ডিত এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মণ চরিত্রের উৎকর্ষ দেখিয়েছেন তাঁর কবিকল্পনার সাহায্যে রামায়ণীয় ঘটনার নতুন ব্যাখ্যা করে। লক্ষ্মণ চৌদ্দ বছর অনিদ্রায় অনাহারে থেকে কঠোর ব্রহ্মচর্যপালন করে, নারীমুখ দর্শন না করে অগ্রজ এবং মাতৃসমা অগ্রজ-পত্নীর পরিচর্যার দ্বারা চারিত্রিক মহাশক্তি অর্জন করেন, এইজন্যই তিনি ইন্দ্রজিৎবধে সমর্থ হয়েছিলেন। লক্ষ্মণের অনাহার, অনিদ্রা এবং নারীর মুখদর্শন থেকে বিরতির কথায় রামচন্দ্র বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, লক্ষ্মণ তো নিজে বন থেকে ফলমূল আহরণ করে সীতার হাতে দিতেন এবং জনকনন্দিনী স্বামি-স্ত্রীর জন্য দু'ভাগ রেখে লক্ষ্মণের আহার্য ভাগ তাঁকে ফিরিয়ে দিতেন। ভ্রাতৃজায়ার সান্নিধ্যে থেকে তিনি কিরূপে নারীমুখ দর্শন থেকে বিরত ছিলেন? আর তিনি তো ভিন্ন কুটীরে তাঁদের মতো নিদ্রা যেতেন।

অগস্ত্যের ইচ্ছায় লক্ষ্মণ অগ্রজের নিকট বিনীতভাবে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিলেন। সীতাহরণের পর লঙ্কাসমর-সহায় সুগ্রীবাদির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ কালে অপহ্রিয়মাণা সীতাকর্তৃক পরিত্যক্ত অলঙ্কার সুগ্রীব সীতাহারা রামচন্দ্রের হাতে দেন। রামচন্দ্র সেগুলি লক্ষ্মণকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এগুলি সীতার কিনা। উত্তরে লক্ষ্মণ সীতার পায়ের নূপুরটি মাথায় ঠেকিয়ে বলেছিলেন, এ-টিকেই মাত্র চিনি, নিত্য পাদবন্দনার অভিজ্ঞতার ফলে। মুখের দিকে তো কোনদিন দৃষ্টিপাত করিনি। কথাটি লক্ষ্মণ অগ্রজকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। বনবাসকালে দম্পতী কুটিরে নিদ্রাগত হলে বীর লক্ষ্মণ ধনুঃশর হাতে বিনিদ্র হয়ে সারারাত্রি কুটির-দ্বার রক্ষা করতেন।

রাত্রিকালে নিদ্রার আবেশ রোধ করবার জন্য তিনি নিদ্রাকে শরবিদ্ধ করে প্রতিহত করেন। এইভাবে তিনি নিদ্রাজয়ী হয়েছিলেন। এবিষয়ে তিনি-প্রমাণস্বরূপ বলেন, যেদিন বনবাসান্তে অযোধ্যাপ্রত্যাগত হয়ে রামচন্দ্র বামভাগে সীতাদেবীকে নিয়ে সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন সেইদিন ছত্রধর লক্ষ্মণের নিদ্রার আবেশে হাত থেকে ছত্র স্খলিত হয়ে পড়েছিল। বনবাসকালে প্রত্যহ লক্ষ্মণ ফলমূল আহরণ করে সীতার হাতে দিলে সীতা "লক্ষ্মণ, ধর' এই বলে দেবরের অংশ তাঁর হাতে দিতেন। লক্ষ্মণকে আহৃত ফল ধরবার কথা বলা হ'ত, আহারের অনুমতি তো দেওয়া হ'ত না। লক্ষ্মণ সেগুলি ধরতেন এবং শরাধারে কুটিরের অদূরে সেগুলি সঞ্চয় করে রাখতেন। হনুমান সেই সঞ্চিত ফলগুলি

আনবার জন্য আদিষ্ট হয়ে ফলপূর্ণ তূণ বহন করতে অসমর্থ হলেন। লক্ষ্মণ বামহাতে অবলীলাক্রমে ফলসম্ভার আনয়ন করে আদেশমত সেগুলি গণনা করে দেখালেন. চৌদ্দবছরের মধ্যে মাত্র সাতদিনের ফল সেখানে সঞ্চিত নেই। সেই সাতদিন ফলমূল আদৌ আহরণ করা হয়নি। সাতটি দিন বড়ো নিদারুণ দুঃখের দিন। দশরথের মৃত্যুবার্তা পেয়ে তাঁরা শোকে অচেতন ছিলেন প্রথম দিনটিতে। রাবণকর্তৃক সীতাহরণের দিনটি দ্বিতীয়. ইন্দ্রজিৎ-কর্তৃক নাগপাশে বন্ধন তৃতীয় দিন, চতুর্থ দিন ইন্দ্রজিৎ-কর্তৃক মায়াসীতার কর্তন। পাতালে মহীরাবণের গৃহে বন্ধ অবস্থায় যাপনের দিনটি পঞ্চম। রাবণ-কর্তৃক শক্তিশেলের আঘাতের দিনটি যষ্ঠ এবং রাবণবধের দিনটি সপ্তম। এই সাতদিনের অনাহৃত ফল সেইজন্য সংখ্যায় পাওয়া গেল না। চতুর্দশ বৎসরের অনাহার এবং বিশ্বামিত্রের বরে ক্ষুৎপিপাসাজয়ের বিবরণ শুনে রামচন্দ্র হর্ষ-বিষাদে লক্ষ্মণকে কোলে নিয়ে অশ্রুবিসর্জন করলেন।

রামচন্দ্রের জিজ্ঞাসায় অগস্ত্য রাবণ ও লংকাবাসী রাক্ষসদের এবং তার পূর্বে কুবেরাদি যক্ষগণের, পৌলস্ত্যকুলে উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে রাবণাদির তপস্যা ও বরলাভ এবং বরদৃপ্ত দুর্ধর্ষ রাক্ষসদের স্বর্গমর্ত্যপাতাল ত্রিলোকবাসীর উপর অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেন। পুরাণ-লক্ষণাক্রান্ত এই সমস্ত ঘটনা কৃত্তিবাস অল্পবিস্তর পরিবর্তন-সহকারে বাল্মীকি-রামায়ণ থেকে গ্রহণ করেছেন। রাবণের জয়-পরাজয়ের কাহিনী, হরধনুভঙ্গের জন্য জনকের সভায় রাবণের ব্যর্থতা, বালী ও কার্তবীর্যার্জুনের নিকট রাবণের শোচনীয় পরাজয়, বেদবতীর অভিশাপ ও হলকর্ষণোদ্ভূতা সীতারূপে জন্মগ্রহণ ইত্যাদি ঘটনা বিবৃতিতে কৃত্তিবাস কিছু কিছু কবিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে আছে, ভদ্র-নামক পুরবাসী রাজানুচর প্রমুখাৎ প্রজাদের অন্তরে লঙ্কাবরুদ্ধা সীতার শুদ্ধতা-সম্বন্ধে সংশয়ের নিদারুণ বার্তা অবগত হয়ে রাম সীতাত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। কৃত্তিবাস এখানে কিছু পরিবর্তন করেছেন। অন্তঃপুরচারিণীদের অনুরোধে সীতা রাবণের ভয়াবহ মূর্তি ভূতলে অঙ্কন করে অন্তঃসত্ত্বতার ও আলস্যের ভারে সেই মৃত্তিকায় শয়ন করেছিলেন এবং সেই অবস্থায় সীতাকে দেখে রামচন্দ্র প্রজাবৃন্দের অসন্তোষ মেনে নিয়েছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণে কিন্তু সীতাত্যাগে কৃতসঙ্কল্প প্রজারঞ্জক সীতাপতি সীতাচরিত্রের অপাপবিদ্ধতা সম্পর্কে নিঃসংশয়ে জানতেন, 'অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্।" রামাদি চরিত্রের গাম্ভীর্য ও মহনীয়তা, গগনস্পর্শী উচ্চতা ও চিত্তপ্রসারী অন্তর্দ্বন্দ্বের ধারণায় বহু শতাব্দীর ব্যবধানে দাঁড়িয়ে বাঙালী-কবি আদিকবিকে অনুসরণ করতে পারেননি, একথা সকলেই জানেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে আর্ষ রামায়ণ থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের দৃষ্টান্ত বাল্মীকির আশ্রমপালিত যমজ ভ্রাতা লবকুশের রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্ব-ধারণ, একে-একে পিতৃব্যগণ ও সর্বশেষে পিতার সঙ্গে সংগ্রাম এবং কিশোর সন্তানের হস্তে সকলের পরাজয় ও মূর্ছা, পরিশেষে তপস্যা-প্রত্যাগত বাল্মীকি-কর্তৃক সসৈন্যে ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের পুনরুজ্জীবন। কৃত্তিবাস নিজেই বলেছেন, "এ-সব গাইল গীত জৈমিনি ভারতে।" জৈমিনি ভারতের বাংলাদেশে সমধিক প্রচলনের প্রভাব মধ্যযুগের বাংলা রামায়ণ ও মহাভারতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সমুন্নত চরিত্রধারণায় বাঙালী-কবির শক্তির ন্যূনতা স্বীকার করেও বলা যায়, লবকুশের যুদ্ধ-বর্ণনা উপলক্ষ্য করে মানবীয় জীবনরসের উপলব্ধিতে এবং নাটকীয়তার সৃষ্টিতে কৃত্তিবাস নিপুণতার স্বাক্ষর রেখেছেন। পুত্রহস্তে পৌলস্ত্যবিজয়ী রঘুকুল-তিলকের পরাজয়ের চিত্রাঙ্কন করে কবি একদিকে 'পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্' বাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছেন, অপরদিকে জানকীবল্লভ রামের জন্য সীতার বিলাপ ও পুত্রদের প্রতি ভর্ৎসনায় তাঁর চরিত্রের বিশুদ্ধি ও বাস্তবতা উজ্জ্বলতর করে তুলেছেন। পাবকশুদ্ধা মূর্তিমতী পবিত্রতারূপিণী সীতার দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্য অযোধ্যার রাজসভায় আগমন, সীতার শপথবাণী ও পাতালপ্রবেশ বর্ণনায় কৃত্তিবাস আর্ষ রামায়ণের সংযম, শালীনতা ও ভাবসংহতি সম্যকরূপে রক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু অভিমানিনী সাধ্বীর শেষ অভিমানটুকু চমৎকার ফুটিয়ে তুলে বলেছেন,

"নাহি চাহিলেন সীতা নিজের ছাওয়ালে।
শ্রীরামেরে নিরখিয়া প্রবেশে পাতালে ॥....
শ্রীরামের ক্রন্দন হইল অনিবার।
হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার।"

রবীন্দ্রনাথ 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রামায়ণের অপরূপ সংক্ষিপ্ত কাব্যভাষ্য রচনা করে বলেছেন, "কে পেয়েছে সবচেয়ে কে দিয়েছে তাহার অধিক।" পিতৃসত্যের অনুরোধে রাজ্যত্যাগ, অপাপবিদ্ধা জেনেও প্রজারঞ্জনের অনুরোধে সীতাত্যাগ এবং সর্বশেষে সর্বত্যাগী অনুগত বীরভ্রাতা লক্ষ্মণের বর্জন সত্যসন্ধ দশরথতনয়ের চরিত্রমহিমার দ্যোতক। লক্ষ্মণ-বর্জনের অপরিসীম কারুণ্য আর্ষ রামায়ণ অপেক্ষা কৃত্তিবাসী রামায়ণে করুণতর হয়ে উঠেছে। সরযূর 'খরশান স্রোতে' লক্ষ্মণঠাকুর প্রাণ বিসর্জন করেন। কিছুকাল পরে সমাপ্তকৃত্য সীতাপতি অনুগত সকলকে নিয়ে মহাপ্রস্থান করেন। রামরাজত্বের অবসান-বর্ণনায় বাঙালী কবি কৃত্তিবাস বাল্মীকি ও ভবভূতির সুযোগ্য 'উত্তরসূরিরূপে করুণরসাসিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন,

"সন্যাত্রা করিয়া রাম ছাড়েন সংসার।
রাম গেল পৃথিবী হইল অন্ধকার ॥
অযোধ্যা ছাড়িয়া রাম করেন গমন।
বশিষ্ঠ নারদ আদি সঙ্গে মুনিগণ ॥
অবধূত সন্ন্যাসী চলিল সারি সারি।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণ চারি ॥
হাতে লড়ি করিয়া চলিল খোঁড়া কাণা।
শ্রীরামের সঙ্গে যায় না মানিয়া মানা ॥"

বাল্মীকি রামায়ণে রামায়ণ-পাঠের ফলশ্রুতি লঙ্কাকাণ্ড বা যুদ্ধকাণ্ডের শেষে বর্ণিত হয়েছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে উত্তরাকাণ্ডের সমাপ্তিতে ফলশ্রুতির সমাবেশ করা হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, পন্ডিতদের মতে রামায়ণে আদি ও উত্তরকান্ড পরবর্তী যোজনা। মুখ্য এবং মৌল কান্ডসমূহের অনুবৃত্তিসূত্রে নূতনতর ঘটনাসমাবেশে এই দুই কান্ড যেন রামকথার সমগ্রতাবিধান করেছে।

"পুণ্য বৃদ্ধি হয় রামে করিলে স্মরণ।
পাপে পাপী মুক্ত হয় শুনি রামায়ণ ॥....
অপুত্রক লোক শুনি পায় পুত্রফল।
সপ্তকাণ্ড শুনি পায় অশ্বমেধ ফল ॥"

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চার যুগে আবর্তিত কালচক্রের ধারণায় অভ্যস্ত প্রাচীনেরা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চরিত্রের উৎকর্ষে রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শ চরিত্রগুলি এ-কালেব মানুষের চেয়ে উন্নততর ছিলেন, এরূপ মনে করেন। বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতিবাদে (Evolution) বিশ্বাসী আধুনিকেরা বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, নৈতিকতায় ও আধ্যাত্মিকতায়ও মানুষ ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। মধ্যপন্থী একটি মত হ'ল, সব যুগেই ভালোমন্দ দুই-ই আছে। রামায়ণ-মহাভারতে এবং পুরাণসমূহে দেবতা ও মানুষের পাশে যক্ষ, রক্ষ, দানব প্রভৃতি দেখা যায়। অলঙ্কারশাস্ত্র বলেন, 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম্, ন তু রাবণাদিবৎ।' রামাদি চরিত্রের অনুসরণ করবে, রাবণাদির নয়।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্র পরিকল্পনা

নিরপেক্ষ বিচারে মনে হয়, ঐতিহাসিক অথবা কবিকল্পনাপ্রসূত যা-ই হোক না কেন, রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত আদর্শ চরিত্র এ-কালের বাস্তব চরিত্র অপেক্ষা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মহিমায় উন্নততর। প্রত্যেক যুগের বাস্তব জীবন সেযুগের কবিকল্পনাকে নিশ্চয়ই প্রভাবিত করে। তাই বাল্মীকির রামসীতা,

ভরত লক্ষ্মণ হনুমান-প্রমুখ মুখ্য চরিত্রের পরিপূর্ণ মহিমা মধ্যযুগের বাঙালী কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণে সম্যকরূপে রক্ষিত হয়নি। অধিকাংশ চরিত্রেই মধ্যযুগীয় বাঙালী চরিত্রের ছায়াপাত হয়েছে, দোষগুণ প্রতিবিম্বিত হয়েছে। আবার মানবিকতাব দিক্ দিয়ে কোন কোন চরিত্র অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

বাল্মীকি ও কালিদাস-ভবভূতির রাম কোমল-কঠোর মনুষ্যমহিমার তুঙ্গশিখরে আরূঢ়, ক্ষাত্র মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিগ্রহ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় এবং আচার্য দীনেশচন্দ্র তাঁর 'রামায়ণী-কথা'য় এর অনবদ্য আভাস ফুটিয়েছেন। রামায়ণে সীতার পাতিব্রত্য-মহিমার সঙ্গে তাঁর দৃপ্ত ক্ষাত্রনারী-সুলভ তেজস্বিতা তুল্যরূপে প্রকটিত হয়েছে। অদ্ভুতকর্মা পবননন্দন হনুমানের অকৃত্রিম সেবানুগত্যের সঙ্গে তাঁর মনস্বিতা বাগ্মিতা শৌর্যবীর্য প্রভৃতি গুণ প্রোজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে।

বাঙালী চরিত্রের আবেগধর্মিতাব একটি প্রলেপ কৃত্তিবাসের মহৎচরিত্রগুলির মধ্যে লক্ষ্য হয়। বাল্মীকির রাম, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক"। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে বনবাসী রাম সীতাহারা হয়ে এবং সিংহাসনারূঢ় সীতাপতি সীতানির্বাসন দিয়ে অশ্রুর প্লাবন ও শোকের ঝড় বহিয়েছেন। বাল্মীকির রাম স্বল্পভাষী, অনপেক্ষ, দৃঢ়সংকল্প ও গম্ভীরস্বভাব। তাঁর ব্যক্তি-জীবনের সুখদুঃখ এবং রাজোচিত কর্তব্যনিষ্ঠা ও প্রজারঞ্জনবৃত্তির দ্বন্দ্ব স্বয়ংপ্রকাশ হয়ে ফুটেছে। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে তাঁর উত্তেজনা, আবেগধর্মিতা ও দোলাচলভাব অনেক সময় আত্মপ্রকাশ করেছে। বাল্মীকি রামায়ণে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষীয় বীরের নিকট বীরচরিত রাম কৃতান্ত ও অশনির মতো, কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে স্তুতিপরায়ণ শত্রুর প্রতি করুণায় বিগলিত প্রাণে তিনি অশ্রুবর্ষণ করেন। আসল কথা, মধ্যযুগের ভক্তিভাবনার এবং ভক্তিসর্বস্ব জীবনসঙ্গীতের আগমনী-কার কবি কৃত্তিবাস রামমাহাত্ম্যের পরিপোষক ভক্তবাৎসল্য গুণটি রামায়ণের সুচিরাচিত নায়কে আরোপ করেছেন।

সীতাচরিত্রের পাতিব্রত্য ও সহিষ্ণুতাগুণ অক্ষুন্ন রেখে কৃত্তিবাস তাঁর দৃপ্ত ক্ষাত্র তেজস্বিতা গুণটি আড়ালে রেখেছেন। লঙ্কাসমরের অবসানে সমুদ্রতীরে বিশাল রাক্ষস ও বানর-জনতার সম্মুখে আনীতা সীতা গূঢ়াশয় রামচন্দ্রের অপবাদাত্মক পুরুষ বচনের প্রতিবাদে বলেছিলেন, ইতর পুরুষ যে ভাবে ইতর নারীর সঙ্গে বাক্য ব্যবহার করে ('প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব') ইক্ষ্বাকুকুলপ্রদীপ কেন সেই ভাষা পতিব্রতার প্রতি প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের সীতা এখানে অনুনয়ের সুরে বলছেন,

"বাল্যকালে খেলিতাম বালিকা-মিশালে।
স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে।"

তেমনভাবে লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র ও আত্মোৎসর্গের দিক্‌টি অক্ষুন্ন রেখে কৃত্তিবাস তাঁর ক্ষাত্র পৌরুষের স্বাভাবিকতাটুকু মুছে দিয়েছেন। আসন্ন রাজ্যাভিষেক মুহূর্তে রামের প্রতি চতুর্দশ বর্ষ বনবাসের আদেশপ্রদানের কথা শুনে ক্রোধোদ্দীপ্ত ক্ষত্রিয়তনয় অসহিষ্ণু হয়ে বৃদ্ধ স্ত্রৈণ পিতাকে বধ করে জ্যেষ্ঠের ন্যায্য প্রাপ্য তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন। "হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্।" এই লক্ষ্মণ, কি ভাবে চতুর্দশবর্ষকাল 'অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায়মনঃ' কঠোর ব্রহ্মচর্যপালন করে এবং নারীমুখ সন্দর্শন না করে মেঘনাদ-বধের দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয়ী এবং মাতৃসমা জনকনন্দিনীর উদ্ধারের নিমিত্ত হয়েছিলেন, উত্তরাকাণ্ডের আদিতে অগস্ত্যরামসংবাদ প্রসঙ্গে বিনীত ও সলজ্জ লক্ষ্মণের মুখ দিয়ে কৃত্তিবাস তা বিবৃত করেছেন।

হনুমান্ চরিত্রে অশোভন হাস্যকরতার আরোপ করে হাস্য ও অদ্ভুত রসের সৃষ্টি করা সত্ত্বেও কৃত্তিবাস চরিত্রটিকে দাস্যরতির পরাকাষ্ঠারূপে প্রকাশ করে ভক্তচরিতের গৌরব ও মহনীয়তা প্রতিপন্ন করেছেন। অযোধ্যা-প্রত্যাগমনের পর ভক্তবৎসল রামচন্দ্রের ইচ্ছায় সীতাদেবী স্বকণ্ঠের মহামূল্য হার উন্মোচন করে হনুমানকে উপহার দেন। হনুমান্ ভক্তিভরে তা গ্রহণ করেন। কিন্তু অচিরকালেই দন্তে চর্বণ করে সে হার দূরে নিক্ষেপ করেন বিস্মিত ও অসন্তুষ্ট লক্ষ্মণের কারণ জিজ্ঞাসার উত্তরে হনুমান্ বলেন রামনামাঙ্কবিহীন অলঙ্কারের তাঁর কাছে কোনও মূল্য নেই। তাঁর নিজের অঙ্গেও তো রাম নাম অঙ্কিত নয়, তবে কেন তিনি দেহধারণ করেন? লক্ষ্মণের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি নখে বুক চিরে দেখালেন, তাঁর অস্থিপঞ্জরের অভ্যন্তরে রামনাম লিখিত, সীতারামের যুগলমূর্তি অঙ্কিত। আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণকে পরবর্তী বৈষ্ণব প্রভাবের অনুপ্রবেশে স্ফীতকলেবর অথবা আদ্যন্ত রূপান্তরিত না বলে, মনে করি, মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি-প্রচারের সম্ভাবনা এবং দাস্য সখ্য প্রভৃতি চতুর্বিধা রতির পূর্বাভাস কৃত্তিবাসী রামায়ণে এবং চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রত্যক্ষ করা যায়।

রাবণচরিত্রের পরিকল্পনাতেও কৃত্তিবাস স্বকীয়তা প্রদর্শন করেছেন। সংস্কৃত রামায়ণে রাবণ দেববর-দৃপ্ত এবং তপস্যায় বলীয়ান দুর্ধর্ষ বীর হয়েও রাক্ষস-স্বভাব, দেবদ্বেষী ও ধর্মদ্রোহী। শক্তি ও শৌর্যের আস্ফালনকারী রাবণ ধ্বংসাত্মক সংগ্রামী মনোবৃত্তি নিয়ে ত্রিভুবন আলোড়িত করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণ দুর্নীতিপরায়ণ ও পাপাচারী, তাঁর পাতক ও অনাচার সীমাহীন। কিন্তু এবম্বিধ চরিত্রের উপরে যেন পতিতপাবন রামচন্দ্রের করুণার একটি প্রলেপ

বদলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বোধ হয় বৈরিভাবে ভগবৎ-সাধনার পৌরাণিক পরিকল্পনাটি এই যুগের অন্তরস্পর্শ করেছিল, এবং সেইজন্য রাবণ চরিত্রের এইরূপ রূপান্তর ঘটেছে। রাবণ পাতকী ও পতিত হয়েও শেষ পর্যন্ত দেব-মানব রামচন্দ্রের পাতকি-তারণ পতিত-পাবন মনুষ্যমহিমার প্রভাবে ভক্ত স্বরূপে পরিণত হয়েছে। শুধু রাবণ কেন, তরণীসেন, অতিকায় প্রভৃতি রাক্ষসপক্ষীয় বীর যোদ্ধারাও ভক্তিভাবে আবিষ্ট হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে রামচন্দ্রের স্তবগান করে তাঁকে বিচলিত করে। স্বয়ং রাবণ অনুশোচনাদগ্ধ হয়ে আত্ম-বিচারণ করে বলেছেন, "জনমি ভারতভূমে আমি দুরাচার"। শুধু তাই নয়, কৃত্তিবাসের রাম বহুদর্শী রাজনীতিজ্ঞ মরণোন্মুখ লঙ্কাপতির নিকট রাজনীতি-বিষয়ে উপদেশপ্রার্থী হলে রাবণ একটি উচ্চাঙ্গের কথা বলেছেন। তিনি নিজে পাপী, তাই পাপীর প্রতি তার স্বজনবুদ্ধি ও সহানুভূতি স্বাভাবিক। পাপীদের দুঃখে বিগলিতচিত্তে তিনি তাদের জন্য স্বর্গারোহণের সোপান প্রস্তুত করবার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু আজ করি, কাল করি, করে কাজটি স্থগিত রেখেছিলেন। মরণ এসে গেল, সংকল্পটিই কার্যে পরিণত করা হ'ল না। "কালঃ পিবতি তদ্রসম্।" এই নিষ্ঠুর সত্যটি ফলে গেল। সুতরাং কর্তব্যকর্ম ও সাধুসংকল্প ত্বরান্বিত হয়ে সম্পাদন করতে হবে। কালহরণ করা চলবে না। পাপীর প্রতি সহানুভূতি এবং যথাকালে কর্তব্য সম্পাদনের, আগ্রহ দুটি বড় গুণ কৃত্তিবাস রাবণচরিত্রে অর্পণ করেছেন।

সাধারণভাবে মনে হয়, উনবিংশ শতাব্দীর নবমানবতার স্বপ্নদর্শী, নবজাগৃতির কবি মধুসূদন রাবণাদির চরিত্র মহিমান্বিত করে সৃষ্টি করে কতকটা রামায়ণীয় সিদ্ধরসের ব্যতিক্রম করেছিলেন। একথা সত্য হলে কৃত্তিবাসী রামায়ণে আমরা তার সূত্রপাত দেখি। এটি পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল অথবা ভাবালু আবেগপ্রবণ বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের অঙ্গীভূত পতিতপাবন অধমতারণ মনুষ্য মহিমায় বিশ্বাস এর মূলে কাজ করেছে? এই বিশ্বাসের অঙ্কুর কৃত্তিবাসে, অব্যবহিত পরবর্তী কালে মহাপ্রভুর দিব্যজীবনে এই বিশ্বাস মহামহীরুহ-রূপে পরিণতি লাভ করেছে।

এই আলোচনার উপসংহারে বলা যায়, চরিত্র-কল্পনায় কৃত্তিবাস বাল্মীকির সমুন্নত আদর্শ ও মনুষ্য-মহিমার পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করতে পারেননি, একথা আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু তাঁর তুলিকায় অঙ্কিত রামায়ণীয় মহৎ চরিত্র বাঙালীর হৃদয়ের দুয়ারে নতুন করে আতিথ্যলাভ করে ধর্ম ও সমাজের

সঙ্কটাবর্তের দিনে জাতীয় জীবনে সঞ্জীবনী-শক্তি যুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ-কথিত "কহ মোরে, বীর্য কার ক্ষমারে করেনি অতিক্রম" কৃত্তিবাসে সজল-জলদ-শ্যামল কমললোচন শান্তমূর্তি করুণাময় রামে আভাসিত হয়েছে। ক্ষাত্র নারীত্বের তেজোদৃপ্তা সাধ্বী সীতা তাঁর সতীত্বের তেজোবহ্নি যেন কিঞ্চিৎ সংবরণ করে জনমদুঃখিনী সহিষ্ণুতাময়ী কোমলপ্রাণা সর্বসেবাময়ী বধূব্রতচারিণী-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। লক্ষ্মণ তাঁর ক্ষত্রিয়সুলভ পরুষ ভাবের সবটুকু বর্জন করে যেন সৌভ্রাত্রে জ্যেষ্ঠগতপ্রাণ এবং অগ্রজ-পত্নীর প্রতি পরিপূর্ণ মাতৃভাবনা-নিরত হয়ে আত্মোৎসর্গে সুস্থির হয়ে রয়েছেন। হনুমানের প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য এবং যুক্তিনিষ্ঠ বাগ্মিতার পরিবর্তে আমরা পেয়েছি অদ্ভুতকর্মা বীরের দাস্যরতির অতলস্পর্শ গভীরতা। শ্রীরামতনয় যমজ লব-কুশ দুটি ভাইয়ের স্বল্প-প্রদর্শিত চরিত্রে শৌর্যের সঙ্গে মানবীয় স্নেহরস ও ভক্তির অপরূপ সমাবেশ ঘটেছে। অযোধ্যার রাজসভায় আনীত হয়ে বাল্মীকির প্রতিভাশালী কিশোর শিষ্যদ্বয়

কৃত্তিবাসী-রামায়ণে চরিত্র কল্পনা

"গাইল প্রথম দিনে বিংশতি শিকলি।
সুরস সুছন্দ শান্তরস পদাবলী॥"

গীতাবসানে গায়কযুগল গীতের সমগ্র বিষয় ও রচয়িতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে রামের নিকট সপ্তকাণ্ড রামায়ণের "আদিকাণ্ডে শ্রীরাম তোমার জন্মকথা" থেকে আরম্ভ করে, রামকথার সংক্ষিপ্ত সারোদ্ধার করে, সমাপ্ত করলেন।

"গীত গায় যখন মায়ের বনবাস।
তখন দোহার হয় গদগদ ভাষ॥
দুর্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে।
লক্ষ্মণেরে বর্জিবেন সেই মুনিশাপে॥
স্বর্গবাসে যাইবেন লইয়া সংসার।
ইহা বিনা বাল্মীকি না লিখিলেন আর॥"

এই করুণ ও মর্মস্পর্শী পরিসমাপ্তি শুধু কবিত্বপূর্ণ নয়, নাট্যগুণে সমৃদ্ধ। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, জয়দেবের মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীর পরে কৃত্তিবাসে এসে আমরা পদাবলী শব্দের উল্লেখ পেলাম, "সুরস সুছন্দ শান্তরস পদাবল।" এই পদাবলীর বিবর্তন ও পরিণতি দেখা গেল, শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের পরবর্তী কালে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রচলিত রূপের কতটুকু কৃত্তিবাসের, কতটুকু পরিবর্তিত বা বিবর্ধিত, তার সর্ব-সম্মত সমাধান সুদূরপরাহত।

কৃত্তিবাসোত্তর কালের বাংলা রামায়ণ-রচয়িতাদের কাব্যের জনচিত্তাকর্ষক অংশসমূহ যে পুঁথিলেখক ও গায়কেরা ক্রমাগত কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে গেছেন এ-কথা আংশিকভাবে সত্য হলেও আমরা রসিকতার ঝোঁকে যে বলে থাকি কৃত্তিবাসের রামায়ণের খোল ও নলচা দুই-ই বদলে গিয়েছে, এই চটকদারী কথাটি ঠিক নয়। পাবনার অমৃতকুণ্ড-নিবাসী অদ্ভুতাচার্য নিত্যানন্দের অদ্ভুতরামায়ণের অংশবিশেষ, নিধিরাম বা অযোধ্যারাম কবিচন্দ্রের রামায়ণের 'অঙ্গদ-রায়বার' এর মতো কোন কোন অংশ এবং রঘুনন্দন গোস্বামীর রামরসায়নের বিক্ষিপ্ত অংশ কৃত্তিবাসী রামায়ণের অন্তর্নিবিষ্ট হয়েছে, এ-কথার অল্পস্বল্প প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তাতে কৃত্তিবাসের কাব্যের লোকমনোহারিতাই প্রমাণিত হয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভাববস্তু, ভাষা ও চিত্রকল্প কিছুই প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাওয়া যায় না এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সমগ্র জাতির বোধশক্তি, রসজ্ঞতা ও তৈলধারার মতো অনবচ্ছিন্ন স্মৃতিপ্রবাহের প্রতি অমর্যাদা দেখানো হয়।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে অপরাপর ভাষা-রামায়ণের নানা-অংশের অনুপ্রবেশ

কৃত্তিবাসী রামায়ণের এ-কালে প্রচারিত সংস্করণগুলি এবং সে-সমস্তের আকরস্থানীয় পুঁথিগুলির সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে গণমানসে রামায়ণীয় জীবনাদর্শ মুদ্রিত করার কাজে সব-চেয়ে বেশি সহায়তা করেছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের বটতলার সংস্করণ। বলা বাহুল্য এই সংস্করণ নির্বিচার মুদ্রণের নামান্তর। এই সংস্করণে আমরা একটি গীতা-বচনের সার্থকতা পাই, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বলাধানের সহায়ক ক্ষুদ্রাকার বীজটুকুও যদি বটতলার সংস্করণ সংরক্ষণ ও পরিবেষণ করতে পেরে থাকেন তবে এই মুদ্রণ-প্রতিষ্ঠান ধন্য হয়েছেন। খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় জয়গোপাল-পণ্ডিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে স্বাধীনভাবে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। আমাদের কালেও শ্রদ্ধেয় রুচিমান প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহুলাংশে পরিবর্জন ও পরিবর্তন করে রামায়ণের এ-কালের রুচি-সম্মত সংস্করণ প্রকাশ করেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মুখ্যতঃ পূর্ববঙ্গের ঢাকা-ত্রিপুরা চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্ত পুঁথি-নির্ভর কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পাদন ও প্রকাশ করেছিলেন। উদ্ভটসাগর পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয়ও সমগ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশ করেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ড প্রকাশ করেন। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তিনখানি পুঁথি অবলম্বনে

কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিভিন্ন পুঁথি

কৃত্তিবাসের উত্তরাকাণ্ড সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। তাঁর নিজেরই কথায়, "একখানিতে কোন সন তারিখ নাই, দেখিলেও প্রাচীন লিপি বলে মনে হয় না। এখানি সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহ। অপর দুইখানি পুথি বিশ্বকোষ কার্যালয়ের সংগৃহীত।" তন্মধ্যে একখানির লিপিকাল ১০০৯ সাল, অর্থাৎ ১৬০৩ খ্রীস্টাব্দ। অপরখানি ১৫০২ শকের অর্থাৎ ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দের লিপি। কিন্তু আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মতে বাঁকুড়া পাত্রসায়ের অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অবলম্বন-পুথিদ্বয়ের সন শকাব্দ নয়, মল্লাব্দ। এই পুথি দুখানির বয়স তা হলে একশো বছর করে কমে যায়। দত্ত মহোদয়ের উত্তর কাণ্ডের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে প্রাপ্ত রামায়ণ-পুথির পার্থক্য বেশি। বন্দনার অংশে, বিশেষ করে শৈব-প্রভাবে কল্পিত হরগৌরীর বিবাহ প্রভৃতি অংশবিশেষে এই পুথির সঙ্গে অপরাপর পুথির সমধিক বৈষম্য দেখা যায়। প্রাচীন ও প্রামাণ্য পুথি মিলিয়ে সমগ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি সংস্করণ-প্রকাশ এখনও পণ্ডিত-সমাজের অপেক্ষিত ও প্রত্যাশিত বিষয়। আমরা সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত কৃত্তিবাসী সংস্করণের উপর নির্ভর করে এই প্রকাশনা ও আলোচনায় ব্রতী হয়েছি।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাষা

কৃত্তিবাসের ভাষা সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে, এমন একজন জনচিত্তজয়ী নিরন্তর-পঠিত কবির ভাষার আমূল পরিবর্তন হয়েছে পুথিলেখক ও গায়ক-সম্প্রদায়ের হাতে, রামায়ণ-পাঠক, গায়ক ও শ্রোতৃবৃন্দের শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকলে এ-কথা বলা চলে না। প্রাচীন কবিদের একই কাহিনী অবলম্বনে বহু কাব্যরচনাকে আচার্য দীনেশচন্দ্র একটি সুন্দর শব্দ প্রয়োগে বুঝিয়েছেন। শব্দটি 'পুচ্ছগ্রাহিতা'। আমাদের মধ্যযুগের কাব্যকবিতা সম্পর্কে অধিকাংশ গবেষণাত্মক সিদ্ধান্ত তেমনভাবে পুচ্ছগ্রাহিতার পরিচায়ক। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস এবং অপরাপর কবিদের রচনা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে বোঝা যায় যে তাঁদের রচনার ভাষ্যবিবেচনার ভিত্তিতে অনাবশ্যক ভাবে সমস্যার জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। একজনের নতুন কথা বলবার বা বাড়িয়ে বলবার আগ্রহ বহুজন নির্বিচারে মেনে নিয়ে চলেছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংস্করণ) ক'টি মাত্র উদ্ধৃতি দিয়ে কথাটি পরিষ্কার করবার চেষ্টা করি।

উত্তরাকাণ্ডে রাবণের স্বর্গজয় বর্ণনায় আছে, রাবণ বীরপুত্র মেঘনাদকে নিয়ে স্বর্গাভিযানের কালে বলছেন—

"ত্রিভুবন উপরেতে ইন্দ্র হয় রাজা।
ইন্দ্রেরে জিনিলে সব করে মোর পূজা।।"

রাবণের এই উক্তির ভাষার সঙ্গে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর দুটি পংক্তির ভাষা অবিকল মিলে যায়।

"পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা।।"

এই দুটি উদ্ধৃতির ভাষা কি একই জনের বলে মনে হয় না? তা হ'লে আত্মবিবরণী কারো উদ্ভাবনী শক্তি অথবা জালিয়াতির ফল নয়।

কৃত্তিবাসের বাগ্‌ভঙ্গিমার কিছু পরিচয় দিই—

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে 'রাজা গৌড়েশ্বর' সম্পর্কে আছে, কবির সভাপ্রবেশ-কালে 'পাত্রমিত্রসহ রাজা পরিহাসে মন'। হাস্যরসের প্রতি কবির একটি ব্যক্তিগত প্রবণতা তাঁর রচনায় নানাস্থানে পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে কারণে-অকারণে, স্থানে-অস্থানে সকলেই 'হাসে'। শুধু এক উত্তরাকাণ্ডেই এতজনের এতবার হাসি পাওয়া যায়।

'ব্রহ্মার বচনেতে গরুড়ের হৈল হাস।" (গজকচ্ছপের বৃত্তান্ত)
"দেবতার ত্রাস দেখি নারায়ণে হাস।" (মালীর মৃত্যু এবং সুমালী ও মাল্যবানের পাতালে প্রবেশ)
"অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।" (সূর্পনখার বৈধব্য)
"রাক্ষসের স্তুতিতে অর্জুন রাজা হাসে।" (কার্তবীর্যার্জুনের হস্তে রাবণের পরাজয়)
"শুনিয়া মুনির কথা শ্রীরামের হাস।" (বালিহস্তে রাবণের লাঞ্ছনা (
"কুড়িপাটি দশনে সে দশমুখে হাসে।" (যমলোকে রাবণের অভিযান)
রাবণের কথা শুনি পুরুষের হাস।" (রাবণের কুশদ্বীপে গমন ও মহাপুরুষের সহিত দ্বন্দ্ব)
"কুম্ভীনসী কথা শুনি মধুদৈত্য হাসে।" (মধুদৈত্যের সহিত রাবণের মিলন)
"মেঘনাদ-গর্জনেতে ইন্দ্ররাজ হাসে।" (রাবণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ও পরাজয়)
"মেঘনাদ যজ্ঞ দেখি বিরিঞ্চির হাস।" (রাবণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ও পরাজয়)
"শুনিয়া ব্রহ্মার কথা পবনের হাস।" (হনুমানের বিবরণ)
"কুক্কুরের কথা শুনি সভাজন হাসে।" (কালিঞ্জর রাজার বিবরণ)
"শত্রুঘ্নের বচনে রামের হৈল হাস।" (শত্রুঘ্ন কর্তৃক লবণদৈত্য বধ)
"ব্রহ্মার বচন শুনি শ্রীরামের হাস।" (শ্রীরাম-কর্তৃক শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদে অকালমৃত বিপ্রপুত্রের জীবনলাভ)

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের শব্দসম্পদে দৈন্য ছিল না। তাঁর রামায়ণে ব্যবহৃত শব্দসম্ভারে তৎসম শব্দের উপাদান নিতান্ত কম নয়। দেবচরিত্র অথবা বরেণ্য চরিত্রের অবতারণায় এবং রূপবর্ণনায় তাঁর ব্যবহৃত শব্দসম্ভার সার্থক ও ধ্বনিগুণ-সম্পন্ন। আপন্নার্তি-হরা 'হরবরাঙ্গনা'কে রাবণের রথে সমাসীন দেখে মিত্র বিভীষণকে রামচন্দ্র বিপন্নভাবে বলেন, "জলদবরণী কোলে রাজা দশানন।" উত্তরাকাণ্ডের আরম্ভে শ্রীরামের সভায় মুনিগণের আগমনের প্রাক্কালে রামের রূপবর্ণনা কবিত্ব ও ভক্তিভাবের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বর্ণনাটি উদ্ধৃতিযোগ্য।

"আজি কালিকার যেন বৈকুণ্ঠ নগরী।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দিব্য শার্ঙ্গ ধারী॥
নীলোৎপল সমান শ্যামল কলেবর।
পীতাম্বর সতড়িৎ যেন জলধর॥
বনমালা গলে দোলে আর হেমহার।
কপালে লম্বিত মণি শোভা কত তার॥
মকর কুণ্ডল ভাল শ্রবণেতে দোলে।
তাহার উজ্জ্বল শোভা লেগেছে কপোলে॥
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর।
চন্দনে চর্চিত অতি সুঠাম শরীর॥
শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত বক্ষঃ অতি মনোহর।
গগন উপরে যেন শোভে শশধর॥
চরণে নূপুর বাজে রুণু রুণু শুনি।
নীলপদ্ম কোলে যেন হংস করে ধ্বনি॥"

লীলা-পরিকল্পনায় আগে রামলীলা, পরে কৃষ্ণলীলা, পূর্ণ হতে পূর্ণতর, রাম অবতার, কৃষ্ণ অবতারী'। এই পরিকল্পনার চৈতন্যোত্তর যুগে লোকায়ত প্রসার হ'লেও পরতত্ত্বাশ্রয়ী এই কল্পনা প্রাক্‌চৈতন্য যুগের ভাগবতীয় পরিকল্পনা। কৃত্তিবাস দুই যুগের মধ্যে সেতু নির্মাণ করেছেন। পূর্বোদ্ধৃত শ্রীরাম-বন্দনায় জয়দেব অনুরণিত হয়েছেন,

"চন্দন-চর্চিত-নীল-কলেবর-পীতবসন-বনমালী।
কেলিচলন্মণি-কুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডযুগ-স্মিতশালী॥"

কৃত্তিবাসের এই বর্ণনায় রাম ও কৃষ্ণের একস্থতা প্রকটিত হয়েছে, এই রূপ মনে করায় দোষ আছে কি? কৃত্তিবাসের রামায়ণে ক্রমাগত পরবর্তী-

কালের বৈষ্ণবপ্রক্ষেপ ঘটেছে এ-কথা না বলে, বলা যায় না কি, সে-যুগের সমাজমানসে এবং যুগপ্রতিনিধি কৃত্তিবাসের কবিমানসে মহাপ্রভুর সমন্বয়ী ভাবসাধনার পূর্বাভাস দেখা দিয়েছিল। মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে পাই 'নাম্নামকারি বহুধা নিজ-সর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা,' কৃত্তিবাসে "শিঙ্গা বলে রাম ডম্বরু বলে হরি", "রামের প্রীতিতে হরি বল সর্বজন"। এ-ও কি 'নাম্নামকারি বহুধা' নয়?

কৃত্তিবাসী রামায়ণে দৃষ্ট বৈষ্ণবতা সম্পর্কে নূতন ব্যাখ্যা

মহাপ্রভুর মহামন্ত্র "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে। হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে।" মহাপ্রভুর পরমপ্রিয় পার্ষদ রামোপাসক মুরারি গুপ্ত দাস্যরতির মূর্তবিগ্রহ হনুমদ্‌ভাবাবিষ্ট ব'লে বৃন্দাবন দাস বর্ণনা করেছেন। শ্রীরূপ-সনাতনের অনুজ বল্লভ-অনুপম রামমন্ত্রাশ্রয়ী ছিলেন। পূর্ববর্তী কৃত্তিবাস ভাবকলেবরে মহাপ্রভুর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত ছিলেন, যদিও চৈতন্যোত্তর যুগের পরতত্ত্বকথায় ও চরিতাখ্যানে এই অন্তর্গূঢ় সম্পর্ক সম্বন্ধে কেউ কোন ইঙ্গিত করেননি। গৌড়-সুভাজন ও গৌড়ীয় সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ কবি মধুসূদন কৃত্তিবাস- শীর্ষক চতুর্দশপদীর একটি পঙক্তিতে কৃত্তিবাস-প্রশস্তির সার কথাটি বলে দিয়েছেন "গাওগো রামের নাম সুমধুর তানে।" দস্যু রত্নাকরের রামায়ণ-বহির্ভূত কাহিনীটি তাই কৃত্তিবাসের এত প্রিয় এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের মুখবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লঙ্কাসমরে আমরা নিরন্তর জিগীষু বানর-সৈন্যের মুখে 'রামজয়' ধ্বনি, এমন কি রাক্ষসবীরগণের মুখেও অন্তকালে "তারক ব্রহ্ম রামনাম" শুনেছি।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভাগবতেরও ছায়া পড়েছে। আত্মারাম-শব্দটি কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাওয়া যায়। লঙ্কাকাণ্ডে বনবাস-প্রত্যাগত রামের দর্শনলাভ করবার জন্য পুরনারীদের অধীর আগ্রহ ভাগবতের ব্রজগোপীদের আর্যপথ, লোকধর্ম ও কুলধর্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

"ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাইয়া আইসে গর্ভবতী।
লজ্জাভয় পরিহরি আইসে যুবতী॥
কি করিবে স্বামী আর কিবা ধনে জনে।
সর্বপাপ ঘুচিবেক রাম দরশনে॥"

কৃত্তিবাসী রামায়ণে কার্তবীর্য্যার্জুনের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ-কাহিনীতে পাওয়া যায়, শিবপূজায় রত রাবণ—

"মন্ত্রজপ করিলা লইয়া জপমালা।
মৌন নাহি ভাঙ্গে তার দেবার্চন বেলা॥"

শুধু তাই নয় ভক্তিতে অধীর হয়ে "রাবণ কুড়ি হাত পসারিয়া নাচে রঙ্গে ভঙ্গে" 'রাবণ 'আপনি গায় আপনি যে নাচে' প্রকাশানন্দ সরস্বতীর ভাবকালির অভিযোগে মহাপ্রভু বলেছিলেন, "নাচি গাই হাসি নাহি আপন ইচ্ছায়" এবং ভাগবতের এই শ্লোকটি উদ্ধার করেছিলেন,

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈ
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ"

গবেষণার গড্ডালিকাপ্রবাহে বাহিত হয়ে যাঁরা বলেন এই সব কিছুই আগাগোড়া পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ তাঁদের মুখেই শোভা পায়, রামায়ণ বৌদ্ধ জাতক কথা, গ্রীক হোমরীয় নারীহরণ কাহিনী এবং অসংশ্লিষ্ট নানা কথার চৌর্য-সংগৃহীত সাহিত্যিক অপকীর্তি।

কৃত্তিবাসের শব্দসম্পদ নিয়ে বিশেষ আলোচনা

আমরা কৃত্তিবাসের শব্দচয়ন-দক্ষতা সম্পর্কে তাঁর শাব্দিক উপাদানের কথা বলেছি। কিন্তু কতকগুলি তদ্ভব ও খাঁটি দেশী শব্দের প্রয়োগে কৃত্তিবাসের শাব্দিক কবিত্বের নিজস্বতা ফুটে উঠেছে। তেমন শব্দের কটিমাত্র দেখানো যাচ্ছে, কোঙর (পুত্র), ছাবাল, ঝিয়ারি (মেয়ে), বহুড়ী, বহুয়ারী (বধূটি), ব্যাখ্যা (প্রশংসা), বাখানি (প্রশংসা করি), বাখানিল (প্রশংসা করিল), ভেটিল (ভেট বা উপঢৌকন সহ সাক্ষাৎ করিল), আগুসরে (অগ্রসর হয়।)। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, কৃত্তিবাসে তথাকথিত 'মাইকেলি' ক্রিয়াপদের অসদ্ভাব নেই। বৈষ্ণব সাহিত্যে মধুসূদনীয় ক্রিয়াপদের প্রাচুর্য, যথা, কদর্থেন—কদর্থ করেন, উপহাস করেন; চোরায়িলা—চুরি করিল; আশোয়াসল—আশ্বাস দিল ইত্যাদি। 'সুবঙ্গ-মণ্ডলে'র এবং 'সুশ্যামাঙ্গ বঙ্গে'র অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কবি মধুসূদন ইংরেজী বা সংস্কৃত নামধাতুর অনুকরণে এই জাতীয় ক্রিয়াপদের সৃষ্টি করেননি। বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অনুরাগী পাঠক ও বোদ্ধা গৌড়-সুভাজনের অতিপ্রিয় কবি 'মাতৃকোষে রতনের রাজি' থেকেই এই জাতীয় ক্রিয়াপদের পুনরুদ্ধার করেছিলেন। আরও কতকগুলি বিশেষ শব্দ, যা কৃত্তিবাস বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেছেন, সেগুলি পরে-পরে মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা এবং বৈষ্ণব কবিগণ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন। যেমন, ঠাকুরাল (ব্রাহ্মণোচিতগুণ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি), আউদর (এলো, আলু-লায়িত), একভিতে (একদিকে), সোসর (সদৃশ), গোহারি (প্রার্থনা), উভরায় (উর্ধ্বস্বরে), উভলেজ উলিলেন, (অবতরণ করিলেন), দেওয়ান (সভা), রড়, রড়ারড়ি (দৌড়াদৌড়ি), বাহুড়িয়া (ফিরিয়া), নেহালে (নিরীক্ষণ করে), আলগোছে (সন্তর্পণে, হিন্দী আলগ্-সে), ইত্যাদি।

মধ্যযুগে কৃত্তিবাসোত্তর মঙ্গলকাব্যের কতকগুলি পরিকল্পনা সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস হতে গৃহীত হয়েছে। খুল্লনার পরীক্ষা সীতার অগ্নিপরীক্ষার ছায়ায় কল্পিত হয়ে থাকতে পারে। উভয়েই জন্মদুঃখিনী এবং দুঃখানুভবে, ধৈর্যে এবং সতীত্বে মহীয়সী। কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে অযোধ্যাপ্রত্যাবৃত্ত স-কটক রামচন্দ্রের তৃপ্তি-পূর্বক আহারের জন্য বৃদ্ধা রাজমাতা কৌশল্যা নিজহাতে নানাবিধ সুস্বাদু আহার্য্য রন্ধন করেছেন। সীতাদেবীও স্বহস্তে রন্ধন করে ভক্ত হনুমানপ্রভৃতিকে ভোজন করিয়েছেন। খুল্লনার রন্ধন এর অনুবৃত্তি হতে পারে। শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ ভক্তদের জন্য শচীমাতা, মালিনী, অদ্বৈতপত্নী সীতা; নিত্যানন্দ-গৃহিণী জাহ্নবাদেবীর রন্ধন বাস্তব ঘটনা হলেও বর্ণনায় কৃত্তিবাসের সাহিত্যিক অনুবৃত্তি। মঙ্গলকাব্যে কোষকাব্যের লক্ষণ দেখা যায়। নানা ফুল ফল, নানা পশুপক্ষী, বিবিধ ক্রীড়া-কৌতুক ও বিভিন্ন বিদ্যার নাম মঙ্গলকাব্যের সমৃদ্ধি রচনা করেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডে শৈব্যার পুত্র রুইদাস কর্তৃক পুষ্পচয়ন এবং শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের জন্য পুষ্পচয়ন বর্ণনায় নানা ফুলের তালিকা রয়েছে। উত্তরাকাণ্ডেও রামের রাজ্যাভিষেকের কালে নানাদিগ্‌দেশাগত মুনিদের জন্য প্রস্তুত নানা সুখাদ্যের তালিকা কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রদত্ত হয়েছে। কৃত্তিবাস-বর্ণিত 'নিখুঁতি' মিঠাইটি এখনও কবির স্বস্থানের সন্নিকটবর্তী কৃষ্ণনগরের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে।

মঙ্গলকাব্যে কৃত্তিবাসের প্রভাব

কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভগীরথকে জারজ বলে শিশু-সাথীরা গালি দেওয়ায় অভিমানভরে তিনি শয়নঘরে কপাট দিয়েছিলেন। শ্রীমন্তও অনুরূপভাবে শিক্ষাগুরুর মুখে মায়ের নিন্দা শুনে দুর্জয় অভিমান পোষণ করে শয়নঘরে দ্বাররুদ্ধকরেছেন এবং মায়ের নিকট থেকে পিতৃ-অন্বেষণে যাত্রার অনুমতি আদায় করেছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যানে আছে, মৃতপুত্র কোলে শৈব্যা কপালের নিশানা দেখে শবদাহক-বেশী রাজাধিরাজ স্বামীকে চিনেছিলেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলেও পিতৃহারা শ্রীমন্ত সিংহলরাজের বন্দিশালে পিতা-ধনপতিকে ললাটের নিশানা ও অঙ্গের চিহ্ন দেখে চিনেছিলেন। বাণিজ্যপ্রত্যাগত এবং মনসাকোপে বিকৃতবেশী চাঁদ সদাগরকেও সনকা ও দাসীগণ অঙ্গের নিশানা দেখে চিনেছিলেন। কৃত্তিবাসে রামনামের মাধ্যমে ভক্তিভাব প্রচার। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতেও বিভিন্ন উপাখ্যানে দেবতার প্রতি অবিশ্বাস বিদূরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ভক্তিবিশ্বাস বিজয়ী হয়েছে। কৃত্তিবাসের রামনামের মতো মঙ্গলকাব্যে চৌত্রিশা স্তোত্র ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়ে বাঙালীর প্রাণরসেরই

ধারা বয়ে এসেছে। সাহিত্যের ঐতিহাসিককে পাণ্ডিত্যাভিমান-শূন্য সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে এই ভাবসন্ততির অবিচ্ছিন্ন সূত্রটিকে আবিষ্কার করতে হবে।

কৃত্তিবাস-পণ্ডিতের রচনা প্রাঞ্জল হলেও তিনি অলংকার-প্রয়োগে অনভ্যস্ত ছিলেন না। প্রাচীন কবিপ্রসিদ্ধি অবলম্বন করে তিনি উপমারূপক প্রভৃতি অলংকার প্রয়োগ করেছেন। তেমন সচরাচর-দৃষ্ট নিসর্গবস্তু আশ্রয় করেও তিনি উপমারূপকের মালা গেঁথেছেন। পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার একত্র সমাবেশ তাঁর রচনায় দেখা যায়। এ বিষয়ে তাঁর পরবর্তী অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্যকার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁকে অনুসরণ করেছেন। কৃত্তিবাসের অলংকার-প্রয়োগের স্বল্পসংখ্যক দৃষ্টান্ত চয়ন করা হ'ল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে অলঙ্কার

"দিনে দিনে বাড়ে শিশু যেন শশধর।" আদিকাণ্ডে নবজাত হারীতের বর্ণনায় কবি এইভাবে কালিদাসের কুমারসম্ভবের উমাবর্ণনার প্রতিধ্বনি করেছেন, 'দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা'। কবিকঙ্কণ ব্যাধনন্দন কালকেতুর বয়ঃপ্রাপ্তির ও অঙ্গসৌষ্ঠব-বৃদ্ধির বর্ণনা করেছেন। "দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।" সর্পদষ্ট পুত্র রোহিতাশ্বকে দেখে দাসীবৃত্তিকারিণী রাজমহিষী শৈব্যার বর্ণনায় আছে,

"পুত্রকে দেখিয়া শৈব্যা পড়িল ভূতলে।
যেমন কলার গাছ ভাঙ্গে ডালে মূলে॥"

কৌশিনী-তনয় অসমঞ্জের বর্ণনায়,

"তনয় দেখিল যেন অভিনব কাম।
অসমঞ্জ বলিয়া থুইল তার নাম।"

লঙ্কাকাণ্ডে ভক্তবৎসলা চণ্ডীর রাবণকে ক্রোড়ে ধারণের বর্ণনায়,

"অসিতবরণা কালী কোলে দশানন।
রূপের ছটায় ঘন তিমিরনাশন॥
অলকা ঝলকা উচ্চ কাদম্বিনী কেশ।
তাহে শ্যামারূপ নীল সৌদামিনী বেশ॥
করপদনখে শশী অনল প্রকাশে।
বিম্বফল-তুলিত অধর মন্দ হাসে॥"

উত্তরাকাণ্ডে আছে, মাল্যবান ঋষি বিশ্রবাকে আপন কন্যা নিকষাকে সমর্পণ করেন। রাবণ-জননী নিকষার রূপবর্ণনায়,

"নিকষা তাহার নাম নবীন যোগিনী।
অকলঙ্ক শশিমুখী মরালগামিনী॥

মৃগেন্দ্র জিনিয়া কটি রামরম্ভা উরু।
হরিণাক্ষী কামধনু জিনি যুগ্ম ভুরু॥
জিনি রম্ভা তিলোত্তমা নিরুপমা নারী।
তিলফুল জিনি নাসা নিকষা সুন্দরী॥
যৌবন তরঙ্গে বক্ষে ভঙ্গিমা সুঠাম।
তাহার চরণে আসি করিল প্রণাম॥"

সেই সঙ্গে আমরা নিকষার 'কন্যারত্ন' শূর্পণখার বর্ণনায় পাই, 'নাকের নিশ্বাস যেন, কামারের জাঁতা'। 'অঙ্গুলিতে যেন নখ কুলার আকার।' কুবেরের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ-বর্ণনায়,

"রথ হতে রাবণ পাড়িল দিয়া লম্ফ।
সূর্যেরে ধরিতে যেন গরুড়ের ঝম্প॥"

অন্যত্রে "ভুজঙ্গ ধরিয়া যেন গরুড়ের রড়", "শশারুর দৃষ্টে যেন সিংহ মহাবলী", "সিংহের নিকটে যায় শৃগাল যেমন।" যমলোকে অভিযানকারী রাবণের বর্ণনায়,

"কুড়ি পাটি দশনে সে দশানন হাসে।
চতুর্দিকে কেয়া যেন ফুটে ভাদ্রমাসে॥"

অন্যত্র, মধুদৈত্যের সঙ্গে রাবণের মিলনে,

"কুড়ি পাটি দন্ত মেলে দশানন হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্র মাসে॥"

কৃত্তিবাসের রুচি

কৃত্তিবাসী রামায়ণের সম্পর্কে কেউ কেউ রুচির প্রশ্ন তুলেছেন, কৃত্তিবাসের চিত্রকল্পে ও ভাষায় নাকি অনেকস্থলে নৈতিক কুরুচির পরিচয় থাকায় কোন কোন অংশ বর্জন করে কৃত্তিবাসী রামায়ণের রুচিসম্মত সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, মধ্যযুগের কাব্যের রুচি মধ্যযুগের জীবনের অনুযায়ী। কৃত্তিবাসও অপরাপর কবির মতো যুগের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রুচি-বিগর্হিত চিত্রাঙ্কনে বা কাহিনী-বয়নে তিনি অপরাপর কবি অপেক্ষা অধিকতর অপরাধী হয়েছেন এ-কথা বলা যায় না। পরন্তু কৃত্তিবাসের নীতিজ্ঞান তাঁর কাব্যের কোন কোন স্থলে প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠেছে। ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন-বর্ণনায় আছে, বহু কষ্টে ও কৃচ্ছ্রতপস্যায় গঙ্গাকে শিবজটা থেকে মুক্তিদান করার পর সুমেরু পর্বতের গহ্বরে গঙ্গা আবদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। স্তবে তুষ্ট হয়ে ভাগীরথী জননী ভগীরথকে উপদেশ দেন তপস্যায় ইন্দ্রের তুষ্টিসাধন করে ঐরাবত হস্তীকে

এনে সুমেরু পর্বত বিদারণ করে গঙ্গাকে নিঃসারণ করার জন্য। উপদেশ পালিত হলে দুষ্ট ঐরাবত ইতর প্রাণীর মতো ধর্মহীনতার গর্বভরে বললেন,

"দাসী হয়ে গৃহে মম বঞ্চ এক রাতি।
তবে ত গঙ্গারে আমি করি অব্যাহতি॥"

ঐরাবতের কথায় মাতৃভাবনা-নিরত ভগীরথের

"দুঃখে নাহি বাক্য সরে চক্ষে বহে জল।
হিয়া দুরু দুরু করে অন্তরে বিকল॥"

গঙ্গার সস্নেহ প্রশ্নের উত্তরে বলেন "পুত্র হয়ে জননীকে বলিব কি করে।" অন্তর্যামী মা গঙ্গা বললেন, "বুঝিলাম তত্ত্ব" ইন্দ্রের দম্ভী বলশালী বাহন আড়াই ঢেউ সইতে পারলেন না। এক ঢেউতে "নাকে মুখে গেল জল হাঁস ফাঁস করে," আর এক ঢেউতে প্রাণ গতপ্রায়। "হস্তী বলে গঙ্গামাতা কর পরিত্রাণ।" গঙ্গাকে মাতৃ-সম্বোধন করে ইতর ঐরাবতের চিত্ত পরিশোধিত হ'ল। এরূপ সূক্ষ্ম প্রাণস্পর্শী নীতিজ্ঞান একালের কাব্যেও খুব সুলভ নয়।

বাঙালীর নৈতিক ও সামাজিক জীবনে কৃত্তিবাসের প্রভাব

কৃত্তিবাসের পর মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের প্লাবন বাঙালীর চিত্তপ্রাঙ্গণে বয়ে গেল। জাতির অন্তরে নূতনতর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগল। গোবিন্দদাসের সুমধুর ব্রজবুলিতে আমরা শুনলাম, মহাপ্রভু অকিঞ্চনকে ভাব-গজেন্দ্রে চড়িয়ে দোলা দিলেন। 'ভাব-গজেন্দ্রে চড়াওল অকিঞ্চনে।' প্রাক্-চৈতন্য যুগের কৃত্তিবাসে ভাবের এই ঐশ্বর্য অনুসন্ধান করা বৃথা। কিন্তু তাতে কৃত্তিবাস তাঁর স্ব-মহিমা থেকে স্থানচ্যুত হন না। কৃত্তিবাস-পরিচায়িত সত্যসন্ধ রাম, ভ্রাতৃপ্রেমে বৈরাগী ভরত ও আত্মহারা রামানুজ লক্ষ্মণ, পুণ্যশ্লোকা বৈদেহী, বাৎসল্যে অধীরা কৌশল্যা, দাস্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হনুমান, সখ্যে সুস্থির সুগ্রীব, বিভীষণ ও গুহক আমাদের হৃদয়সিংহাসনে চির-বিরাজমান রয়েছেন। জাতিধর্ম ও বর্ণ-নির্বিশেষে আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে, পরিবার-বন্ধনে ও সমাজচেতনায় এঁরা অদৃশ্যভাবে শক্তিসঞ্চার করতে লাগলেন এবং এঁদের দাস্য সখ্য বাৎসল্য পরতত্ত্ব-ভজনের উপায় রূপে উদ্ধর্বায়িত হ'ল। বিস্ময়ের বিষয়, দেশভাবনা ও দেশানুরাগের চকিত বিদ্যুৎ-শিহরণ আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের স্থানে স্থানে দেখতে পাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে যমপুরীর

কৃত্তিবাসের দেশভাবনা

বিরুদ্ধে রাবণের অভিযান প্রসঙ্গে পাই, পৌরাণিক পাপপুণ্যের ধারণা নিয়ে পাপীদের শ্রেণীনির্দেশ করলেও কৃত্তিবাস পাপীর পর্যায়ে ফেলেছেন সেই ব্যক্তিকে যে "না চিন্তিয়া দেশহিত চিন্তে নিজহিত।" আসন্নমৃত্যু রাবণ বৈরী দেবমানবের নিকট অকৃত্রিম আত্মবিচারণা করে গভীর

অনুশোচনাভরে বলছেন, "জনমি ভারতভূমে আমি দুরাচার।" ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতিপর্বে মানবিকতার অগ্রদূত মধুসূদন রাবণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, একথা বহুঘোষিত ও সর্ববাদিসম্মত সত্য। কিন্তু এই পতিতপাবন মানবিক সহানুভূতির প্রেরণা মধুসূদন তাঁর আবাল্য সহচর মধ্যযুগীয় প্রিয় কবি 'কীর্তিবাস' কৃত্তিবাসের নিকট থেকে আংশিকভাবে পেয়েছিলেন বলে আমাদের মনে হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে, মৃত্যুপথযাত্রী বহুদর্শী বীরশত্রুর নিকট রামচন্দ্র রাজনীতি-জিজ্ঞাসু হয়েছিলেন। জীবনদীপ নির্বাপণের পূর্বে রাবণ একটি অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন শত্রুরূপী পুরুষ প্রবরকে। কোনও সৎকার্যের সঙ্কল্প মনে জাগলে তাকে অবিলম্বে কার্যে পরিণত করা উচিত। "ক্ষিপ্রম্ অক্রিয়মাণস্য কালঃ পিবতি তদ্রসম্।' রাবণ নিজে পাপী বলে পাপীদের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম সহানুভূতি ছিল। তিনি চেয়েছিলেন, সমস্ত পাপীর জন্য স্বর্গের সিঁড়ি প্রস্তুত করে দেবেন। শ্রেয় বস্তুতে অধিকার সবার সুলভ করে তিনি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আজ করি, কাল করি, ক'রে কাজটি ফেলে রেখেছিলেন। কাজটি আর শেষপর্যন্ত করা হ'ল না। কালগর্ভে আজ তিনি ডুবতে চললেন।

শিক্ষিত রুচিমান বাঙালীর পরম সম্পদ ও গর্বের বস্তু রবীন্দ্র-সাহিত্য। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় "রবির রশ্মি তোমাদের হিয়া রসে লাবণ্যে দিয়েছে ভরি।" রবীন্দ্রসাহিত্য যেমন বাঙালীর, তেমন সমস্ত ভারতের ও বিশ্বের। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ একান্তভাবে সেকালের ও একালের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙালীর, সর্বমতাবলম্বী এবং সর্বধর্মাবলম্বী বাঙালীর। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আস্বাদনে অভ্যস্ত সহৃদয় পাঠক যেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনা করে না বলেন কৃত্তিবাসী রামায়ণে এমন একটি পংক্তিও নেই যেখানে প্রকৃত কবিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলা যায়, কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালীর 'দুর্বৎসরের দুর্গোৎসব'। রাজসিক সমারোহপূর্ণ ধনাঢ্য ব্যক্তির দুর্গোৎসব নয়, দরিদ্র পল্লীবাসীর দুর্গোৎসব, সার্বজনীন দুর্গোৎসব, যা দেখতে এসে ছিন্ন বসনে মলিন বদনে শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে ফিরে যায় না! আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে শ্রীরামচন্দ্রের শারদীয়া দুর্গোৎসবের দেবীস্তুতির কিয়দংশ উদ্ধার করে আমাদের এই অপূর্ণ কৃত্তিবাস-পরিচায়িকায় ছেদ টানি।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূল্যায়নে একালের অবিচার

"সর্বভূতে সর্বরূপে ভিন্ন কর দেহ।
তুমি শক্তি সর্বাধারা ছাড়া নহে কেহ॥
সংসার তোমার মায়া ছায়াবাজি প্রায়।
তোমার এ নাট্যখেলা পুত্তলিকা প্রায়॥
কারে কর রাজা কারে মংত্রী কর তার।
কেহ গজবাহী কেহ গজরক্ষাকার॥
কেহ দীর্ঘজীবী কেহ অল্পদিনে পাত।
কারো শিরে ছত্র কারো শিরে বজ্রাঘাত॥
কেহ যায় শিবিকায় কেহ তারে বয়।
কেহ সুখী মহাভোগী কেহ কষ্টে রয়॥
কারো স্বর্ণপাত্রে অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
কারো অন্ন নাহি মিলে ভিক্ষায় ভক্ষণ॥
কেহ রোগী রাগী কেহ কেহ বলান্বিত।
কেহ সাধু চোর কেহ ধর্মে ধর্মাতীত॥
এইরূপে সংসারের কর মা স্থাপন।
আমারে করেছ মাত্র দুঃখের ভাজন॥"

এই সহজ ও অকৃত্রিম জীবনানুভূতির স্বাভাবিক পরিণতি মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে,

"চেতোদর্পণ-মার্জনম্ ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণম্।
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্॥
আনন্দাম্বুধি-বর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥"

১৬২/১৬৫ লেকগার্ডেনস্
কলিকাতা-৭০০০৪৫
৺দীপান্বিতা, ১৩৮৫।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

॥ উত্তরাকাণ্ড ॥

"শুধু সেদিনের একখানি সুর চিরদিন ধ'রে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর, মধুর-করুণ তানে ;
সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে,
আজিও সে গীত মহাসঙ্গীতে বাজে মানবের কানে ॥"

শ্রীরামের সভায় মুনিগণের আগমন

আজি কালিকার যেন বৈকুণ্ঠ নগরী।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দিব্য শার্ঙ্গ ধারী॥
নীলোৎপল সমান শ্যামল কলেবর।
পীতাম্বর সতড়িৎ যেন জলধর।
বনমালা গলে দলে আর হেমাহার।
কপালে লম্বিত মণি শোভা কত তার॥
মকর কুণ্ডল ভাল শ্রবণেতে দোলে।
তাহার উজ্জ্বলশোভা লেগেছে কপোলে॥
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর।
চন্দনে চর্চ্চিত অতি সুঠাম শরীর॥
শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষঃ অতি মনোহর।
গগন উপরে যেন শোভে শশধর।
চরণে নূপুর বাজে রুণু রুণু ধ্বনি।
নীলপদ্ম কোলে যেন হংস করে ধ্বনি॥
অঙ্গদ সহিত রাম মন্ত্রী জাম্বুবান।
ভরত শত্রুঘ্ন আর যত মুনিগণ।
নারদাদি গান করে সনক প্রভৃতি।
বিভীষণ হনুমান সুগ্রীব সংহতি॥
কি কব রামের গুণ কহিতে অপার।
রাক্ষস বনের পশু গুণে বন্ধ যাঁর॥
ত্রিভুবনে নাহি দেখি রামের উপমা।
চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে দিতে নারে সীমা॥
হেন রাম দেখি সবে আনন্দিত চিত।
স্বয়ং নারায়ণ রাম সংসারে পূজিত॥
লক্ষ্মী সরস্বতী সদা করে আরাধন।
অযোধ্যায় অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠের ধন॥
চারিভিতে স্তুতি করে বহু পারিষদ।
সনক সনাতন ও বাল্মীকি নারদ॥
ব্রহ্মাআদি করিয়া যতেক দেবগণ।
কুবের বরুণ উনপঞ্চাশপবন॥
গরুড় উপরে যেন বসি নারায়ণ।
বিষ্ণুরূপী রামেরে দেখিল মুনিগণ॥
মুনি সকলের ছিল যতেক বাসনা।
সেইরূপ রামেরে দেখিল সর্ব্বজনা॥
বৈকুণ্ঠ সম্পদ রাম দশরথ ঘরে।
জন্মিলেন রাবণ বধার্থে এ সংসারে॥
সেইরূপ সকলে দেখিল চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ দেখি ত্রাস পায় সব মুনি॥
আপনার মূর্ত্তি রাম জানেন আপনি।
বিষ্ণু-অবতার রাম জানে সব মুনি॥
মুনিগণে সমাগত দেখি নিজ ধাম
গাত্রোত্থান করিলেন তখনি শ্রীরাম॥
কৃতাঞ্জলি হৈয়া তিনি দেন অর্ঘ্য জল।
জিজ্ঞাসেন মুনিগণে সবার কুশল॥
মুনিরা বলেন, রাম, সমস্ত কুশল।
অগ্রে তুমি বল তব আপন কুশল॥
তুমি আর লক্ষ্মণ জানকী ঠাকুরাণী।
কুশলে আইলে দেশে বড় ভাগ্য মানি।
রাক্ষস দুর্জ্জয় বড় বিধাতার বরে।
রাক্ষস মায়ায় রাম কোন্ জন তরে॥
ইন্দ্রজিৎ সে দুর্জ্জয় ত্রিভুবনে জানি।
লক্ষ্মণ মারেন তাহে অপূর্ব্ব কাহিনী।
মারিলে ত্রিশিরা খর দূষণ কবন্ধ।
মারীচেরে বিনাশিলে মায়ার প্রবন্ধ॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর।
মারিলে নিকুম্ভ কুম্ভ দুর্জ্জয় শরীর॥
কুম্ভকর্ণে বিনাশিলে বড়ই বিষম।
পলায় যাহার নামে আপনি শমন॥
রাবণের সহ রণ কে করিতে পারে।
করিলে দেবের ত্রাণ মারিয়া তাহারে॥
মারিলে এ সব বীর তাহা নাহি গণি
ইন্দ্রজিতে যে মারিল তাহারে বাখানি

ইন্দ্রজিৎ মায়াধারী যুঝে অন্তরীক্ষে।
না দেখেন দেবরাজ সহস্রেক চক্ষে ॥
ইন্দ্রে বান্ধি লয়েছিল লঙ্কার ভিতরে।
আনিলেক বিরিঞ্চি মাগি পুরন্দরে ॥
সেই ইন্দ্রজিতে ধ্বংস করি এলে ঘর।
শুনিয়া এ সব কথা বিস্মিত অন্তর ॥
মারিলে যে সব বীর যুদ্ধে যমদূত।
সে সবার কথা হয় শুনিতে অদ্ভূত ॥
রাম কন কি কব সে রাক্ষস বিক্রম।
প্রতিটি রাক্ষস যেন সাক্ষাৎ শমন ॥
রাবণের সেনাপতি কেবা কারে চিনে।
রণে প্রবেশিলে তারা যম ইন্দ্র জিনে ॥
রাবণ ভ্রাতার ডরে কেহ নহে স্থির।
ত্রিভুবন জিনি কুম্ভকর্ণের শরীর ॥
কাটিলে না মরে সে না ধরে কেহ টান।
কুম্ভকর্ণ এড়ি ইন্দ্রজিতের বাখান ॥
দশ মুন্ড কাটিয়া পাইয়াছিল বর।
তারে ছাড়ি বাখান কি তাহার কোঙর ॥
অগস্ত্য নামেতে মুনি দক্ষিণেতে বাস।
রাক্ষসের জানেন যে সব ইতিহাস ॥
রাক্ষসের বৃত্তান্ত কহেন মহামুনি।
শ্রীরাম কহেন, মুনি, কহ তাহা শুনি ॥
কৃত্তিবাস পন্ডিতের মধুর পাঁচালী।
গাইল উত্তরাকান্ডে প্রথম শিকলি ॥

লক্ষ্মণের চতুর্দ্দশবর্ষ ব্রহ্মচর্য, নিদ্রাজয় ও উপবাস-বৃত্তান্ত

মহামুনি অগস্ত্য সে বৈসেন দক্ষিণে।
রাক্ষসের বিবরণ সব মুনি জানে ॥
রাক্ষসের কথা কহে সে অগস্ত্য মুনি।
সভাখণ্ড শুনিছেন সহ রঘুমণি ॥
অগস্ত্য বলেন, রাম, জিজ্ঞাসি তোমারে।
কিরূপে করিলে যুদ্ধ লঙ্কার ভিতরে ॥
ধনুর্দ্ধারী তুমি আর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কোন্ কোন্ বীরে বধ কৈলে কোন্ জন ॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, নিবেদি চরণে।
করিলাম বহু যুদ্ধ ভাই দুইজনে ॥
বধেছি রাক্ষস কত না যায় গণন।
শমন সমান পরাক্রমে সর্ব্বজন ॥
রাবণ ও কুম্ভকর্ণে করেছি নিধন।
অতিকায় ইন্দ্রজিতে বধেছে লক্ষ্মণ ॥
মুনি বলে শুন রাম নিবেদি তোমারে।
ইন্দ্রজিৎ বড় বীর লঙ্কার ভিতরে ॥
ইন্দ্রে বেন্ধে এনেছিল স্বর্গ হতে ধরে।
ব্রহ্মা আসি মাগিয়া লইল পুরন্দরে ॥
থাকিয়া মেঘের আড়ে যুঝে অন্তরীক্ষে।
মেঘনাদ সমান বাণের নাহি শিক্ষে ॥
তাহারে করেন বধ ঠাকুর লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ সমান বীর নাহি ত্রিভুবন ॥
রাম কন কি কহিলে মুনি মহাশয়।
মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাবণ দুর্জ্জয় ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব রণে নাহি ধরে টান।
হেন রাবণ ছেড়ে ইন্দ্রজিতের বাখান ॥
মুনি বলে, রঘুনাথ, কহি তব ঠাঁই।
ইন্দ্রজিৎ সম বীর ত্রিভুবনে নাই ॥
চৌদ্দবর্ষ নিদ্রা নাহি যায় যেই জন।
চৌদ্দবর্ষ স্ত্রীমুখ না করে দরশন ॥
চৌদ্দবর্ষ যেই বীর থাকে অনাহারে।
ইন্দ্রজিতে বধিবারে সেই জন পারে ॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, কি কহিলে তুমি।
চৌদ্দবর্ষ লক্ষ্মণেরে ফল দিছি আমি ॥
সীতা সঙ্গে চৌদ্দবর্ষ করেছে ভ্রমণ।
কেমনে সীতার মুখ না দেখে লক্ষ্মণ ॥
কুটীরেতে বঞ্চিতাম সীতার সহিতে।
থাকিত লক্ষ্মণ ভাই ভিন্ন কুটীরেতে ॥

চৌদ্দবর্ষ কিরূপেতে নিদ্রা নাহি যায়।
কেমনে এমন কথা করিব প্রত্যয়॥
মুনি বলে সভামধ্যে আনহ লক্ষ্মণ।
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ নারায়ণ॥
রাম বলে শীঘ্র যাহ সুমন্ত্র সারথি।
সভামধ্যে লক্ষ্মণেরে আন শীঘ্রগতি॥
চলিলা সুমন্ত্র তবে শ্রীরামের বোলে।
লক্ষ্মণ বসিয়া আছে সুমিত্রার কোলে॥
সুমন্ত্র সারথি গিয়া নোঙাইল মাথা।
যোড়হাত করি বলে শ্রীরামের কথা॥
সুমন্ত্রের কথা শুনি কহেন লক্ষ্মণ।
বনদুঃখ সুধাবেন বুঝি নারায়ণ॥
আগেতে লক্ষ্মণ পিছে সুমন্ত্র সারথি।
প্রণাম করিল গিয়া যেথা রঘুপতি॥
লক্ষ্মণে বলেন রাম মোর দিব্য লাগে।
যে কথা জিজ্ঞাসি আমি কহ সভা আগে॥
চৌদ্দ বর্ষ ছিলাম একত্র তিনজন।
কেমনে সীতার মুখ না দেখ লক্ষ্মণ॥
তুমি ফল আনিতে রাখিয়া মোরে ঘরে।
ফল দিয়া আপনি কি ছিলে অনাহারে॥
বনমধ্যে তুমি ভিন্ন কুটীরেতে ছিলে।
চৌদ্দ বর্ষ কিরূপেতে নিদ্রা নাহি গেলে॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন রাজীবলোচন।
পাপিষ্ঠ রাবণ সীতা হরিল যখন॥
দুই জন ভ্রমি বনে করিয়া রোদন।
ঋষ্যমূকে মা সীতার পাই আভরণ॥
সুগ্রীবের অগ্রে তুমি সুধালে যখন।
সীতার আভরণ কি চিনহ লক্ষ্মণ॥
আমি না চিনিনু তাঁর হার কি কেয়ূর।
সবেমাত্র চিনিলাম চরণ নূপুর॥
সত্য প্রভু একত্র যে ছিনু তিনজন।
শ্রীচরণ বিনা তাঁর না দেখি বদন॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ নিদ্রা না যাই কেমনে।
শুন শুন, রঘুনাথ, কহি তব স্থানে॥
তুমি আর মা-জানকী কুটীরে থাকিতে।
আমি দ্বার রাখিতাম ধনুঃশর হাতে॥
আছন্ন করিল নিদ্রা আমার নয়নে।
ক্রোধ করি নিদ্রারে বিন্ধিনু একবাণে॥
কহি শুন, নিদ্রাদেবি, আমার উত্তর।
এসো না মোর কাছে এ চৌদ্দ বৎসর॥
রাম যবে রাজা হবে অযোধ্যা পুরেতে।
বসিবেন মা জানকী রামের বামেতে॥
ছত্রদণ্ড ধরে আমি দাঁড়াব দক্ষিণে।
সেইকালে এস নিদ্রা আমার নয়নে॥
তাহার প্রমাণ প্রভু, কহি তব স্থানে।
তব বামে মা-জানকী বৈসে সিংহাসনে॥
আমি দাণ্ডাইনু ছত্র করিয়া ধারণ।
হাত হৈতে টলে ছত্র পড়িল তখন॥
ঐ কালে নিদ্রা আসি করিল ব্যাপিত।
ঈষৎ হাসিয়া আমি হইনু লজ্জিত॥
অনাহারে চতুর্দ্দশ বর্ষ ছিনু বনে।
তাহার প্রমাণ, প্রভু কহি তব স্থানে॥
আমি গিয়া কাননেতে আনিতাম ফল।
তুমি প্রভু তিন অংশ করিতে সকল॥
পড়ে কি না পড়ে মনে রাজীবলোচন।
আমারে কহিতে 'ফল ধর রে লক্ষ্মণ'॥
আমি ধরে রাখিতাম কুটীরেতে আনি।
খাইতে কখন নাহি বল রঘুমণি॥
আজ্ঞা বিনা কেমনেতে করিব আহার।
চৌদ্দ বছরের ফল আছয়ে তোমার॥
শ্রীরাম বলেন ফল রেখেছ কেমন।
সভামধ্যে আনি দেহ প্রাণের লক্ষ্মণ॥
হনুমানে আদেশিল ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বন হৈতে ফল আন পবননন্দন॥

হনুমান গিয়া তবে দেখিল কাননে ।
চৌদ্দ বছরের ফল আছে পূর্ণ তূণে ॥
দেখিয়া ফলের তূণ হনুমান বলে ।
এই কোন্ কার্য হেতু আমারে পাঠালে ।
ক্ষুদ্র এক বানরেতে লয়ে যেতে পারে ॥
আমারে পাঠালে প্রভু অবিচার করে ॥
এত যদি হনুর হইল অহংকার ।
হইল ফলের তূণ লক্ষ্মণের ভার ॥
নাড়িতে নারিল তূণ পবননন্দন ।
সভামধ্যে উত্তরিল বিপসূদন ॥
হনু বলে, প্রভু আমি না পারি বুঝিতে ।
না পারি নাড়িতে তূণ আমার শক্তিতে ॥
লক্ষ্মণের পানে চাহে রাজীবলোচন ।
হাসিয়া বলেন তূণ আনহ লক্ষ্মণ ॥
নিমিষে লক্ষ্মণ গিয়া ধরি বামহাতে ।
আনিয়া রাখিল তূণ সবার সাক্ষাতে ॥
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ ।
চৌদ্দ বছরের ফল করহ গণন ॥
একে একে লক্ষ্মণ সে গণিলা সকল ।
সবেমাত্র না মিলিল সপ্ত দিন ফল ॥
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ ।
সপ্তদিন ফল তুমি করেছ ভক্ষণ ॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন দেব নারায়ণ ।
সপ্তদিন ফল কে বা করে আহরণ ॥
যেই দিন পিতার বিয়োগ সমাচারে ।
বিশ্বামিত্র আশ্রমেতে ছিনু অনাহারে ॥
সেই দিন ফল নাহি করি আহরণ ।
আর ছয় দিন কথা শুন নারায়ণ ॥
যে দিন হরিল সীতা পাপিষ্ঠ রাবণ ।
শোকেতে আকুল ফল আনে কোন্ জন ॥
ইন্দ্রজিৎ যেইদিন বান্ধে নাগপাশে ।
অচৈতন্যে গেল দিবা ফল না আইসে ॥
চতুর্থ দিনের কথা নিবেদি চরণে ।
ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা কাটিল যে দিনে ॥
সেই দিন শোকানলে দগ্ধ দুই ভাই ।
মনে করে দেখ, প্রভু, ফল আনি নাই ॥
আর দিন দেখ, প্রভু, পড়ে কি না মনে ।
পাতালে মহীর ঘরে বন্দী যেই দিনে ॥
জিজ্ঞাসহ সাক্ষী তার পবননন্দন ।
সেই দিন ফল নাহি করি অন্বেষণ ॥
শক্তিশেল যেই দিন মারে দশানন ।
অধৈর্য্য হইলা মম শোকে নারায়ণ ॥
নিত্য আনিতাম ফল আমি যে গোসাঁই ।
নফর পড়িল ফল আনা হলো নাই ॥
সপ্তম দিনের কথা কি কহিব আর ।
যে দিন রাবণ বধে আনন্দ অপার ॥
আনন্দ উৎসবে সবে হইল চঞ্চল ।
পুলকেতে পাসরিনু আনিবারে ফল ॥
বিচার করিয়া দেখ জগৎ গোসাঁই ।
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি কিছু নাহি খাই ॥
তব মনে নিত্য ফল খাইত লক্ষ্মণ ।
পূর্ব্বকথা কেন, প্রভু, হলে বিস্মরণ ॥
বিশ্বামিত্র স্থানে মন্ত্র পাই দুই জনে ।
তুমি ভুলিয়াছ, প্রভু, আছে মম মনে ॥
উপদেশ দিয়াছেন বিশ্বামিত্র ঋষি ।
এ কারণ চতুর্দ্দশ বর্ষ উপবাসী ॥
পালিয়া মুনির আজ্ঞা ভ্রমিতাম বনে ।
এই হেতু ইন্দ্রজিৎ পড়ে মম বাণে ॥
এত যদি বলিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি রামের ক্রন্দন ॥

রাক্ষসগণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন

শ্রীরাম বলেন, মুনি, তুমি অন্তর্য্যামী ।
সংসারের বিবরণ সব জান তুমি ॥

রাবণের জন্মকথা কহ দেখি শুনি ।
পরম-আনন্দ তবে পায় মহামুনি ।।
ব্রহ্ম-অংশে জন্ম তার সর্ব্বলোকে জানে ।
রাক্ষস হইল তবে কিসের কারণে ।।
মুনি বলে, রঘুনাথ, কহি তব স্থানে ।
রাক্ষসের জন্মকথা শুনহ এক্ষণে ।।
যেমতে রাবণ জন্মে শুন রঘুমণি ।
সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আগে সৃজিলেন প্রাণী ।।
প্রাণিগণ বলে, ব্রহ্মা, করি নিবেদন ।
কোন্ কার্য্যে আমা সবে করিলে সৃজন ।।
ব্রহ্মা বলে যত প্রাণী করিব উৎপত্তি ।
তোমরা করিবে রক্ষা প্রাণের শকতি ॥
যে যে প্রাণীরে সৃজন করিব সংসারে ।
তোমরা প্রধান হয়ে পালিবে সবারে ॥
প্রাণিগণ বলে, ব্রহ্মা, সে বড় দুষ্কর ।
না চাহি প্রভুত্ব মোরা সবার উপর ॥
ব্রহ্মা শাপ দিলা, বেটা, হও রে রাক্ষস ।
হেতি নামে হইল সে রাক্ষস কর্কশ ॥
বিদ্যুৎকুমারী নামে ব্রহ্মার কুমারী ।
তারে বিভা করিল রাক্ষস দুরাচারী ॥
মন্দর পর্ব্বতে দুইজনে ক্রীড়া করে ।
জন্মিল সন্তান এক কত দিন পরে ॥
পর্ব্বতের উপরেতে ফেলিয়া সন্তানে ।
মনের আনন্দে তারা রহে দুইজনে ॥
পিতামাতা স্নেহ নাই সন্তান উপর ।
কাতর হইয়া শিশু কান্দিল বিস্তর ॥
অশ্রুজলে শ্রমজলে কলেবর ভাসে ।
ক্ষুধাতে আকুল প্রাণ ঘন বহে শ্বাসে ॥
বৃষভ বাহনে যান পার্ব্বতী শঙ্কর ।
শূন্য হৈতে দেখিতে পাইলা গঙ্গাধর ॥
শিব বলেন, পার্ব্বতী, দেখ অতি দূরে ।
একাকী কান্দিছে শিশু পর্ব্বত উপরে ॥
মহেশের দয়া হৈল সন্তান উপর ।
প্রসন্ন হইয়া শিব তারে দিলা বর ॥
শিব বলে শুন ওহে অনাথ সন্তান ।
মম বরে পিতৃতুল্য হও বলবান ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ হও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ।
আজ্ঞামাত্রে হৈল শিশু বাপের সোসর ॥
বিদ্যুৎকুমারী পুত্র সুকেশ নাম ধরে ।
মহাবলবান্ হৈল ধূর্জ্জটীর বরে ॥

মালী, সুমালী ও মাল্যবানের জন্ম

তবে সুকেশেরে বর দিলেন পার্ব্বতী ।
তাহা হৈতে যত রাক্ষস উৎপত্তি ॥
পার্ব্বতীর বরে তার বাড়িল সম্মান ।
তাহারে গন্ধর্ব্ব এক কন্যা দিল দান ॥
স্ত্রী পুরুষে রহিলেক পৃথিবী ভিতরে ।
তিন পুত্র হৈল তার কতদিন পরে ॥
পুত্র দেখি সুকেশ পরম কুতূহলী ।
নাম রাখে মাল্যবান্ মালী ও সুমালী ॥
তিন ভাই মিলি তপ করিল বিস্তর ।
ব্রহ্মা বলে কিবা বর চাহ নিশাচর ॥
মন্ত্রণা করিয়া বর মাগে তিনজন ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিব ত্রিভুবন ॥
সংগ্রামেতে কোথাও না হই অপমান ।
এই বর দিতে ব্রহ্মা করহ বিধান ॥
ব্রহ্মা বলে ত্রিভুবনজয়ী হবে সবে ।
সংগ্রাম বিষ্ণুর ঠাঁই পরাভব হবে ॥
ব্রহ্মার বরেতে তারা ত্রিভুবন জিনে ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব ধরি বেঁধে বেঁধে আনে ॥
আছিল গন্ধর্ব্ব রাজা শৈব সদাচারী ।
তিন কন্যা ভূপতির পরমা সুন্দরী ॥
বিভা কৈল মালী ও সুমালী মাল্যবান্ ।
দুই নারী গর্ভে জন্মে এগার সন্তান ॥

বীরবসু সুচিক সে যজ্ঞ ও কোপন।
তালভঙ্গ সিংহনাদ মাধবনন্দন ॥
প্রহস্ত ও অকম্পন ধর্ম্মেতে বিকট।
শোণিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ রণেতে উৎকট ॥
সত্রাজিত নামে পুত্র প্রবল প্রখর।
দুর্জনার পুত্র হৈল বিষম দুষ্কর ॥
অবশেষে কন্যা হৈল দুষ্কর কর্কশা।
রাবণের মাতা সেই নামটী নিকষা ॥
সুমালী রাক্ষস নারী পবমা যুবতী।
চারি পুত্র হৈল তার ধর্ম্মশীল অতি ॥
বীর ও অনল ভীম রাক্ষস সম্পাতি।
রহিয়াছে আসি বিভীষণের সংহতি ॥
তিন ভাই পরিবার বাড়িল বিস্তর।
সেই সব নিশাচর অবনী ভিতর ॥
সকল রাক্ষস মিলি করিল যুকতি।
বাড়িল রাক্ষস কোথা করিব বসতি ॥

লঙ্কাপুরীতে রাক্ষসরাজ্য স্থাপন

ব্রহ্মার বরেতে তারা ত্রিভুবন জিনে।
হাতে গলে বান্ধিয়া যে বিশ্বকর্ম্মা আনে ॥
নিশাচর বলে বিশ্বকর্ম্মা লহ প্রাণ।
রাক্ষসের পুরী তুমি করহ নির্ম্মাণ ॥
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা হইল চিন্তিত।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত মনে পড়ে আচম্বিত ॥
গরুড়পবনে যুদ্ধ হৈল যেই কালে।
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে সমুদ্রের জলে ॥
ত্রিকূট গিরির সে প্রধান দুই চূড়া।
সত্তরি যোজন তার পরিমাণ গোড়া ॥
সত্তরি যোজন ঊর্দ্ধে লেগেছে আকাশে।
সোনার প্রাচীর বেড়া ভিতর আবাসে ॥
বাহির চৌয়ারি তার মনোহর অতি।
অতি ভয়ঙ্কর নাহি পবনের গতি ॥
দেব দৈত্য যেতে নারে লঙ্কার ভিতর।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল পুরী মনোহর ॥
কত শত পুষ্পবন কত সরোবর।
কত শত বৃন্দ মহাপদ্ম কোটী ঘর ॥
সোণার কপাট খিল শোভে চারি দ্বারে।
ভয়ঙ্কর পুরী হেন নাহিক সংসারে ॥
চারিদিকে অপার সমুদ্র আছে ঘিরে।
ভুবনের শক্তিতে তা লঙ্ঘিতে না পারে ॥
যাইতে দেবতা যক্ষ না করে সাহস।
নেতের পতাকা উড়ে সোণার কলস ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে এমন নাহি স্থান।
এক মাসে বিশ্বকর্ম্মা করিল নির্ম্মাণ ॥
পুরী দেখে রাক্ষসের হর্ষ হৈল অতি।
লঙ্কাতে রাক্ষসগণ করিল বসতি ॥
আগেতে করিল রাজ্য মালী ও সুমালী
তার পরে ভূপতি কুবের মহাবলী ॥
তাহার পশ্চাতে রাজ্য করিল রাবণ।
অবশেষে ভূপতি হইল বিভীষণ ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
'কহ কহ' বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥

গজকচ্ছপের বৃত্তান্ত

শ্রীরাম বলেন মুনি কহ বিবরণ।
ভাঙ্গিল সুমেরু শৃঙ্গ কিসের কারণ ॥
কি লাগিয়া বিসম্বাদ গরুড় পবনে।
বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনি তব স্থানে ॥
মুনি বলে শুন রাম অপূর্ব্ব কথন।
গরুড় পবনে যুদ্ধ হৈল কি কারণ ॥
সন্তাপন নামে বিপ্র ছিল পূর্ব্বকালে।
তিন কোটি ধন রাখি স্বর্গবাসে চলে ॥
সন্তাপনের দুই পুত্র পরম সুন্দর।
সুপ্রতাপ বিভাস এ দুই সহোদর ॥

জ্যেষ্ঠ পুত্রে স্থানে ধন থুয়ে গেল বাপে।
কনিষ্ঠ করেন দ্বন্দ্ব ধনের সন্তাপে ॥
ধনশোকে কনিষ্ঠ যে হইল দুঃখিত।
জ্যেষ্ঠেরে কহেন ভাগ দেহ সমুচিত ॥
জ্যেষ্ঠ বলে পিতা ভাগ না করিল ধন।
মম স্থানে ভাগ তুমি চাহ কি কারণ ॥
ধন না পাইয়া কহে বশিষ্ঠের ঠাঁই।
পিতৃধন অংশ নাহি দেয় জ্যেষ্ঠ ভাই ॥
কত অংশ পাই আমি বলহ এখন।
সেই দাওয়া করিয়া লব পিতৃধন ॥
বশিষ্ঠ বলেন আছে বেদের বিহিত।
পঞ্চাংশের দুই অংশ তোমার উচিত ॥
কনিষ্ঠ কহিল গিয়া জ্যেষ্ঠ বিদ্যমান।
পিতৃধন দুই অংশ দেহ ত এখন ॥
আমি গিয়াছিনু, ভাই, বশিষ্ঠের স্থানে।
বশিষ্ঠ বলিলা ভাগ নাহি দেয় কেনে ॥
জ্যেষ্ঠ বলে কনিষ্ঠ করিলে হেন কেনে।
জাতি নাশ করিলে যে কহি অন্য স্থানে ॥
হীনজন জ্ঞান বুঝি কৈলা মুনিবর।
ধনেব লাগিয়া এত হইলে কাতর ॥
বারে বারে নিষেধিনু না শুনিলে কাণে।
গজ হয়ে, পাপিষ্ঠ, প্রবেশ কর বনে ॥
কনিষ্ঠ দিলেন শাপ জ্যেষ্ঠের উপরে।
কচ্ছপ হইয়া তুমি থাক সরোবরে ॥
দুয়ের শাপেতে জন্তু হয় দুই জন।
কনিষ্ঠ গজের দেহ করিল ধারণ ॥
যোজন দশেক দেহ কনিষ্ঠ ধরিল।
গজের গর্জ্জনে গিয়া বনে প্রবেশিল।
কচ্ছপ সলিলে গেল গজ গেল বন।
শুণ্ডের ভিতরে গজ রাখে যত ধন ॥
যতন করিয়া ধন যেই জন রাখে।
খাইতে না পায় ধন যায় ত বিপাকে ॥
ধন পেয়ে যে জন না করে বিতরণ।
যথাকায় ধন তথা যায় অকারণ ॥
ধনেতে বিরোধ বাধে শুন মহাশয়।
যত ব্যয় করে তত পরলোকে হয় ॥
বশিষ্ঠের শাপে ধন নাহি পায় রক্ষা।
গজকচ্ছপের শুন ধনের পরীক্ষা ॥
ধনের বৃত্তান্ত এই কহি তব স্থানে।
গজকচ্ছপের কথা শুন সাবধানে ॥
জলেতে কচ্ছপ আছে যেই সরোবরে।
দৈবযোগে গেল গজ জল খাইবারে ॥
প্রখর রৌদ্রেতে গজ তৃষ্ণায় বিকল।
সরোবর দেখি গজ খেতে গেল জল ॥
গজ দেখি গচ্ছপের পড়ে গেল মনে।
পূর্ব্বলোভে কচ্ছপে সে শুণ্ডে ধরে টানে ॥
গজ টানে বনেতে কচ্ছপ টানে জলে।
গজ আর কচ্ছপ যে তুল্য হয় বলে ॥
কেহ নাহি জিনে কারে উভয়ে সোসর।
দুইজনে টানাটানি একটি বছর ॥
বিনতানন্দন গরুড় উড়ে অন্তরীক্ষে।
অন্তরীক্ষে থাকি সে যুদ্ধ এই দেখে।
একবর্ষ যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর।
কেহ নাহি কারে জিনে একটি বছর ॥
কাতর হইয়া গজ স্মরে নারায়ণ।
পাপদেহ, নারায়ণ, কর বিমোচন ॥
গজেরে কাতর দেখি গরুড়ে দয়া হৈল।
বাম পায়ের নখ দিয়া দোঁহারে তুলিল ॥
গজকূর্ম্ম লয়ে পক্ষী উড়িল তখন।
মনে করে কোথা লয়ে করিব ভক্ষণ ॥
শ্যামবর্ণ বটবৃক্ষ শতযোজন ডাল।
অশীতি যোজন মূল নেমেছে পাতাল ॥
চারিগোটা ডাল তার পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তরি যোজন যুড়ি আছে তার গোড়া ॥

গজকূর্ম্ম লৈয়া বৈসে গাছের উপর।
সহিতে না পারে বৃক্ষ তিন জন ভর॥
ভর নাহি সহে ডাল মড় মড় করে।
ডাল ভাঙ্গি পড়ে যদি মুনিগণ মরে॥
ডান পায়ের নখে গরুড় ধরে ডালে।
মুনিগণ এড়াইল থাকি বৃক্ষতলে॥
ফেলিল সে ডাল লয়ে চণ্ডালের দেশে।
ডালের চাপানে মরে নারী ও পুরুষে॥
বহু পাপে হৈয়াছিল চণ্ডাল জনম।
গরুড়ের হাতে পাপ হইল মোচন॥
গজকূর্ম্ম লয়ে গেল ব্রহ্মার সদন।
বল ব্রহ্মা কোথা লয়ে করিব ভক্ষণ॥
ব্রহ্মা বলে কোথা সহিবেক এত ভর।
গজকূর্ম্ম লয়ে যাহ সুমেরু শিখর॥
তথা গজকচ্ছপেরে করহ ভক্ষণ।
ব্রহ্মার বচনে পক্ষী চলে ততক্ষণ॥
পর্ব্বত উপরে বৈসে করিতে ভক্ষণ।
হেন কালে আইল তথা দেবতা পবন॥
পবন বলেন, পক্ষী, তুমি কেন হেথা।
মোর ঠাঁই পড়িলে ছিণ্ডিব তব মাথা॥
যাবৎ তোমার নাহি করি অপমান।
আপনা জানিয়া, বেটা, যাহ নিজ স্থান॥
গরুড় কহেন তুমি গালি কেন পাড়।
উপযুক্ত শাস্তি দিব অহঙ্কার ছাড়॥
গরুড়ের বচনে পবন ক্রোধে বলে।
ফেলিব পর্ব্বত ঠেলে সমুদ্রের জলে॥
গরুড় বলেন, বায়ু, বড়াই না কর।
সুমেরু পর্ব্বত তুমি নাড়িতে কি পার॥
গরুড় বচনে পবন ক্রোধে বাড়ে।
পর্ব্বত সমেত চাহে উড়াইতে ঝড়ে॥
প্রলয় হইল যেন পর্ব্বত উপরে।
দুই পাখে গিরি ঢাকে বিনতাকুমারে॥
বাড়াইয়া কৈল পাখা সহস্র যোজন।
পাখা দেখি পবন ভাবেন মনে মন॥
গরুড়ের পাখা যেন বজ্রের সোসর।
সাতদিন শিলাবৃষ্টি পাখার উপর॥
মেঘের গর্জন আর পড়িছে ঝঞ্ঝনা।
পর্ব্বতের তবু নাহি নড়ে এক কোণা॥
প্রলয় কালেতে যেন সৃষ্টি হয় নাশ।
দেখি যত দেবগণ গণিলা তরাস॥
ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসা করে যত দেবগণ।
আচম্বিতে এ প্রলয় হয় কি কারণ॥
দেবতার এত বাক্য শুনি প্রজাপতি।
দেবগণে লয়ে তবে যান শীঘ্রগতি॥
ব্রহ্মা বলিলেন শুন দেবতা পবন।
আচম্বিতে প্রলয় করহ কি কারণ॥
সৃষ্টি সৃজিলাম আমি অতিশয় ক্লেশে।
হেন সৃষ্টি নষ্ট কর যুক্তি না আইসে॥
না শুনে ব্রহ্মার বাক্য কহিছে পবন।
প্রলয় যাহাতে হয় করিব সে রণ॥
পবনের ঠাঁই ব্রহ্মা শুনি সে উত্তর।
বিরস হইয়া তবে চলিল সত্বর॥
পবনে এড়িয়া যায় গরুড় গোচরে।
বিরিঞ্চি বলেন, পক্ষী, বলি হে তোমারে॥
আমি সৃষ্টি করিলাম তুমি কর রক্ষা।
এক দিক হৈতে তুমি তুলি লহ পাখা॥
ব্রহ্মার বচনেতে গরুড়ে হৈল হাস।
তোমার বচনে পাখা করিব প্রকাশ॥
ব্রহ্মা বলে যে যেমন আমি তাহা জানি।
শত যুগে পবন তোমারে নাহি জিনি॥
ব্রহ্মার বচনেতে গরুড় পক্ষী হাসে।
তবে গরুড় পাখা করিল প্রকাশে॥
গরুড় তুলিতে পাখা গিরিবর নড়ে।
ঝড়েতে সে পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ পড়ে॥

চিত্রকূট পর্ব্বত আছে সাগর ভিতরে।
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে তাহার উপরে ।।
লঙ্কানামে পুরী তাহে কৈল বিশ্বকর্ম্ম।
এইরূপে, শ্রীরাম, লঙ্কার হৈল জন্ম ।।

মালীর মৃত্যু এবং সুমালী ও মাল্যবানের পাতালে প্রবেশ

মাল্যবান্ রাক্ষস লঙ্কায় রাজ্য করে।
ত্রিভুবন জিনিল সে পিতামহ বরে ।।
মনে করে আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
সকল দেবতা মেরে ঘুচাইব ডর ।।
তবে দেবগণ গেল শিবের গোচর।
কহিল বৃত্তান্ত সদাশিব বরাবর ।।
সুকেশের সন্তান দুরন্ত নিশাচর।
বড়ই দৌরাত্ম্য করে স্বর্গের উপর ।।
বিশ্বনাথ বলেন শুনহ দেবগণ।
মারিতে আমার সাধ্য নহে কদাচন ।।
হইয়াছে দুর্জ্জয় ব্রহ্মার পেয়ে বর।
মরিবে আপন দোষে দুষ্ট নিশাচর ।।
দেব দেবী বিপ্র হিংসা করে যেই জন।
আপনার দোষে মরে বেদের লিখন ।।
এক উপদেশ বলি শুন দেবগণ।
রাক্ষস মারিতে পারে দেব নারায়ণ ।।
রাক্ষসের কথা গিয়া কহ নারায়ণে।
অবশ্য বিহিত হবে শুন দেবগণে ।।
মহেশের আজ্ঞা পেয়ে যতেক অমরে।
উপনীত হৈল গিয়া বৈকুণ্ঠ নগরে ।।
সম্ভ্রমে দেবতাগণ হয়ে প্রণিপাত।
রাক্ষসের কথা কহে করি যোড়হাত ।।
সুকেশ রাক্ষস এক ছিল অবনীতে।
তিনপুত্র হৈল তার বুদ্ধি বিপরীতে ।।
দেব দ্বিজ হিংসা করি ফিরে অনুক্ষণ।
স্বর্গপুরে থাকিতে না পারে দেবগণ ।।
মারে শেল শূল জাঠা লোটে সব নারী।
ছিন্নভিন্ন করিয়াছে অমর নগরী ।।
ব্রহ্মার বরেতে তারা কারে নাহি মানে।
যক্ষরক্ষ কিন্নরাদি নাহি আঁটে রণে ।।
সংসারের কর্ত্তা তুমি দেব গদাধর।
রাক্ষস মারিয়া রক্ষা করহ অমর ।।
দেবতার ত্রাস দেখি নারায়ণে হাস।
সুখেতে অমরপুরে কর গিয়া বাস ।।
তোমা সবে হিংসে যদি দুষ্ট নিশাচর।
সেইক্ষণে রাক্ষসে পাঠাব যমঘর ।।
আশ্বাস করিল যদি দেব নারায়ণ।
নির্ভয়ে অমরপুরে গেলা দেবগণ ।।
জানিয়া নারদ মুনি এ সব সংবাদে।
চলিলেন লঙ্কাপুরে পরম আহ্লাদে ।।
বসিয়াছে তিন ভাই রত্ন সিংহাসনে।
মুনি দেখি সমাদর কৈল তিনজনে ।।
প্রণাম করিয়া দিল রত্ন সিংহাসন।
জিজ্ঞাসিল কহ মুনি শুনি বিবরণ ।।
লঙ্কাপুরে আগমন কিসের কারণ।
বলহ হেথায় তব কোন্ প্রয়োজন ।।
মুনি বলে তোমাদের হিত চিন্তা করি।
অমঙ্গল শুনিয়া আইনু লঙ্কাপুরী ।।
এক ঠাঁই মিলিয়াছে যত দেবগণ।
যুক্তি করি গিয়াছিল বিষ্ণুর সদন ।।
কহিয়াছে তোমাদের কথা নারায়ণে।
শ্রীহরি করিবে যুদ্ধ তোমাদের সনে ।।
হয়েছে মন্ত্রণা এই বৈকুণ্ঠ ভুবনে।
শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হৈল মনে ।।
আমার পিতার ভক্ত যত নিশাচর।
বিশেষ অধিক স্নেহ তোদের উপর ।।

এ কারণে আইলাম দিতে সমাচার।
মঙ্গলের পথ চিন্তা কর আপনার ॥
এত বলি মুনিবর হইলা বিদায়।
নিশাচরগণ ভাবে হবে কি উপায় ॥
একত্রে বসিয়া যুক্তি করে তিনজন।
হেনকালে ব্রহ্মা এল রাক্ষস সদন ॥
তাহার পুরেতে এই শুনি সমাচার।
মনেতে অধিক দুঃখ উপজে ব্রহ্মার ॥
যত নিশাচর সব ব্রহ্মার আশ্রিত।
রাক্ষসের মঙ্গল চিন্তেন অবিরত ॥
শুনি অমঙ্গল বাক্য বুঝাইতে হিত।
ক্রোধভরে লংকাপুরে হৈলা উপনীত ॥
ব্রহ্মা দেখি সম্ভ্রমে উঠিল তিনজন।
প্রণাম করিয়া করে চরণ বন্দন ॥
ভক্তিভাবে বসাইল রত্ন সিংহাসনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল চরণে ॥
যোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিল তিনজন।
আজ্ঞা কর কিবা হেতু লংকা আগমন ॥
এত দিনে পবিত্র হইল লংকাপুরী।
যা মনে বাসনা কর সেই কর্ম্ম করি ॥
ব্রহ্মা বলে সর্ব্বদা বাসনা করি মনে।
লংকাতে করহ রাজ্য পরম কল্যাণে ॥
থাকিলে আমার বাঞ্ছা হইবে কি কর্ম্ম।
ছাড়িতে নারিবি তোরা স্বজাতীয় ধর্ম্ম ॥
দেব দ্বিজ হিংসা কর পাপকর্ম্মে মতি।
দুরাচার স্বভাবেতে ঘটিবে দুর্গতি ॥
তিনলোক উপরেতে অমরের পুরী।
দেবতাগণের বাস তাহার উপরি ॥
হোম যজ্ঞ ভাগ দিয়া যে অর্চ্চনা করে।
লইতে যজ্ঞের ভাগ যান তার ঘরে ॥
কারো মন্দকারী নহে দেবগণ যত।
ভক্তিভাবে যেই ডাকে তার অনুগত ॥

মুনিগণ ঋষিগণ থাকে তপস্যাতে।
দেখ মন্দকারী কেহ নহে কোনমতে ॥
দেব দ্বিজ দুই তুল্য ধর্ম্মপথে মন।
তার হিংসা যে করে সে দুর্ম্মতি দুর্জ্জন ॥
অতি অল্প আয়ু তোরা ধর্ম্মেতে বিহীন।
দেব হিংসা করিয়া বাঁচিবি কত দিন ॥
হইয়াছে এক যুক্তি যত দেবগণ।
দেবতার সহায় হয়েছে নারায়ণ ॥
বিষ্ণু সনে যুঝিবেক কাহার শকতি।
একজন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি ॥
এত বলি কোপমনে ব্রহ্মার গমন।
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে তিনজন ॥
মাল্যবান্ বলে ভাই শংকা ত্যজ মনে।
তিনজনে যুদ্ধ করি মার নারায়ণে ॥
মাল্যবান্ কথা শুনি কহিছে সুমালী।
শুনিয়াছি নারায়ণ বলে মহাবলী।
হিরণ্যকশিপু আদি করেছে সংহার।
হেন বিষ্ণু মারে বল শক্তি আছে কার ॥
মালী বলে সংগ্রামেতে বিনাশিব তারে।
আর যেন দেবগণ যুদ্ধ নাহি করে ॥
বিষ্ণু বড় কুচক্রী কুযুক্তি যত তার।
সে মরিলে দেবগণের টুটে অহংকার ॥
তিন ভাই মিলে আগে মারি নারায়ণ।
পশ্চাতে মারিব আছে যত দেবগণ ॥
মুনি ঋষি মারিব মারিব সিদ্ধ যতি।
ঘুচাইব দেবতার স্বর্গের বসতি ॥
এত বলি তিনজনে যুক্তি কৈল সার।
ঘোড়া হাতী রথ রথী সাজিল অপার ॥
তুলিল কটক ঠাট রথের উপরে।
বৈকুণ্ঠে চলিল তারা বিষ্ণু জিনিবারে ॥
সিংহনাদে ঘোর শব্দ করে ঘনেঘন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া দিল দরশন ॥

গরুড় বাহনেতে আইলা নারায়ণ।
নারায়ণ সম্মুখেতে বাজে মহারণ ॥
মহাকোপে নানা অস্ত্র মারে নিশাচর।
বাণবৃষ্টি করিতেছে বিষ্ণুর উপর ॥
ছাইল গগনপথ দিগদিগন্তর।
পড়িছে অসংখ্য বাণ পট্টিশ তোমর ॥
জাঠা জাঠি গেল শূল মুষল মুদ্গর।
লেখাজোখা নাহি বাণ পড়িছে বিস্তর ॥
নারায়ণ বীরদাপে ত্রিভুবন নড়ে।
রাক্ষসের সৈন্য সব মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে ॥
কুপিয়া সুমালী মালী রণে আগুসরে।
দুহাতিয়া বাড়ি মারে গরুড়ের শিরে ॥
ঝঞ্জনা চিকুর সম গদাবাড়ি পড়ে।
বিষ্ণু লয়ে গরুড় পলায় উভরড়ে ॥
গরুড়ের ভঙ্গ দেখি মাল্যবান্ হাসে।
শ্রীহরি ফিরান তারে করিয়া আশ্বাসে ॥
বিষ্ণু বলেন, গরুড় তিল থাক রণে।
পাঠাব রাক্ষসগণে যমের সদনে ॥
তোমার সংগ্রামে ত্রিভুবনে লাগে ভয়।
রাক্ষসের রণে পলাও উচিত না হয় ॥
উলটিয়া গরুড় আইল মহারণে।
চক্রবাণ বিষ্ণু এড়িলেন ততক্ষণে ॥
চক্রবাণে মালীর মস্তক কাটি পড়ে।
মাল্যবান্ সুমালী পলায় উভরড়ে ॥
পুনঃ ফিরে নিশাচর নাহি দেয় ভঙ্গ।
লোহার মুদ্গর হানে ভয়ে কাঁপে অঙ্গ ॥
মাল্যবান্ বলে তুমি থাকহ শ্রীহরি।
আজি রণে তোমারে পাঠাব যমপুরী ॥
শ্রীহরি বলেন বেটা শোন মাল্যবান।
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি দেবতার স্থান ॥
অভয় লইয়া গেছে যতেক অমর।
তোরে মেরে ঘুচাইব দেবতার ডর ॥
অবনীতে থাকিলে বধিব সবাকারে।
প্রাণ লয়ে যাহ বেটা পাতাল ভিতরে ॥
মাল্যবান্ বলে, বিষ্ণু, কথা বড় টান।
রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে হারাইবি প্রাণ ॥
মালসাট দিয়া তবে গেল মাল্যবান্।
যত শক্তি আছে তোর তত শক্তি হান ॥
বিক্রম করিয়া রহে হরির সম্মুখে।
অগ্নিবাণ শ্রীহরি মারেন তার বুকে ॥
অগ্নিবাণে রাক্ষসের সর্ব্ব অঙ্গ পোড়ে।
সহিতে না পারে বীর ধায় উভরড়ে ॥
শ্রীহরির কোপেতে রাক্ষসে লাগে ডর।
পলায়ে রাক্ষস গেল পাতাল ভিতর ॥
হরির ভয়েতে সবে প্রবেশে পাতাল।
কুবের লঙ্কায় বসি করে ঠাকুরাল ॥
প্রথমে লঙ্কাতে রাজা মালী ও সুমালী।
পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী ॥
চৌদ্দযুগ রাজ্য করে লঙ্কায় রাবণ।
তোমার প্রসাদে রাজা এবে বিভীষণ ॥
রাবণে বধিলা তুমি শক্তি অতিশয়।
রাবণ হইয়াছিল রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি রামের উল্লাস।
'কহ কহ' বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥

কুবেরের জন্ম, তপস্যা ও লঙ্কায় রাজত্ব

শ্রীরাম বলেন, মুনি, করি নিবেদন।
ব্রহ্ম অংশে রাক্ষস জন্মিল কি কারণ ॥
তেমনি সন্তান হয় যেমন ঔরস।
ব্রাহ্মণের বীর্য্যে কেন জন্মিল রাক্ষস ॥
বিশ্রবার পুত্র যে কুবের দশানন।
দুই ভাই দুই জাতি হৈল কি কারণ ॥
কুবের হইল যক্ষ রাক্ষস রাবণ।
এক পিতা দুই জাতি হৈল দুই জন ॥

বিশ্রবার দুই পুত্র সর্ব্বলোকে জানি।
রাবণ রাক্ষস কেন কহ মহামুনি ॥
অগস্ত্য বলেন, রাম, কর অবধান।
রাবণের জন্মকথা কহি তব স্থান ॥
মহামুনি পুলস্ত্য যে ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মার সমান মহাতপে তপোধন ॥
সুমেরু পর্ব্বতে থাকে যোগাসন করি।
ক্রীড়া করিবারে এল অনেক সুন্দরী ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব কন্যা আইল বিস্তর।
সখী সখা মিলি কেলি করে নিরন্তর ॥
তৃণবিন্দু মুনিকন্যা রূপেতে অপ্সরা।
ত্রৈলোক্যমোহিনী ধনী নাম স্বয়ম্বরা ॥
মুনি থাকে তপস্যাতে মুদি দুই আঁখি।
সেইখানে নিত্য আসে কন্যা শশিমুখী ॥
নাচে গায় মুনির নিকটে করে রঙ্গ।
প্রতিদিন মুনির তপস্যা করে ভঙ্গ ॥
কোপেতে পুলস্ত্যমুনি শাপ দিল তারে।
বিনা পুরুষেতে গর্ভ হইবে উদরে ॥
তবু নাহি শুনে কন্যা নাচে গায় সুখে।
কোপেতে পুলস্ত্য পুনঃ শাপিলেন তাকে ॥
না শুন আমার কথা কোন্ অহঙ্কারে।
মুনিশাপে কন্যার সে স্তনে দুগ্ধ ঝরে ॥
ভয় পেয়ে কন্যা গেল বাপের আলয়।
কন্যার দুর্গতি দেখি পিতা স্তব্ধ হয় ॥
তৃণবিন্দু শুনিয়া সকল বিবরণ।
পুলস্ত্য নিকটে গেল মলিন বদন ॥
প্রণাম করিল গিয়া পুলস্ত্যের পায়।
জিজ্ঞাসা করিল মুনি বসতি কোথায় ॥
তৃণবিন্দু বলে থাকি এই গিরিপুরে।
দিয়াছ দারুণ শাপ আমার কন্যারে ॥
অনূঢ়া কন্যার গর্ভ শুনি লাগে ত্রাস।
স্তনযুগে দুগ্ধ ঝরে এ কি সর্ব্বনাশ ॥
মুনি বলে তব কন্যা বড়ই চঞ্চলা।
ভাঙ্গিল তপস্যা মোর করি অবহেলা ॥
করিল কুকর্ম্ম যে যৌবন-অহঙ্কারে।
দিয়াছি তাহার মত প্রতিফল তারে ॥
তৃণবিন্দু বলে দোষ ক্ষম মহাশয়।
তুমি না করিলে দয়া সর্ব্বনাশ হয় ॥
মুনি বলিলেন আর কি আছে উপায়।
বলেছি যে কথা তাহা খণ্ডন না যায় ॥
তৃণবিন্দু বলে, মুনি, কর অবধান।
পরম তপস্বী তুমি ব্রহ্মার সমান ॥
তোমার অসাধ্য কিছু নাহিক সংসারে।
ইহাতে সকলি তুমি পার করিবারে ॥
বালিকা আমার কন্যা বিবাহ না হয়।
হেন কন্যা গর্ভবতী শুনি লাগে ভয় ॥
শাপেতে হইল গর্ভ কেহ না বুঝিবে।
বলহ কেমনে, মুনি, জাতি রক্ষা হবে ॥
মুনি বলে, তৃণবিন্দু, কি আছে যুকতি।
কিরূপে হইবে তব কন্যার নিষ্কৃতি ॥
তৃণবিন্দু বলে যদি হইলে সদয়।
সেই কন্যা বিভা তুমি কর মহাশয় ॥
মুনির হইল মন বিভা করিবারে।
তৃণবিন্দু কন্যাদান করিল মুনিরে ॥
করিল মুনির সেবা কন্যা গুণবতী।
মুনি তারে দিল বর হয়ে হৃষ্টমতি ॥
মম শাপে গর্ভ হয়ে পেলে অপমান।
মম বরে প্রসবিবে উত্তম সন্তান ॥
সেই গর্ভে জন্মেন বিশ্রবা মহামুনি।
ভরদ্বাজ কন্যা বিভা করিলেন তিনি ॥
ভরদ্বাজ মুনিকন্যা নাম তার লতা।
তার গর্ভে জন্মিলা কুবের মহারথা ॥
বিশ্রবার ঔরসেতে কুবেরের জন্ম।
কুবের করিল তপ আরাধিয়া ধর্ম্ম ॥

কুবের করিল তপ সহস্র বৎসর।
তার তপ দেখিয়া ব্রহ্মার লাগে ডর ॥
ব্রহ্মার বরেতে কুবের হইল অমর।
অমর হইল আর হৈল ধনেশ্বর ॥
পবন বরুণ যম অগ্নি পুরন্দর।
সবে মিলে কুবেরেরে দিলা বহু বর ॥
পাইল পুষ্পক রথ কি কব বাখান।
আপনার হাতে ব্রহ্মা করিলা নির্ম্মাণ ॥
রথসজ্জা করি দিল রথের সারথি।
রাজহংস বহে রথ পবনের গতি ॥
দশ যোজন রথখান অতি সুচিকণ।
পৃথিবী ভ্রমিতে পারে যদি করে মন ॥
বর পেয়ে কুবেরের হর্ষ হৈল মনে।
প্রণাম করিল গিয়া বাপের চরণে ॥
অতুল ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মা দিলা বরদান।
সবে মাত্র নাহি দিলা থাকিবার স্থান ॥
পিতার নিকটে যক্ষ করিল মিনতি।
আজ্ঞা কর কোথা, পিতা, করিব বসতি ॥
বিশ্রবা বলেন তুমি ধন অধিকারী।
তোমার বসতিযোগ্য স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ॥
রাক্ষসের রাজ্য সেই পুরী মনোহর।
রাক্ষস পলায়ে গেছে পাতাল ভিতর ॥
কুবের বলেন, পিতা, করি নিবেদন।
রাক্ষস পলায়ে গেছে কিসের কারণ ॥
বিশ্রবা বলেন দুষ্ট নিশাচরগণ।
দুষ্ট দেখি হইলেন রিপু নারায়ণ ॥
বিষ্ণুর সঙ্গেতে যুদ্ধ করিল বিস্তর।
বিষ্ণুচক্রে মরিল অনেক নিশাচর ॥
কোপেতে করিল আজ্ঞা দেব শ্রীনিবাস।
পৃথিবীতে থাকিলে করিব সর্ব্বনাশ ॥
বিষ্ণুভয়ে ভঙ্গ দিল যত নিশাচর।
লুকায়ে রয়েছে গিয়া পাতাল ভিতর ॥
সে অবধি শূন্য পড়ে আছে লঙ্কাপুরী।
তথা গিয়া থাক পুত্র, ধন অধিকারী ॥
পিতৃ আজ্ঞা পেয়ে সে কুবের হৃষ্টমতি।
লঙ্কার ভিতরে গিয়া করেন বসতি ॥

রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম, তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি

আকাশে কুবের চলে পুষ্পকে চড়িয়া।
রাক্ষসেরা দেখে তাহা পাতালে থাকিয়া ॥
দেখিয়া দ্বিগুণ খেদ বাড়িল অন্তরে।
রাক্ষসের স্বর্ণলঙ্কা লইল কুবেরে ॥
বসিয়া মন্ত্রণা করে লয়ে মন্ত্রিগণে।
কুবেরের স্থানে লঙ্কা লইব কেমনে ॥
বিশ্রবা সে অধিকারী হয়েছে লঙ্কার
পিতৃধন কুবের করেছে অধিকার ॥
পুনঃ যদি বিশ্রবার পুত্র এক হয়।
পিতৃধন বলি সে লঙ্কার অংশ লয় ॥
যদ্যপি দৌহিত্র হয় বিশ্রবানন্দন।
দুই দিকে অধিকারী হবে হেন জন ॥
এতেক মন্ত্রণা করি ভাবিল মনেতে।
বিশ্রবারে দান দিব আপন দুহিতে ॥
খলের স্বভাব খল ছাড়িতে না পারে।
কোপে ডাকে মাল্যবান্ আপন কন্যারে ॥
নিকষা তাহার নাম নবীন যৌবনী।
অকলঙ্ক শশিমুখি মরালগামিনী ॥
মৃগেন্দ্র জিনিয়া কটি রামরম্ভা উরু।
হরিণাক্ষী কামধনু জিনি যুগ্ম ভুরু ॥
জিনি রম্ভা তিলোত্তমা নিরুপমা নারী।
তিলফুল জিনি নাসা নিকষা সুন্দরী ॥
যৌবন তরঙ্গে বক্ষে ভঙ্গিমা সুঠাম।
পিতার চরণে আসি করিল প্রণাম ॥

মাল্যবান্ বলে এস প্রাণের কুমারী।
সাবিত্রীসমান হও আশীর্ব্বাদ করি॥
শুন বলি, কন্যা, তুমি রূপেতে রূপসী।
তাহাতে মায়াবী বড় জাতিতে রাক্ষসী॥
উপরোধ করি এই তোমার গোচর।
বিশ্রবার পাশে গিয়া মাগ পুত্রবর॥
পিতার বচনে অতি হইয়া লজ্জিতা।
'যে আজ্ঞা' বলিয়া চলে হইয়া ত্বরিতা॥
একে ত রূপসী বালা ভুবনমোহিনী।
করিয়া বিচিত্র সাজ চলে সুবদনী॥
মহামুনি বিশ্রবা সে রত তপস্যায়।
নিকষা বিচিত্র বেশে সম্মুখে দাঁড়ায়॥
বিশ্রবা জিজ্ঞাসে তারে কে তুমি রূপসি।
নিকষা কহিল আমি পুত্র অভিলাষী॥
পত্নী হয়ে আলয়েতে থাকিব তোমার।
মুনি বলে থাক প্রিয়ে গৃহেতে আমার॥
সর্ব্বমতে আদরিণী হবে মম বরে।
এক কন্যা তিন পুত্র ধরিবে উদরে॥
জ্যেষ্ঠপুত্র হবে অতি বিকৃত-আকার।
বাহুবলে শাসিবেক এ তিন সংসার॥
হইবে মধ্যম পুত্র সে অতি দুর্জ্জন।
অদ্ভুত ধরিবে বল অদ্ভুত ভক্ষণ॥
করিবেক অনাচার দেব দ্বিজ হিংসে।
আপনার দোষে তারা মরিবে সবংশে॥
কন্যা হবে দুরন্ত দুঃশীলা অতি লোভা।
সেই মজাইবে সৃষ্টি হইয়া বিধবা॥
কুলের উচিত পুত্র হইবে কনিষ্ঠ।
দেব দ্বিজ গুরুভক্ত ধর্ম্মশীল শ্রেষ্ঠ॥
এতেক কহিল যদি মুনি মহাশয়।
নিকষার দুই চক্ষে বারিধারা বয়॥
যোড়হাতে কহে তবে মুনির গোচর।
আমারে কেমন আজ্ঞা কৈলে মুনিবর॥
ঋষি তুমি তব পুত্র জন্মিবে যে জন।
ধর্ম্মশীল না হইবে এ আর কেমন॥
মুনি বলে বিষাদিত না হও সুন্দরি।
দৈবের ঘটনা আমি খণ্ডাইতে নারি॥
অগ্নির পতনকালে চাহিয়াছ বর।
অগ্নি হেন দুই পুত্র হইবে দুষ্কর॥
এত বলি বিশ্রবা তপস্যাতে যান।
নিকষা প্রসব কৈল চারিটি সন্তান॥
প্রথম সন্তান হয় অপূর্ব্ব গঠন।
দশ মুণ্ড কুড়ি বাহু বিংশতি লোচন॥
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ রাবণ ভুবন কাঁপে ডরে।
কুম্ভকর্ণে প্রসব করিল তার পরে॥
বিকৃত আকার দেহ বিষম-লক্ষণ।
তারে দেখে অন্তরে কাঁপিল দেবগণ॥
সূতিকা গৃহেতে এসেছিল যত নারী।
মুখে পূরে একেবারে সাপটিয়া ধরি॥
কন্যারত্ন ভূমিষ্ঠ হইল তার পরে।
মুখের গড়ন দেখি সবে কাঁপে ডরে॥
লিহ লিহ করে জিহ্বা বিপরীত মাথা।
নাকের নিশ্বাস তার কামারের জাঁতা॥
অঙ্গুলিতে নখ যেন কুলার আকার।
সূর্পণখা নাম তার বিখ্যাত সংসার॥
কন্যা দেখি নিকষার পুলকিত মন।
অবশেষে ভূমিষ্ঠ ধার্ম্মিক বিভীষণ॥
তিন পুত্র এক কন্যা হইল প্রসব।
শুভ সমাচার পাইল রাক্ষসেরা সব॥
অনেক রাক্ষস সঙ্গে এল মাল্যবান্।
বহু ধন রত্ন দিয়া করিল কল্যাণ॥
ক্ষণমাত্র দেখিয়া সুস্থির কৈল মন।
বিষ্ণুর ভয়েতে করে পাতালে গমন।
বিশ্রবার আশ্রমেতে নিকষা রহিল।
মনুষ্য আচারে তথা কতদিন গেল॥

দশানন বসি আছে নিকষার কোলে।
পিতা সম্ভাষিতে কুবের এল হেনকালে।
কুবের প্রণাম করে পিতার চরণে।
সঙ্কেতে নিকষা তারে দেখায় রাবণে॥
আসিয়াছে কুবের দেখহ বিদ্যমান।
বৈমাত্রেয় ভাই তোর যক্ষের প্রধান॥
বিধাতা দিয়াছে করি ধন অধিকারী।
সেই অহঙ্কারে ভোগ করে লঙ্কাপুরী॥
তোর মাতামহ নির্ম্মাইল এই লঙ্কা।
পেয়ে রাক্ষসের রাজ্য নাহি করে শঙ্কা॥
উহারে জিনিয়া লঙ্কা পার যদি নিতে।
তবে ত তাহার ব্যথা ঘুচিবে মনেতে॥
দশানন বলে, মাতা, না ভাব বিষাদে।
কেড়ে লব লঙ্কাপুরী তোমার প্রসাদে॥
কঠোর তপস্যা যদি করিবারে পারি।
কুবেরে জিনিয়া তবে লব লঙ্কাপুরী॥
শুনিয়া মায়ের খেদ হইয়া কাতর।
তপস্যা করিতে যায় হিমাদ্রি শিখর॥
কুম্ভকর্ণ দশানন আর বিভীষণ।
গোকর্ণ বনেতে তপ করে তিন জন॥
কুম্ভকর্ণ করে তপ বড়ই দুষ্কর।
ঊর্দ্ধপদে হেঁটমাথে থাকে নিরন্তর॥
গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালে চারিপাশে।
সে অগ্নির শিখা গিয়া লাগয়ে আকাশে॥
শীতকালে জলে থাকে দিবস রজনী।
নাহিক আহার নিদ্রা শ্বাসগত প্রাণী॥
কত দিনে ফল মূল করিল আহার।
রাক্ষসের তপ দেখি দেবে চমৎকার॥
কঠোর তপস্যা তারা করে তিনজন।
বৃক্ষের গলিত পত্র করয়ে ভক্ষণ॥
অনাহারে নিরন্তর বায়ু আহারেতে।
তিন ভাই তপস্যা করিল হেন মতে॥

নাহিক শিশির উষ্ণ নাহিক বরিষে।
করয়ে কঠোর তপ রাজ্য-অভিলাষে॥
মাথায় পিঙ্গল জটা বাকল পরিধান।
আচরিল তপস্যার যেমত বিধান॥
কাম ক্রোধ লোভ আদি ছাড়ি ছয় রিপু।
অস্থিচর্ম্মসার হৈল জীর্ণ হৈল বপু॥
তপস্যা করিল পাঁচ হাজার বছর।
রাক্ষসের তপস্যাতে ত্রিভুবনে ডর॥
যতেক দেবতাগণ চিন্তিত অন্তরে।
কাহার সম্পদ লবে দুষ্ট নিশাচরে॥
ইন্দ্র বলে আমার ইন্দ্রত্ব পাছে লয়।
চন্দ্রসূর্য ভাবে সদা কি জানি কি হয়॥
যম বলে লইবেক মম অধিকার।
পাতালে বাসুকি ভাবে কি হবে আমার॥
না জানি কি বর চাহে দুষ্ট নিশাচর।
সকল দেবতা গেল ব্রহ্মার গোচর॥
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহে সমাচার।
রাক্ষস তপস্যা করে অতি ভয়ঙ্কর॥
কি জানি কাহার পদ লইবে কাড়িয়া।
নিশাচরে সান্ত্বনা করহ তুমি গিয়া॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা গেলেন সত্বর।
ব্রহ্মা বলিলেন বর মাগ নিশাচর॥
রাবণ বলে বর যদি দিবে মহাশয়।
আমারে অমর বর দিতে আজ্ঞা হয়॥
ব্রহ্মা বলিলেন তুমি চাহ অন্য বর।
আমি না পারিব তোমা করিতে অমর॥
দুষ্ট নিশাচর জাতি নহ যে ধর্ম্মিষ্ঠ।
তোমরা অমর হৈলে মজাইবে সৃষ্ট॥
রাবণ বলিল যদি না কর অমর।
তোমার স্থানেতে নাহি চাই অন্য বর॥
যথা ইচ্ছা তথা ব্রহ্মা করহ গমন।
এত বলি পুনঃ তপ করয়ে রাবণ॥

রাক্ষসের তপ দেখি কাঁপে ত্রিভুবন।
বিষম উৎকট তপ করে তিনজন ॥
কুম্ভকর্ণ করে তপ দেখিতে দুষ্কর।
হেঁটমাথা করি রহে দুই পা উপর ॥
গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালে চারিপাশে
উপরেতে খরতর ভাস্কর প্রকাশে ॥
বরিষাতে চারি মাস থাকে পদ্মাসনে।
শিলা বরিষণ ধারা বহে রাত্রিদিনে ॥
শীতকালে হিমজলে থাকে নিরন্তর।
এইরূপে করে তপ অযুত বছর ॥
অযুত বছর তপ তপনের স্থানে।
ঊর্দ্ধকরে দুই বাহু ঠেকেছে গগনে ॥
অযুত বছর তপ করে বিভীষণ।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ ॥
অযুত বছর তপ করিল রাবণ।
অনেক কঠোর তপ করে দশানন ॥
এক মাথা কাটে এক হাজার বছরে।
ব্রহ্মারে আহুতি দেয় আগুন উপরে ॥
নয় মাথা কাটে নয় হাজার বছরে।
শেষ মুণ্ড কাটিবারে ভাবিল অন্তরে ॥
খড়্গ ধরি শেষ মুণ্ড করিতে ছেদন।
ব্রহ্মা আসি উপনীত রাবণ সদন ॥
ব্রহ্মা বলিলেন তপ না করিহ আর।
যত চাহ তত দিব ধন অধিকার ॥
দশানন বলে যদি মোরে দিবে বর।
তব বরে সংসারেতে হইব অমর ॥
ব্রহ্মা বলেন ঐ বর বড়ই দুষ্কর।
ছাড়িয়া অমর বর চাহ অন্য বর ॥
রাবণ বলিল যদি না কর অমর।
সদয় হইয়া দেহ চাহি যেই বর ॥
যক্ষ রক্ষ দেবতা কি গন্ধর্ব্ব অপ্সর।
চরাচর খেচর পিশাচ বিষধর ॥
কারো হাতে না মরিব এই বর দেহ।
সকলে জিনিব আমি না পারিবে কেহ ॥
ব্রহ্মা বলেন চাহিলে যে বর নিজ মুখে।
তুষ্ট হয়ে সেই বর দিলাম তোমাকে ॥
যত যত জাতি বীর আছয়ে সংসারে।
নিজ বাহুবলে তুমি জিনিবে সবারে ॥
বাকী আছে দুই জাতি নর ও বানর।
দশানন বলে মোর তাহে নাহি ডর ॥
বাকী যে বানর নর ধরি ভক্ষ্য মধ্যে।
নর আর বানর কি জিনিবেক যুদ্ধে ॥
রাবণ বলিল পুনঃ করি যোড়কর।
কাটামুণ্ড যোড়া যাবে দেহ এই বর ॥
ব্রহ্মা বলেন দিই বর শুন হে রাবণ।
মুণ্ড কাটা গেলে তব না হবে মরণ ॥
কাটা মুণ্ড যোড়া তব লাগিবেক স্কন্ধে।
রাবণ প্রণাম কৈল মনের আনন্দে ॥
তবে ব্রহ্মা উপনীত বিভীষণ স্থানে।
বর মাগ, বিভীষণ, যাহা লয় মনে ॥
বিভীষণ প্রণমিল যুড়ি দুই কর।
ধর্ম্মেতে হউক মতি মাগি এই বর ॥
ব্রহ্মা বলিলেন তুষ্ট হইলাম মনে।
অক্ষয় অমর হও আমার বচনে ॥
বিনা শ্রমে সর্ব্বশাস্ত্রে হইবে নিপুণ।
ত্রিভুবনে সকলে ঘুষিবে তব গুণ ॥
তার পর কুম্ভকর্ণে গেলা বর দিতে।
দেখিয়া ত দেবগণ লাগিল কাঁপিতে ॥
দেবগণ বলে ভাগ্যে না জানি কি হয়।
বিনা বরে কুম্ভকর্ণে দেখে লাগে ভয় ॥
বিধির নিকটে বর পেলে কুম্ভকর্ণ।
ধরিয়া দেবতাগণে করিবেক চূর্ণ ॥
এত ভাবি দেবগণ করিয়া যুকতি।
ডাক দিয়া আনাইল দেবী সরস্বতী ॥

দেবীরে কহিল তবে যত দেবগণে।
এই নিবেদন, মাতা, তোমার চরণে॥
গিয়াছেন কুম্ভকর্ণে বিধি দিতে বর।
বৈস গিয়া রাক্ষসের কণ্ঠের উপর॥
বর দিতে প্রজাপতি চাহিবে যখন।
তুমি বলো নিদ্রা আমি যাব অনুক্ষণ॥
পাঠালেন যুক্তি করে যতেক অমর।
দেবী বসিলেন তার কণ্ঠের উপর॥
বিধি বলেন কিবা বর মাগ নিশাচর।
কুম্ভকর্ণ বলে নিদ্রা যাব নিরন্তর॥
বিরিঞ্চি বলেন বর চাহিলে যেমন।
দিবানিশি নিদ্রা যাও হয়ে অচেতন॥
সরস্বতী চলিলেন আপন ভবন।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ হয়ে অচেতন॥
বর শুনি দশানন আইল শীঘ্রগতি।
ব্রহ্মার চরণে ধরি করয়ে মিনতি॥
দশানন বলে সৃষ্টি আপনি সৃজিলে।
ফল সহ বৃক্ষ কেন কাট ডালে মূলে॥
কুম্ভকর্ণ তোমার সম্বন্ধে হয় নাতি।
এমন দারুণ শাপ না হয় যুকতি॥
নিদ্রা যাবে তব বাক্যে না হইবে আন।
নিদ্রাজাগরণ, প্রভু, করহ বিধান॥
কাতর হইয়া ধরে ব্রহ্মার চরণে।
কুম্ভকর্ণ বর শুনি হাসে দেবগণে॥
সদয় হইয়া ব্রহ্মা বলিলা বচন।
ছয় মাস নিদ্রা এক দিন জাগরণ॥
অদ্ভুত ধরিবে বল অদ্ভুত ভক্ষণ।
একেশ্বর সমরে জিনিবে ত্রিভুবন॥
যুদ্ধে কেহ না আঁটিবে কুম্ভকর্ণবীরে।
কাঁচা নিদ্রা ভাঙ্গিলে যাইবে যমঘরে॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেল নিজ স্থানে।
দুই ভাই কুম্ভকর্ণে স্কন্ধে করে আনে॥
বিশ্রবার ঘরেতে আইল তিন জন।
রাবণ পাইল বর কাঁপে ত্রিভুবন॥

রাবণ কর্তৃক লঙ্কারাজ্য অধিকার

সুমালী শুনিয়া তাহা অতি হরষিত।
পাতাল হইতে তারা উঠিল ত্বরিত॥
সুমালী রাক্ষস উঠে লয়ে পরিজন।
সহোদর মারীচ প্রহস্ত অকম্পন॥
নিজ পরিবার লয়ে উঠে মাল্যবান্।
বজ্রমুষ্টি বিরূপাক্ষ ধূম্র খরশান॥
ছিল মাল্যবানের তনয় চারি জন।
ধার্ম্মিক সে চারিজনে নিল বিভীষণ॥
মাল্যবান্ কোল দিয়ে কহে দশাননে।
পুনঃ উঠিলাম সবে তোমার কল্যাণে॥
যে কালে তোমারবাপেকন্যা দিনু দান।
সেই দিন ভাবি দুঃখে পাব পরিত্রাণ॥
বিষ্ণুভয়ে হয়েছিনু পাতাল নিবাসী।
তোমার ভরসা পেয়ে পৃথিবীতে আসি॥
রাক্ষসের রাজ্য সে কনক লঙ্কাপুরী।
হয়েছে সে লঙ্কায় কুবের অধিকারী॥
কুবের নিকটে দূত প্রের একজন।
লঙ্কাপুরী ছেড়ে যাক নহে দিক রণ॥
অনাবাসে এরূপ রহিব কতকাল।
লঙ্কাপুরী কেড়ে লয়ে কর ঠাকুরাল॥
রাবণ বলে, মাতামহ, কি কহ আপনি।
জ্যেষ্ঠ ভাই মহাগুরু পিতৃতুল্য জানি॥
জ্যেষ্ঠ সঙ্গে বিসম্বাদ কোন্ জন করে।
হেন বাক্য না বলিহ সভার ভিতরে॥
রাবণ এতেক যদি কহে মাল্যবানে।
প্রহস্ত ডাকিয়া বলে সভা বিদ্যমানে॥

কুবেরের মান্য রাখ জ্ঞাতিগণ দুঃখী ।
ত্রিভুবনে কেআছে ভ্রাতার সুখে সুখী ।।
দেখ দেব দানব গন্ধর্ব্ব দৈত্যগণ ।
ভ্রাতাকে মারিয়া রাজ্য লয় কত জন ।।
তাহার প্রমাণ দেখ কহি তব স্থান ।
মন দিয়া শুন তবে তাহার বিধান ।।
বৈমাত্রেয় ভাই মারে দেব পুরন্দর ।
ভাই মারি স্বর্গেতে হইল দণ্ডধর ।।
গরুড়ের ভাই নাগ সর্ব্বলোকে জানে ।
গরুড় পাইলে খায় হেন সর্পগণে ।।
সর্ব্বজন ভাই মেরে করে ঠাকুরাল ।
ভায়ের গৌরব কে রেখেছে কতকাল ।।
গরু বলি মান কিন্তু জ্ঞাতি মনোদুঃখ ।
কুবের প্রভুত্ব করে তোমার কি সুখ ।।
পুর্ব্বে জননীকে তুমি দিয়াছ আশ্বাস ।
জিনিয়া লইব লঙ্কা কুবেরের পাশ ।।
ভুলিলে সে সব কথা তুমি কি কারণ ।
ইহা শুনি উদ্যোগী হইল দশানন ।।
তখনি ডাকিয়া দূতে কহিছে রাবণ ।
দূত তুমি যাহ শীঘ্র কহ বিবরণ ।।
রাবণের দূত গিয়া নোওাইল মাথা ।
যোড়হাতে কুবেরের স্থানে কহে কথা ।।
রাক্ষসের রাজ্য এই কনক লঙ্কাপুরী ।
এ স্থানে কেমনে রবে ধন অধিকারী ।।
আপন গৌরব রাখ রাবণ সম্মান ।
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যাহ অন্য স্থান ।
দুরন্ত রাক্ষসজাতি বুদ্ধি বিপরীত ।
লঙ্কা দিয়া রাবণেরে করহ পিরীত ।।
মাতামহ রাজ্য তাই অধিকার করে ।
কি সম্পর্কে আছ তুমিলঙ্কার ভিতরে ।।
রাবণ গৌরব রাখ শুন ধনেশ্বর ।
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যাহ স্থানান্তর ।।
রাবণের দূত যদি এতেক কহিল ।
কুবের পিতার কাছে সব জানাইল ।।
বিশ্রবা বলেন শুন ধন অধিকারী ।
দুরন্ত রাক্ষস আমি কি কহিতে পারি ।।
ব্রহ্মার বরেতে নাহি মানে বাপ ভাই ।
থাক গিয়া স্থানান্তরে দ্বন্দ্বে কাজ নাই ।।
কৈলাস পর্ব্বতে যাহ যথা ভাগীরথী ।
সেইখানে গিয়া তুমি করহ বসতি ।।
বিশ্রবার বচনে কুবের পুলকিত ।
রাবণের দূত গেল কহিতে ত্বরিত ।।
কুবের পাঠায় দূত করিয়া মিনতি ।
মম আশীর্ব্বাদ বল রাবণের প্রতি ।।
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যাব স্থানান্তর ।
কিন্তু নাই অংশাঅংশি ধনের উপর ।।
ত্রিশ কোটি যক্ষে বহে কুবেরের ধন ।
লঙ্কা ছেড়ে কৈলাসেতে করিল গমন ।।
লঙ্কা পেয়ে রাক্ষসের পরম পিরীতি ।
লঙ্কাতে করেন রাজ্য রাক্ষস দুর্ম্মতি ।।
মন্ত্রণা করিয়া তবে যত নিশাচরে ।
রাবণে করিল রাজা লঙ্কার ভিতরে ।।

রাবণাদির বিবাহ ও মেঘনাদের জন্ম

মৃগয়া করিতে গেল ভাই তিনজন ।
ময়দানবের সনে হৈল দরশন ।।
কন্যারত্ন আছে তার সর্ব্বলোকে জানি ।
ত্রিভুবন জিনি কন্যা রূপেতে মোহিনী ।।
কন্যা দেখি পিতামাতা বড়ই ভাবিত ।
কারে কন্যা বিভা দিব না জানি বিহিত ।।
রাবণ বলে কন্যা লয়ে কেন আছ বনে ।
দানব আপন কথা কহে রাজা শুনে ।।

রাবণে দানব বলে শুন মহাশয় ।
কোন্ কুলে জন্ম তব দেহ পরিচয় ।।
দশানন বলে আমি বিশ্রবানন্দন ।
রাক্ষসের রাজা আমি নাম দশানন ।।
ময় বলে আমি বিশ্রবারে ভাল জানি ।
বিবাহ করহ কন্যা আমার আপনি ।।
কন্যাদান করে ময় পাইয়া কৌতুক ।
শক্তি নামে শেলপাট দিলেন যৌতুক ।।
পবনের ভগ্নী শেল জগতে বিদিত ।
সেই শেলে হইলেন লক্ষ্মণ মূৰ্চ্ছিত ।।
রাবণের ব্রহ্মশাপ দানব না জানে ।
কন্যারে করিয়া দান হর্ষ হৈল মনে ।।
বিমোচন রাজকন্যা নামে বজ্রজ্বালা ।
কুম্ভকর্ণ বিভা কৈল রূপে চন্দ্রকলা ।।
সাত যোজন দীর্ঘ অঙ্গ কুম্ভকর্ণ বীর ।
তিন যোজন দীর্ঘাকার কন্যার শরীর ।।
বর কন্যা উভয়ে হইল সুশোভন ।
কি রাজযোটক ব্রহ্মা করিল সৃজন ।।
সরমা নামেতে ছিল গন্ধৰ্ব্ব কুমারী ।
বিভীষণ বিভা কৈল পরমা সুন্দরী ।।
মৃগয়াতে গিয়া বিভা কৈল তপোবনে ।
বিবাহ করিয়া ঘরে আইল তিনজনে ।।
মন্দোদরী গর্ভে জন্মে পুত্র মেঘনাদ ।
তারে দেখি দেবগণে গণয়ে প্রমাদ ।।
মেঘের গৰ্জ্জনে গর্জ্জে লঙ্কার ভিতরে ।
দেব দানব ত্রিভুবন কাঁপে তার ডরে ।।
কৌতুকে রাবণরাজা আছে লঙ্কাপুরে ।
দেব দানবের কন্যা লয়ে কেলি করে ।।
লঙ্কাপুরে কুম্ভকর্ণ নিদ্রা অচেতন ।
ত্রিংশৎ যোজন ঘর বান্ধিল রাবণ ।।
পরিখা যোজন দশ আড়ে পরিসর ।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় তাহার ভিতর ।।
ত্রিশকোটি রাক্ষসে সে গৃহদ্বার রাখে ।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় আপনার সুখে ।।
চারি চারি ক্রোশ যুড়ে ঘরের দুয়ার ।
রতন পালঙ্কে শুয়ে বীর অবতার ।।
শূন্য হতে দৃষ্ট হয় অৰ্দ্ধ কলেবর ।
কুম্ভকর্ণ দেখে কাঁপে যতেক অমর ।।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিবে যে দিনে ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে সবে তাহা জানে ।।
সেইদিন সকলেতে সাবধানে ফিরে ।
দেবগণ কম্পমান অমর নগরে ।।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় ঘরের ভিতরে
দেখিয়া ত পুরন্দর চিন্তিত অন্তরে ।।
রাবণ বিধির বরে কারে নাহি মানে ।
দেব দানবের কন্যা ধরে ধরে আনে ।।
ইন্দ্রের নন্দনবন আনে উপাড়িয়া
কার সাধ্য নিবারণ করিবে আসিয়া ।।
মুনি ঋষি দেবতার হিংসা করে ফিরে ।
যম নাহি নিদ্রা যায় রাবণের ডরে ।

কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধে রাবণের জয়লাভ

কুবের শুনিল রাবণের যত কৰ্ম্ম ।
দূত পাঠাইয়া দিল জানাইতে ধৰ্ম্ম ।।
দূত গিয়া রাবণেরে নোঙাইল মাথা ।
যোড়হাত করি কহে কুবেরের কথা ।।
দূত বলে, মহারাজ, তব হিত চাই ।
তোমারে বুঝাতে পাঠাইল তব ভাই ।।
বিশ্রবার পুত্র তুমি কুলে অবতার ।
তোমারে করিতে হয় উত্তম আচার ।।
দেবতার হিংসা কর দেবগণে দুঃখী ।
ঋষি তপস্বীর হিংসা কোন্ শাস্ত্রে লিখি ।।

দেবতা ঋষির কোপে বিপরীত ঘটে ।
সাধুজনে হিংসা করি পড়ে ত সংকটে ।।
দেবতার শাপে দুঃখ পায় নিরন্তর ।
আমার ঠাকুর যক্ষরাজ ধনেশ্বর ।।
করিলেন উগ্র তপ মলয় শিখরে ।
সর্ব্বদা বিরাজে তথা পার্ব্বতী শংকরে ।।
ছলরূপে ভ্রমেন চিনিতে কেহ নারে ।
দুজনে ছিলেন সুখে মলয় শিখরে ।।
হাস্য ক্রীড়া কৌতুকে ছিলেন দুজনে ।
কুবের চাহিয়াছিল বামচক্ষু কোণে ।।
কুপিলেন ভবানী কুবের দরশনে ।
কুবেরের বামচক্ষু পুড়ে সেইক্ষণে ।।
একচক্ষু পুড়ে গেল শুন লংকেশ্বর ।
এক চক্ষে তপ করে হাজার বছর ।।
তথাপি না ঘুচিল সে দেবী কোপানল ।
কুবেরের আঁখি আছে হইয়া পিঙ্গল ।।
দেবতার শাপ কভু না যায় খণ্ডন ।
দেবতাগণের হিংসা কর কি কারণ ।।
তব অমঙ্গল দেব চিন্তিবে সদাই ।
তোমা বুঝাইতে পাঠাইল তব ভাই ।।
এত যদি কহে দূত রাবণ গোচরে ।
শুনিয়া রাবণরাজা কুপিল অন্তরে ।।
আমাকে পাঠায় দূত আপনা না জানে ।
তোরে কাটি আজি তার বধিব জীবনে ।।
জ্যেষ্ঠ ভাই বলে তারে এতদিন সহি ।
নিকট মরণ তার শোন্ তোরে কহি ।।
কোন্ অহংকারে এত কহিল কুকথা ।
হাতে খাণ্ডা করিয়া দূতের কাটে মাথা ।।
দূতে কাটি সাজিল কুবেরে কাটিবারে ।
দিগ্বিজয় করিতে সাজিল লংকেশ্বরে ।।
ত্রিভুবন জিনিতে সাজিল দশানন ।
রাবণের সাজনে কাঁপিল দেবগণ ।।

শত অক্ষৌহিণী সাজে মুখ্য সেনাপতি ।
সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলে শীঘ্রগতি ।।
শত অক্ষৌহিণী নিল জাঠি ও ঝকড়া ।
তিন কোটি সাজিয়া চলিল তাজা ঘোড়া ।।
তিন কোটি বৃন্দ রথ করিল সাজন ।
মাণিকের চাকা রথ সোনার গঠন ।।
রাহুত মাহুত হস্তী সাজিল অপার ।
আছুক অন্যের কাজ দেবে চমৎকার ।।
সেনাপতিগণ নড়ে বড় বড় বীর ।
যার বান আঘাতে পর্ব্বত হয় চির ।।
অকম্পন প্রহস্ত সে শঠ ও নিশঠ ।
শোণিতাক্ষ বিরূপাক্ষ রণেতে উৎকট ।।
ধূম্রাক্ষ ভাস্কর আদি তপন পনস ।
বড় বড় বীর সাজে অনেক রাক্ষস ।।
মারীচ রাক্ষস চলে নানা মায়া ধরে ।
যত যত বীর ছিল লংকার ভিতরে ।।
মহাপাত্র রাক্ষস সে খর ও দূষণ ।
বাঁকামুখ ওষ্ঠবক্র ঘোর দরশন ।।
শুক সারণ শার্দ্দূল চলে জাম্বুমালী ।
বজ্রদন্ত বিদ্যুজ্জিহ্ব বলে মহাবলী ।।
মহাপাশ মহোদর দুই সহোদর ।
মকরাক্ষ চলিল যে মহাধনুর্দ্ধর ।।
ত্রিভুবন জিনিতে রাবণ রাজা সাজে ।
ঢাক ঢোল আদি করি নানাবাদ্য বাজে ।।
লংকায় রহিল মেঘনাদ বিভীষণ ।
কুম্ভকর্ণ রহিল নিদ্রায় অচেতন ।।
খাণ্ডা খরশান টাঙ্গি অতি ভয়ংকর ।
নানা অস্ত্রে সাজিয়া চলিলা লঙ্কেশ্বর ।।
নানা আভরণ পরে দশানন সাজে ।
নাহিক এমন রূপ ত্রিভুবন মাঝে ।।
সসৈন্যেতে রাবণ সাগর হৈল পার ।
কৈলাস পর্ব্বতে উঠি করে 'মার মার' ।।

দূত গিয়া কহিল কুবের বরাবর ।
যুঝিবারে আইল রাবণ নিশাচর ।।
ত্রিশ কোটি যক্ষে কুবের পাঠাইল রোষে ।
লাগিল বিষম যুদ্ধ যক্ষ ও রাক্ষসে ।।
রাক্ষস বরিষে বাণ যক্ষের উপর ।
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদ্গর ।।
পলায় সকল যক্ষ রাক্ষসের ডরে ।
রাবণের যুদ্ধ কেহ সহিতে না পারে ।।
যক্ষের উপরে করে বাণ বরিষণ ।
পলায় সকল যক্ষ নাহি সহে রণ ।।
যোগবৃদ্ধ নামে কুবেরের সেনাপতি ।
যুঝিতে কুবের তারে দিলা অনুমতি ।।
বিষ্ণুচক্র সমান তাহার চক্রে ধার ।
রাক্ষস উপরে করে বাণ অবতার ।।
চক্রাঘাতে কাতর হইল মহোদর ।
রুষিল রাবণ রাজা লঙ্কার ঈশ্বর ।।
কোপেতে রাবণ করে বাণ বরিষণ ।
ভঙ্গ দিল যোগবৃদ্ধ নাহি সহে রণ ।।
পলাইয়া যায় সে আওয়াসের গড়ে ।
দ্বারীর নিকটে রহে কপাটের আড়ে ।।
রথ হৈতে রাবণ পড়িল দিয়া লম্ফ ।
সর্পেরে ধরিতে যেন গরুড়ের ঝম্প ।।
দ্বারপাল রূপে সূর্য্য আছেন দুয়ারে ।
রাখিল কপাট দিয়া রাবণের ডরে ।।
কুপিল রাবণ রাজা বলে মহাবলী ।
বাড়ীর ভিতরে যায় করে ঠেলাঠেলি ।।
পাথরের কপাট তুলিয়া এক টানে ।
কোপে দ্বারপাল রাবণের শিরে হানে ।।
রক্তে রাঙ্গা হয়ে পড়ে রাজা দশানন ।
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ না হৈল মরণ ।।
সে পাথর তুলে রাবণ দ্বারপালে হানে ।
পড়িল সে দ্বারপাল পাথর চাপানে ।।
দ্বারপাল অচেতন কুবের চিন্তিত ।
সেনাপতি মণিভদ্রে ডাকিল ত্বরিত ।।
মণিভদ্র শুনহ প্রধান সেনাপতি ।
আজিকার যুদ্ধে তুমি হও গিয়া কৃতী ।।
বাছিয়া কটক কর সত্বরে সাজন ।
হাতে গলে বান্ধি আন লঙ্কার রাবণ ।।
দিলেক দানব যক্ষ বহু সেনাপতি ।
চব্বিশ কোটি সেনারে তাহার সংহতি ।।
লইয়া বিকট সৈন্য মণিভদ্র নড়ে ।
গর্জ্জিয়া কটক চলে মহাশব্দ পড়ে ।।
মণিভদ্র এসে করে বাণ বরিষণ ।
চারিদিকে ভঙ্গ দিল নিশাচরগণ ।।
রাবণের সেনাপতি যতেক প্রধান ।
যক্ষের কটকে বিন্ধি করে খান খান ।।
নানা-অস্ত্র রাক্ষস ফেলায় চারিভিতে ।
ভঙ্গ দিল যক্ষগণ না পারে সহিতে ।।
উভরড়ে পলাইল আউর চুলী ।
দেখিয়া রুষিল মণিভদ্র মহাবলী ।।
মণিভদ্রে দেখিয়া রাক্ষস ভাগে ডরে ।
দেখিয়া রুষিল রাবণ লঙ্কার ঈশ্বরে ।।
মণিভদ্র দশানন দুই জনে রণ ।
গদা হাতে মণিভদ্র ধায় ততক্ষণ ।।
দশ যোজন পর্ব্বত আনে বায়ুভরে ।
গর্জ্জিয়া পর্ব্বত হানে বাবণের শিরে ।।
রাবণ মারিল বাণ উঠিয়া আকাশে ।
সেই বাণ মণিভদ্র গিলিলেক গ্রাসে ।।
মণিভদ্র মুখ দেখি রুষিল রাবণ ।
কুড়িহাতে চাপি তার বধিল জীবন ।।
মণিভদ্র পড়িল রাক্ষসগণ হাসে ।
কুবেরের ভগ্নদূত কহে ঊর্দ্ধশ্বাসে ।।
মণিভদ্র পড়ে রণে কুবের চিন্তিত ।
আপনি আইল রণে পাত্রেতে বেষ্টিত ।।

ডাক দিয়া বলে শুন ভাই রে রাবণ।
আমার সহিত তব যুদ্ধ কি কারণ॥
মণিভদ্রে পাঠাইলাম যুঝিবার তরে।
কুড়ি হাতে চাপি তুমি ধরিলে তাহারে॥
অপার্য্য-পক্ষেতে আমি এসেছি যুদ্ধেতে।
বাঁধিতে নারিবে আর চেপে কুড়িহাতে॥
করেছ অনেক তপ অস্থিচর্ম্ম সার।
নারিলে অমর হতে কেন অহংকার॥
অমর হইনু আমি তপের প্রসাদে।
কুকর্ম্ম করিয়া ভাই, পড়িবে প্রমাদে॥
যথা তথা যুদ্ধ কর অবশ্য মরণ।
মৃত্যুকালে মনে করো আমার বচন॥
অমর হয়েছি কিসে লইবে পরাণ।
হারি যদি রণেতে করিবে অপমান॥
এত যদি কহিল কুবের যক্ষরাজে।
রাবণের পাত্রমিত্র সবে পড়ে লাজে॥
কুবুদ্ধি ঘটিল রাজা দুষ্ট নিশাচরে।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে কুবেরের শিরে॥
'ছি ছি' বলি কুবের দিলেক টিটকারী।
এই মুখে খাবে, ভাই, স্বর্ণ লংকাপুরী॥
দুই কটকেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
কুবেরের বাণে রাজা হইল জর্জ্জর॥
জর্জ্জর রাবণ রণে কুবেরের বাণে।
কেমনে জিনিব রণ ভাবে মনে মনে॥
সংসারের মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
কুবেরের সনে করে মায়া রূপে রণ॥
শার্দ্দুল হইয়া কেহ কামড়ায়ে মারে।
বরাহ হইয়া কেহ দন্ত দিয়া চিরে॥
মেঘ হৈয়া পড়ে কেহ অঙ্গের উপর।
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন গদার প্রহার॥
শেল শূল মারে কেহ করিয়া গর্জ্জন।
কুবেরে প্রহার করে রাজা দশানন॥

রক্তে রাঙ্গা কুবের সে পড়ে ভূমিতলে।
উপাড়িল বৃক্ষ যেন পড়য়ে সমূলে॥
কুবেরে ধরিয়া লয় যত অনুচরে।
ধরিয়া রাখিল লয়ে পুরীর ভিতরে॥
কুবেরের ভাণ্ডার সে লুটে দশানন।
বিশেষ পুষ্পক রথ আর অন্য ধন॥
রাবণ প্রবেশ করে তার অন্তঃপুরী।
দেখিয়া পলায় সবে যত ছিল নারী॥
কুবেরের অন্তঃপুরে হৈল হাহাকার।
রাবণ লুটিয়া সব করে ছারখার॥

রাবণের প্রতি নন্দীর অভিশাপ এবং রাবণ কর্তৃক কৈলাস উত্তোলনের চেষ্টা

কুবেরে জিনিয়া যায় শংকরের পুরী।
সম্ভাষিতে মহাদেব সহ ত্বরা করি॥
কার্ত্তিকের জন্মস্থান তথা শরবণ।
ঠেকিয়া তাহাতে রথ রহিল রাবণ॥
বনেতে ঠেকিল রথ নহে আগুসার।
রাবণ পাত্রের সহ যুক্তি করে সার॥
মারীচ রাক্ষস কহে রাবণের কাণে।
কুবেরের এই রথ রাক্ষসে না মানে॥
সারথি চালায় রথ রথ নাহি নড়ে।
দেখিতে দেখিতে শিবদূত আসি পড়ে॥
না চালাও রথ এই কৈলাস শিখর।
গৌরীসহ হেথায় আছেন মহেশ্বর।
হেথা দানব গন্ধর্ব্ব দেব নাহি আসে।
এ পর্ব্বতে আসিতেছ কাহার সাহসে॥
কুপিল রাবণ রাজা দূতের বচনে।
রথ হইতে নামিয়া এল শিবস্থানে॥
নন্দী নামে দ্বারী ছিল রাবণ তা দেখে।
হাতে জাঠা করি নন্দী সেই দ্বার রাখে॥

বানরের মত মুখ দেখিয়া নন্দীর।
উপহাস করিল রাবণ মহাবীর ॥
নন্দী বলে শঙ্করের আমি দ্বারপাল।
আমার সম্মুখে কেন কর ঠাকুরাল ॥
দেখিয়া আমার মুখ কর উপহাস।
এ বানর করিবে তোর সর্ব্বনাশ ॥
দুরাচার তোরে মারি কোন্ প্রয়োজন।
নিজ দোষে সবংশে মরিবি দশানন ॥
রাবণ নন্দীর শাপ নাহি শুনে কাণে।
কুঁড়ে হাতে সাপটিয়া কৈলাস সে টানে ॥
কৈলাস ধরিয়া দিল দশানন নাড়া।
সত্তরি যোজন নড়ে কৈলাসের গোড়া ॥
টলমল করে গিরি দেব কাঁপে ডরে।
পর্ব্বতনিবাসী গেল ধূর্জ্জটীর আড়ে ॥
সবে বলে, মহাদেব, কর পরিত্রাণ।
কোন্ বীর আসিয়া পর্ব্বতে দিল টান ॥
রাবণের ক্রিয়া দেখি হাসে কৃত্তিবাস।
বামচরণের নখে চাপেন কৈলাস ॥
ব্যথাতে রাবণ ছাড়ে মহা চীৎকার।
শিবের নিকটে কিবা তার অহংকার ॥
হইল পুষ্পক মুক্ত ধূর্জ্জটীর বরে।
সে রথে চড়ি রাবণ জয় সব করে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণে।
গাইল উত্তরাকাণ্ড গীত রামায়ণে ॥

বেদবতীর প্রতি রাবণের অত্যাচার এবং রাবণকে তাহার অভিশাপ প্রদান

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ, মুনি, কহ করিয়া প্রকাশ ॥
কৈলাস এড়িয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি শুনি, মুনি, পুরাণকথন ॥
অগস্ত্য বলেন, রাম, কর অবধান।
কহি কিছু রাবণের আরো উপাখ্যান ॥
বেদবতী নামে কন্যা পরম শোভনা।
তপস্যা করেন বনে হিমাংশুবদনা ॥
পবিত্র আকৃতি তাঁর পবিত্র প্রকৃতি।
শুদ্ধসত্ত্বা শুদ্ধমতি সূর্য্যসম দ্যুতি ॥
দৈবযোগে রাবণ যে তথা উপনীত।
কন্যাকে দেখিয়া দুষ্ট হইল মোহিত ॥
অতিথি আচারে কন্যা দিলেন আসন।
মুগ্ধ চিত্ত দশানন জিজ্ঞাসে তখন ॥
কে তুমি কাহার কন্যা কাহার কামিনী।
কি জন্যে এ মহারণ্যে থাক একাকিনী ॥
এরূপ সুবর্ণ কান্তি কর কেন নাশ।
কি হেতু কঠোর তপ কর উপবাস ॥
কন্যা বলে মোর কথা কহিতে বিস্তর।
যেহেতু তপস্যা করি শুন লঙ্কেশ্বর ॥
কুশধ্বজ পিতা পিতামহ বৃহস্পতি।
সে কুশধ্বজের কন্যা আমি বেদবতী ॥
পিতা বেদপাঠে রত ছিলা যেইক্ষণে।
জন্মিলাম সেইক্ষণে তাঁহার বদনে ॥
অযোনিসম্ভবা মোর নাম বেদবতী।
পিতার অধিক স্নেহ হৈল আমা প্রতি ॥
দিবেন উত্তম পাত্রে এই তাঁর পণ।
কে আছে উত্তম পাত্র বিনা নারায়ণ ॥
অতএব বিষ্ণু সহ বিবাহ আমার।
দিবেন এই বাঞ্ছা ছিল নিতান্ত পিতার ॥
ইতিমধ্যে শুম্ভ নামে দৈত্য হস্তে পিতা।
মরিলেন হইলেন মাতা অনুমৃতা ॥
আজন্ম তপস্যা করি এই অভিলাষে।
কতদিনে পাইব সে শ্যাম পীতবাসে ॥
শুনিয়া কন্যার কথা দশানন হাসে।
রথ হৈতে নামিয়া সে কহে মৃদুভাষে ॥

ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ গুণ তুমি ধর ।
সুন্দরি, কেন সে বৃদ্ধ বর ইচ্ছা কর ॥
কুটিল সে কালরূপ কোথা নারায়ণ ।
নাগাল পাইলে তার বধিব জীবন ॥
কন্যা বলে হেন বাক্য না আন বদনে ।
কৃষ্ণ বিনা কেবা আছে এ তিন ভুবনে ॥
শুনিয়া কন্যার কথা দুষ্ট জাতুধান ।
ধরিয়া কন্যার কেশে করে অপমান ॥
দৌরাত্ম্য করিয়া শেষে ছাড়িল রাবণ ।
কন্যা বলে অপমান কর কি কারণ ॥
প্রবেশ করিব আমি জ্বলন্ত আগুনে ।
অপবিত্র এ শরীর রাখি কি কারণে ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর হলি পাপকারী ।
অল্প প্রাণী নারী হই কি করিতে পারি ॥
তপস্যার ফলে যদি তোরে নষ্ট করি ।
বিফল হইবে এত তপস্যা আমারি ॥
অগ্নিকুণ্ড জ্বালিল যে আনি কাষ্ঠরাশি ।
প্রবেশ করিতে যায় সে কন্যা রূপসী ॥
অগ্নিকে প্রার্থনা করে বহু স্তব করি ।
শ্রেষ্ঠকুলে জন্মি যেন অদ্য হেথা মরি ॥
নারায়ণ স্বামী হবে জন্মজন্মান্তরে ।
মোর লাগি রাবণ সবংশে যেন মরে ॥
রাবণ লাগিয়া মরি সর্ব্বলোকে দুঃখী ।
মোর লাগি রাবণ মরিবে লোক সাক্ষী ॥
প্রবেশ করিল কন্যা মহাবৈশ্বানরে ।
পুষ্পবৃষ্টি আকাশেতে দেবগণ করে ॥
জনক রাজার কন্যা নাম ধরে সীতা ।
পতিব্রতা অবতীর্ণা সেই শুভান্বিতা ॥
পতিব্রতা শাপ কভু নহে অন্যমত ।
সীতা লাগি মরিল রাবণ আদি যত ॥
ত্রেতাযুগে, রঘুনাথ, তুমি তার পতি ।
তব ধর্ম্মপত্নী সীতা সেই বেদবতী ॥
অহঙ্কারে দশানন সবংশেতে মজে ।
অধর্ম্মী হইলে সুখ নাহি কোন কাজে ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস ।
'কহ কহ' বলি রাম করেন প্রকাশ ॥

মরুত্তরাজার যজ্ঞানুষ্ঠান ও রাবণের নিকট পরাজয় স্বীকার

শ্রীরাম বলেন, মুনি, কহ বিবরণ ।
কহ অতঃপর কোথা গেল দশানন ॥
অগস্ত্য বলেন কারে রাবণ না মানে ।
শাপ গালি দেয় যত কিছু নাহি শুনে ॥
যত যত রাজা আছে পৃথিবী মণ্ডলে ।
সবাকারে দশানন জিনে বাহুবলে ॥
যজ্ঞ করে মরুত্ত ভূপতি মহাধনী ।
সমস্ত ব্রাহ্মণ যজ্ঞে করে বেদধ্বনি ॥
যজ্ঞভাগ লইবারে এল দেবগণ ।
রথে চড়ি সেইখানে চলিল রাবণ ॥
ত্রাস পেল দেবগণ রাবণেরে দেখি ।
সর্প যেন নত হয় দেখে তার্ক্ষ্যপাখী ॥
না দেখি উপায় কোন যত দেবগণ ।
পক্ষিরূপ ধরি সবে হৈল অদর্শন ॥
ইন্দ্র হন ময়ূর কুবের কাঁকলাস ।
যম কাকরূপ হন বরুণ সে হাঁস ॥
মরুত্ত ভূপতি যজ্ঞ করে মহাসুখে ।
'রণ দেহ' বলিয়া রাবণ তারে ডাকে ॥
মরুত্ত বলেন আমি তোমারে না চিনি ।
পরিচয় দেহ মোরে তবে আমি জানি ॥
দশানন বলে আমি ভুবনে বিদিত ।
রাবণ আমার নাম সংসারে পূজিত ॥
কুবের আমার জ্যেষ্ঠ ধন অধিকারী ।
লইলাম তাহার কনক লঙ্কাপুরী ॥

আপন বড়াই করে রাবণ সে স্থলে।
শুনিয়া মরুত্ত রাজা অগ্নি হেন জ্বলে ॥
জ্যেষ্ঠের হরিলে মান কহিছ আপনি।
হেন কথা লোকমুখে কখন না শুনি ॥
ধাম্মিকের অপমান অধাম্মিকে করে।
ধাম্মিক তাহার নিন্দা সহিতে না পারে ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর কারে নাহি ডর।
মানুষের হাতে আজি যাবি যমঘর ॥
অস্ত্র লয়ে রাজা যায় যুঝিবার মনে।
হাত পসারিয়া রাখে সমস্ত ব্রাহ্মণে ॥
মহেশের যজ্ঞে রাজা অনুচিত কোপ।
আপনি হইবে দুষ্ট সবংশেতে লোপ ॥
যজ্ঞ পূর্ণ না হইলে অতি বড় দোষ।
পরাজয় মান রাজা হউক সন্তোষ ॥
ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজা কোপ করে দূর।
কহিল পাপিষ্ঠ বেটা বড়ই নিষ্ঠুর ॥
পরাজয় মানিল মরুত্ত যজ্ঞ স্থানে।
যজ্ঞের ব্রাহ্মণ সব ডাক দিয়া আনে ॥
দশবিশ ব্রাহ্মণেরে সাপটিয়া ধরে।
দুষ্ট দশানন দূরে ফেলে সবাকারে ॥
করিয়া সংগ্রাম জয় রাবণ চলিল।
দেবগণ পক্ষী হতে বাহির হইল ॥
পক্ষী হয়ে দেবগণ পেল পরিত্রাণ।
পক্ষিগণে দেবগণ করেন কল্যাণ ॥
ইন্দ্র বলে, ময়ূর, তোমারে দিনু বর।
হউক সহস্র চক্ষু লেজের উপর ॥
যখন আকাশে মেঘ করিবে গর্জ্জন।
পেখম ধরিয়া তুমি করিবে নর্ত্তন ॥
পূর্ব্বেতে ময়ূর ছিল সামান্য আকার।
ইন্দ্র বরে পুচ্ছে চক্ষু হইল তাহার ॥
কাঁকলাসে বর তবে দিলা ধনেশ্বর।
স্বর্ণবর্ণ হউক তোমার কলেবর ॥
কুবেরের বরে তার নিজ বর্ণ খণ্ডে।
স্বর্ণবর্ণ হইল মুকুট ধরে মুণ্ডে ॥
বরুণ বলেন, হংস, দিলাম এ বর।
চন্দ্রসম হউক তোমার কলেবর ॥
আমি এক লোকপাল সলিলের পতি।
জলেতে চরিতে তব হইবে পিরীতি ॥
যম বলে, কাক আমি দিলাম এ বর।
তোমার নাহিক [illegible] মরণের ডর ॥
রোগ পীড়া তোমা[illegible] না হইবে সংসারে।
তব মৃত্যু হবে যদি মানুষেতে মারে ॥
যেই জন যোগাইবে তোমার আহার।
যমলোকে তৃপ্তি তার হইবে অপার ॥
পক্ষীরা আপন স্থানে চলিল যে যার।
বর দিয়া দেবগণ গেলা স্বর্গদ্বার ॥
মরুত্তের যজ্ঞ কথা অতি চমৎকার।
তাহাতে সোনার পাত্র পর্ব্বত-আকার ॥
স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জি নিত্য করেন বর্জ্জন।
সেই সোনা ভরিয়াছে ত্রিলক্ষ যোজন ॥
কুবেরের ধন জিনি মরুত্তের ধন।
মরুত্ত সমান আর নাহি কোন জন ॥
মরুত্ত রাজার ধন সংসারেতে ঘোষে।
এমন ভূপাল ছিল চন্দ্রমার বংশে ॥
মরুত্ত রাজার যজ্ঞ সংসার বিদিত।
উত্তরাকাণ্ড রচে কৃত্তিবাস সুপণ্ডিত ॥

রাবণ কর্তৃক অনরণ্য বধ ও রাবণকে তাহার অভিশাপ প্রদান

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
'কহ কহ' বলি রাম করেন প্রকাশ ॥
মরুত্ত জিনিয়া কোথা গেল সে রাবণ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন ॥

মুনি বলে যদি শুনে বীর তথা আছে।
তখনি রাবণ যায় দ্রুত তার কাছে॥
গিয়া কহে সত্বরেতে দেহ মোরে রণ।
পরাজয় মানিলে না মারে দশানন॥
পরাজয় যে না মানে করে অহঙ্কার।
রাবণের ঠাঁই তার নাহিক নিস্তার॥
পুরন্দর নিজ মুখে মাগে পরাজয়।
পরাজয় মানিলে সংগ্রাম নাহি হয়॥
এইরূপে রাবণ ভ্রমে পৃথিবী মণ্ডলে।
অযোধ্যা জিনিতে যায় 'জয় জয়' বোলে॥
অনরণ্য নামে ছিল রাজা অযোধ্যায়।
বার্ত্তা পেয়ে দশানন তাঁর কাছে যায়॥
তব পূর্ব্ব পুরুষ সে অনরণ্য নাম।
রাবণ তাঁহার কাছে চাহিল সংগ্রাম॥
লঙ্কার রাবণ আমি শুন অনরণ্য।
রণ দেহ আমারে না চাহি কিছু অন্য॥
শুনি অনরণ্য কোপে করে অহঙ্কার।
কটকেতে মিলামিশি হৈল মার মার॥
প্রাচীন বয়স রাজা মাংসে চক্ষু ঢাকে।
ভ্রূদ্বয় তুলিয়া বাঁধি রাজা সব দেখে॥
বহুকালজীবী রাজা পৃথিবী ভিতর।
বয়স তার বাইশ হাজার বছর॥
সাজিল রাজার সৈন্য হস্তী ঘোড়া কত।
অস্ত্র শস্ত্র লইল যাহার ছিল যত॥
দুই কটক রাজার সৈন্য মহাবল।
রাক্ষসে মানুষে যুদ্ধ হইল প্রবল॥
অনরণ্য রাজা করে বাণ বরিষণ।
রাবণের সেনাপতি করে পলায়ন॥
সেনাপতি ভঙ্গ দেখি রাবণ ফাঁফর।
অনরণ্যসহ যুঝে ক্রোধে লঙ্কেশ্বর॥
রাবণ অসংখ্য বাণ করে বরিষণ।
বুড়া রাজা সমরে হইলা অচেতন॥
আপনা সারিয়া করে বাণবরিষণ।
বাণেতে জর্জ্জর দেহ হইল রাবণ॥
রাবণের গা বহিয়া রক্ত পড়ে ধারে।
যেমন গঙ্গার ধারা পর্ব্বত শিখরে॥
কেহ না জিনিতে পারে নাহি পায় আশ।
উভয়ে বরিষে বাণ নাহি ফেলে শ্বাস॥
দশানন বাণ এড়ে শূন্য হৈল তূণ।
তখন বুড়ার বাণ আছয়ে দ্বিগুণ॥
আর বাণ যাবৎ না যোগায় সারথি।
তাবৎ রাবণ মনে করিল যুকতি॥
রাবণ রাজার বুকে মারিল চাপড়।
ভূমেতে পড়িয়া রাজা করে ধড়ফড়॥
মৃত্যুকালে বুড়ারাজা করে ছটফট।
ধাইয়া রাবণ গেল বুড়ার নিকট॥
রাজভোগে বুড়া কভু নাহি জান রণ।
আমার সহিত যুদ্ধে অবশ্য মরণ॥
জগৎ জিনিয়া ভ্রমি আপনার তেজে।
অবশ্য মরয়ে যেবা মোর সনে যুঝে॥
গর্ব্ব করে বলে রাজা মরণের কালে।
শাপ বর দিব যারে ততক্ষণ ফলে॥
অনরণ্য বলে কিবা কর অহঙ্কার।
কভু হারি কভু জিনি রণ ব্যবহার॥
তুষিলাম বহু যুদ্ধ করি দেবগণে।
তুষিলাম নানারত্ন দানেতে ব্রাহ্মণে॥
রাজা হয়ে করিলাম প্রজার পালন।
তিনলক্ষ দ্বিজ নিত্য করাই ভোজন॥
এ সব আমার পুণ্য জানে সবে ভালে।
তোরে যে বধিবে সে জন্মিবে মোর কুলে॥
সংগ্রামে পড়িয়া রাজা গেল স্বর্গপুরে।
দিগ্বিজয় করি ভ্রমে লঙ্কার ঠাকুর॥
তব পূর্ব্বপুরুষেরে জিনিল যে রণে।
সে রাবণ পড়িল, শ্রীরাম, তব বাণে॥

পূর্ব্বকথা শুনিয়া শ্রীরামের উল্লাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ড গীত কৃত্তিবাস ॥

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের হস্তে রাবণের পরাজয়

শ্রীরাম বলেন বৃদ্ধ ছিলেন দুর্ব্বল।
তেকারণে হয়েছিল রাবণ প্রবল ॥
বীরশূন্য পৃথিবী ছিলেন সে সময়।
তেঁই রাবণের বৃদ্ধি ছিল অতিশয় ॥
সেকালের রাজা ব্রহ্ম-অস্ত্র নাহি জানে।
রাবণের পরাজয় নহে তেকারণে ॥
মুনি বলে দশানন নানামায়া ধরে।
রাক্ষসে করিলে মায়া কোন্ জন তরে ॥
মায়ারণ দেখারণ অনেক অন্তর।
তেকারণে পরাজিত নহে লঙ্কেশ্বর ॥
মানুষ হইয়া যিনি বিষ্ণু-অধিষ্ঠান।
তাঁর ঠাঁই রাবণ যে পায় অপমান ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনরাজা ছিল চন্দ্রবংশে।
সহস্রহাত ধরে সে জন্ম বিষ্ণু-অংশে ॥
নানাবুদ্ধি ধরিয়া সে রাজা রাজ্য রাখে।
যার নামে হারাধন আসয়ে সম্মুখে ॥
শতশত কামিনী লইয়া কুতূহলে।
অর্জ্জুন করিত ক্রীড়া নর্ম্মদার জলে ॥
মহিষ্মতীনগরেতে তাঁর ছিল ঘর।
তথা গিয়া বার্ত্তা পুছে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
লঙ্কার রাবণ আমি চাহি আজি রণ।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কি করিল পলায়ন ॥
রাক্ষস কটক চাপ অতি ভয়ঙ্কর।
অর্জ্জুন রাজার তাহে নাহি কোন ডর ॥
লোকে বলে কিবা চাহ তুমি এই স্থলে।
করেন ভূপতি ক্রীড়া নর্ম্মদার জলে ॥
নর্ম্মদায় যায় বীর অর্জ্জুন উদ্দেশে।
পথে যেতে বিন্ধ্যগিরি দেখিল হরিষে ॥
নানাফুলফল দেখি অতি মনোহর।
নানাপক্ষী কেলি করে শোভে সরোবর ॥
নৃত্য করে ময়ূর ঝঙ্কারে মধুকর।
নানাহংস কেলি করে দেখিতে সুন্দর ॥
দানব গন্ধর্ব্ব দেব যক্ষ বিদ্যাধর।
কামিনী লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর ॥
রাবণেরে দেখিয়া দেবতা কাঁপে ডরে।
পলায় ছাড়িয়া কেলি পর্ব্বত উপরে ॥
উভরড়ে দেবগণ পলাইল ত্রাসে।
দেবতা পলায় দেখি দশানন হাসে ॥
নির্ম্মল নদীর জল পর্ব্বতেতে বয়।
নানাবিধ লোক তথা করয়ে আলয় ॥
বিন্ধ্যগিরি এড়ি গেল নর্ম্মদার কূলে।
জলকেলি করে তথা কেশরীশার্দ্দূলে ॥
সহ শুকসারণ প্রভৃতি পরিজন।
রথ হৈতে সেইখানে উলিল রাবণ ॥
মধ্যাহ্নকালের রৌদ্রে তাপিত পৃথিবী।
রাবণে দেখিয়া মন্দতেজ হৈল রবি ॥
দুইকূলে বালি সে স্ফটিক হেন দেখি।
বহু জন্তু কেলি করে নানাবিধ পাখী ॥
নর্ম্মদার জল সেই অতি সুশীতল।
ধীরে ধীরে বায়ু বহে অতি সুকোমল ॥
সৈন্যসঙ্গে উলিয়া রাবণ যায় জলে।
ধুইল গায়ের রক্ত লগ্ন রণস্থলে ॥
সাঁতারে রাবণরাজা নর্ম্মদার জলে।
আনন্দে করিয়া স্নান উঠিলেক কূলে ॥
দেবদেব মহাদেব জগতের রাজা।
নানা-উপচারেতে রাবণ করে পূজা ॥
স্বর্ণশিবলিঙ্গ তাহে কাঞ্চনমেখলা।
ভক্তিতে রাবণ পূজে দেবার্চ্চনবেলা ॥

শত সুবর্ণের পাত্র লাগে পূজাসাজে।
শঙ্খঘণ্টাদুন্দুভি যে চারিদিকে বাজে॥
করাইল শিবলিঙ্গস্নান সেই জলে।
কলস করিয়া গন্ধ তদুপরি ঢালে॥
মন্ত্রজপ করিল লইয়া জপমালা।
মৌন নাহি ভাঙ্গে তার দেবার্চ্চনবেলা॥
কুড়িহাত পসারিয়া নাচে রঙ্গেভঙ্গে।
রাবণ প্রণাম করে সেই শিবলিঙ্গে॥
এদিকে অর্জ্জুনরাজা হয়ে হৃষ্টমতি।
জলক্রীড়া করে সঙ্গে শতেক যুবতী॥
পসারে নদীর মাঝে হস্ত সে দীঘল।
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধি রাখে তার জল॥
ছিল যে কাঁকালি জল হইল পাথার।
শতশত কন্যা দিতে লাগিল সাঁতার॥
হাত সম্বরিয়া রাজা এড়ি দিল পানি।
আকুল হইয়া ডাকে যতেক রমণী॥
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধে রাণী সব ভাসে।
দেখিয়া অর্জ্জুনরাজা কৌতুকেতে হাসে॥
হাতের উপরে হাত দেয় কাতে কাতে।
সে জল উজান বহে কূল ভাঙ্গে স্রোতে॥
শিবপূজা করিছে রাবণ সেই কূলে।
স্রোতে তার ফলফুল ভাসাইল জলে॥
রাবণ আপনি গায় আপনি সে নাচে।
বার্ত্তা জানিবারে শুকসারণেরে পুছে॥
না ভাঙ্গি রাবণ মৌন হাতে তুড়ি দিল।
বৃত্তান্ত জানিতে শুকসারণ চলিল॥
নিষ্ঠা বার্ত্তা জানিয়া যে তাহারা জানায়।
তোমারে ভেটিতে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন চায়॥
সুন্দর অর্জ্জুনরাজা যেন দেবপতি।
জলক্রীড়া করে সব লইয়া যুবতী॥
নদীতে সহস্র হস্ত পসারে দীঘল।
সহস্র হাতেতে তার বন্ধ রাখে জল॥

সহস্র হস্তেতে বান্ধি অপূর্ব্ব কৌশলে।
উজান বহায় সেতু করি ভাটা জলে॥
জাঙ্গাল সহস্র হাতে বান্ধি রাখে নদী।
তেকারণে ভাসিতেছে ফলফুল আদি॥
যে কার্ত্তবীর্য্যের হেতু হেথা আগমন।
নর্ম্মদার জলে তাঁরে কর দরশন॥
অর্জ্জুনের বার্ত্তা পেয়ে চলে দশানন।
দুই ক্রোশ পথ গিয়া করে নিরীক্ষণ॥
অর্জ্জুন সহস্রকরে করে জলখেলা।
সহস্র সহস্র তাঁরে বেষ্টিত মহিলা॥
তাঁহাব পাত্রের কাছে কহিছে রাবণ।
অর্জ্জুনেরে কহ গিয়া মম আগমন॥
স্ত্রী লইয়া তোর রাজা সুখে করে স্নান।
বল গিয়া রাজারে রাবণ রণ চান॥
এত যদি রাবণ পাত্রের প্রতি বলে।
কুপিল সে রাজপাত্র রাবণের বোলে॥
স্ত্রী লইয়া মহারাজ সুখে ক্রীড়া করে।
এ সময় কোন্ জন বলে যুঝিবারে॥
রণের সময় না জানিস নিশাচর।
অর্জ্জুনের হাতে আজি যাবি যমঘর॥
স্ত্রী লইয়া রাজা করে হাস্য পরিহাস।
তোর বাক্যে কেন আমি যাব তাঁর পাশ॥
কুড়ি খান হাতে তোর এত অহঙ্কার।
সহস্র হস্তেতে কার্ত্তবীর্য্য-অবতার॥
বীর হেন দেখিস কি তুই আপনারে।
করিতে আইলি যুদ্ধ বিধাতার বরে॥
অর্জ্জুন পাইলে তোরে মারিবে আছাড়।
দশমুণ্ড ভাঙ্গিয়া করিবে চূর্ণ হাড়॥
দেব দৈত্য জিনিয়া বেড়াস যেন সর্প।
তেঁই সে কারণে তোর বাড়িয়াছে দর্প॥
অর্জ্জুন রাজার কাছে কর অহঙ্কার।
মানুষ হইয়া তিনি দেব-অবতার॥

জন্মালি রাক্ষস কুলে নানা মায়াধর।
হের দেখ রাজা মম মায়ার সাগর ।।
আকাশেথাকিয়া যুঝে কভু নাহি দেখি।
মেঘ রূপে জল বর্ষে উড়ে যেন পাখী ।।
সরলপ্রতি সোজা তিনি বাঁকাপ্রতি বাঁকা।
পাড়িলে তাঁহার ঠাঁই তবে যায় দেখা ।।
অর্জ্জুনেরে না পারিবি এলি মরিবারে ।।
প্রাণরক্ষা কর গিয়া ঝট যাহ ঘরে ।।
আমার সমরে যদি পাস অব্যাহতি।
তবে গিয়া ঘাটাইস অর্জ্জুন নৃপতি ।।
কুপিল রাবণরাজা মহা ভয়ংকর।
রাক্ষস মানুষে যুদ্ধ বাধিল বিস্তর ।।
যুঝে শুক সারণ মারীচ মহাবীর।
রাক্ষসের মায়ারণে নর নহে স্থির ॥
রাক্ষসের সংগ্রামে মানুষসৈন্য নড়ে।
অর্জ্জুনের কাছে গিয়া দূত কহে রড়ে ॥
মারিয়া তোমার সৈন্য ফেলিল রাবণ।
অগ্নিহেন কোপে জ্বলে শুনিয়া অর্জ্জুন ॥
যুঝিবারে চলিল অর্জ্জুনমহাবীর।
ভয়ে রাজনিতম্বিনী কেহ নহে স্থির ॥
স্ত্রীলোকের কলরব উঠিল গভীর।
সবাকে অভয়দানে রাজা করে স্থির ॥
পাত্রসহ স্ত্রীগণে পাঠায়ে অন্তঃপুরী।
ধাইল অর্জ্জুন স্বর্ণগদা হাতে করি ॥
গভীর গর্জ্জনে আসে পর্ব্বত-আকার।
গদা হাতে রাক্ষসেরে করে 'মার মার' ॥
দুর্জ্জয় শরীর রাজা অতি ভয়ংকর।
তিনশত যোজন জুড়িয়া পরিসর ॥
ছয়শত যোজন শরীর দীর্ঘতর।
সহস্র হস্তেতে ধরে সহস্র ভূধর ॥
দেখিয়া কুপিল সে প্রহস্ত মহাবল।
অর্জ্জুনের শিরে মারে লোহার মুদ্গর ॥
পড়িল মুষল যেন ঝঞ্ঝনা চিকুর।
অর্জ্জুনের গদায় ঠেকিয়া হৈল চূর ॥
অর্জ্জুন সহস্রহাতে গদা একচাপে।
প্রহস্তের মাথায় মারিল মহাকোপে ॥
মোহ গেল প্রহস্ত সে অত্যন্ত কাতর।
দেখিয়া কাতর তারে রোষে লংকেশ্বর ॥
কুড়িহাতে অস্ত্র ফেলে রাক্ষস রাবণ।
সহস্রহস্তেতে লোফে অর্জ্জুনরাজন্ ॥
দুই গিরি ঠেকাঠেকি শুনি ঠন্ঠনি।
ত্রিভুবনে জলস্থল কম্পিতা মেদিনী ॥
উভয় হস্তীর যুদ্ধ দন্তে হানাহানি।
দুই সূর্য্য যুদ্ধ করে মনে হেন মানি ॥
দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই বীর রণ করে নাহি অবসাদ ॥
উভয়ে বরিষে বাণ দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জরজর ॥
কেহ কারে নাহি পারে তুল্য দুইজন।
দেবতা-অসুরে যেন পূর্ব্বে হৈল রণ ॥
রাবণ মুষলাঘাত করিল নিষ্ঠুর।
অর্জ্জুনের বুকেতে সে ঠেকি হৈল চূর ॥
ধরিল দুর্জ্জয় গদা অর্জ্জুন নৃপতি।
রাবণের বুকেতে মারিল শীঘ্রগতি ॥
মোহ গেল রাবণ সে গদার আঘাতে।
এড়িয়া ধনুকবাণ লাগিল কাঁপিতে ॥
লাফ দিয়া অর্জ্জুন ধরিল লংকেশ্বরে।
গরুড় ছুঁইয়া যেন নিল অজগরে ॥
ধরিয়া সহস্রহাতে রাখে কক্ষতলি।
পাতালে যেমন হরি বান্ধিলেন বলি ॥
বান্ধিল সহস্রহস্তে তার কুড়িহাত।
রাবণ ভাবিছে এ কি হইল উৎপাত ॥
'সাধু সাধু' আকাশে ডাকিছে দেবগণ।
অর্জ্জুন উপরে করে পুষ্পবরিষণ ॥

হস্তী মারি সিংহ যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
মৃগ মারি ব্যাধ যেন পাসরে বিষাদ ॥
নানা-অস্ত্র রাক্ষস ফেলিল চারিভিতে।
রাক্ষসের অস্ত্র সব রাজা লোফে হাতে ॥
কত হাতে ধরিয়া রহিছে দশাননে।
কত হাতে খেদাড়ে সে নিশাচরগণে ॥
মারীচ দূষণ খর প্রহস্ত মহাবল।
অর্জ্জুনেরে স্তুতি করে রাক্ষস সকল ॥
রাক্ষসের স্তুতিতে অর্জ্জুনরাজা হাসে।
কক্ষে রাবণেরে চাপি চলিল আবাসে ॥
রাবণে লইয়া রাজা পদব্রজে যায়।
রাবণের দুর্দ্দশা দেখিতে সবে পায় ॥
অর্জ্জুনেরে ডাক দিয়া বলে দেবগণে।
চিরকাল বন্দী করি রাখহ রাবণে ॥
অর্জ্জুনেরে দেবগণ করেন বাখান।
তোমার প্রসাদে আজি পাইলাম ত্রাণ ॥
কুতূহলে দেবগণ করে হুলাহুলি।
রাবণেরে লয়ে পুরে সান্ধাইল বলী ॥
বন্দীশালে নিয়ে ফেলে মড়ার আকার।
রাবণের টুটিল যে সব অহঙ্কার ॥
কুড়ি হাতে বেড়িলেক তার দশ গলা।
দৃঢ় বান্ধিলেক দিয়া লোহার শৃঙ্খলা ॥
বন্ধনের টানে দুষ্ট হইল কাতর।
বুকেতে তুলিয়া দিল দারুণ পাথর ॥
পাথর তুলিয়া দিল সত্তরি যোজন।
পাশ উলটিতে নারে দুরন্ত রাবণ ॥
রাবণেরে বন্ধ করি রাখি কারাগারে।
অর্জ্জুন পুনশ্চ গেল নিজ অন্তঃপুরে ॥
অর্জ্জুনের নামে হয় পাপ বিমোচন।
অর্জ্জুনের নামে পাই হারাইলে ধন ॥
বিষ্ণু-অবতার রাজা বলে মহাবলী।
কৃত্তিবাস অর্জ্জুনের রচে জলকেলি ॥

পুলস্ত্যের প্রার্থনায় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাবণকে মুক্তিদান ও তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন

দশাস্যকে বন্দী করি থুইল অর্জ্জুন।
ঘরে ঘরে বার্ত্তা কহে যত দেবগণ ॥
পুলস্ত্য সে মহামুনি স্বর্গলোকে বৈসে।
শুনিয়া নাতির বার্ত্তা মর্ত্ত্যলোকে আসে ॥
দশদিক আলো করে মুনির কিরণ।
অর্জ্জুনের ঘরে আসি দিল দরশন ॥
পাত্রমিত্রসহ রাজা আইল সত্বরে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সে মুনির পূজা করে ॥
সহস্র হস্তেতে পঞ্চশত পুটাঞ্জলি।
ভূমে পড়ি নতি করে রাজা কুতূহলী ॥
ছাড়িয়া অমরাবতী কেন আগমন।
কি আছে আমার কাছে প্রভু প্রয়োজন ॥
আজি হৈতে বংশ মোর হইল নির্ম্মল।
আজি হৈতে রাজ্য মোর হইল উজ্জ্বল ॥
দেবগণ বন্দে গিয়া যাঁহার চরণ।
আমার আলয়ে আজি তাঁর আগমন ॥
পুত্রপৌত্র আছে, প্রভু, তোমা বিদ্যমান।
কি কার্য্য করিব, মুনি, কর সম্বিধান ॥
মুনি বলে, রাজা, তব সফল জীবন।
তোমার সদৃশ প্রিয় আছে কোন জন ॥
ঘুষিবে তোমার যশ এ তিনভুবনে।
আমার গৌরব রাখ ছাড়িয়া রাবণে ॥
রাবণ আমার হয় সম্বন্ধেতে নাতি।
নাতি দান দিলে তবে পাই অব্যাহতি ॥
রাখিয়াছ বন্দী করি শুনি বন্দীশালে।
হস্তপদ বন্ধ নাকি লোহার শিকলে ॥
আমার গৌরব রাখ করহ সম্মান।
আমারে করিয়া ক্ষমা দেহ নাতি দান ॥

এতেক শুনিয়া রাজা মুনির বচন।
পাত্রেরে বলিল ঝট আনহ রাবণ॥
দুই পাত্র কারাগারে গেল দিয়া রড়।
খসাইল রাবণের গলার নিগড়॥
কুড়িহাত রাবণের বন্ধ যোড়ে যোড়ে।
রাজার আজ্ঞায় তার সব বন্ধ কাড়ে॥
খসাইল পায়ের দাঁড়াকু দৃঢ়তর।
ঘুচাইল রাবণের বুকের পাথর॥
কুড়িহাত জুড়িয়া বান্ধিয়াছিল চামে।
করিলা বন্ধনমুক্ত সে সকল ক্রমে॥
রাবণে আনিয়া দিল মুনিবিদ্যমানে।
মাথা তুলি রাবণ না চাহে অপমানে॥
স্নান করাইয়া পরাইল দিব্যবাস।
দিব্য-অলঙ্কার দিল মাণিক প্রকাশ॥
সুগন্ধি চন্দনপুষ্প দিল বিভূষণ।
পুলস্ত্যমুনির করে করে সমর্পণ॥
মুনির বচনে তথা ধর্ম্ম-অগ্নি জ্বালি॥
অর্জ্জুন রাবণসনে করেন মিতালি॥
পুলস্ত্য গেলেন স্বর্গে দশানন লঙ্কা।
মুনির প্রসাদে দূরে গেল তার শঙ্কা॥
অগস্ত্য বলেন দেহ মন রঘুবর।
অর্জ্জুনের পিতা তপ করিল বিস্তর॥
আপনি দিলেন বর তাঁরে নারায়ণ।
অর্জ্জুনস্বরূপ আমি তোমার নন্দন॥
তোমার অর্জ্জুন যে সহস্রহাত ধরে।
হেন অর্জ্জুনেরে কেহ জিনিতে না পারে॥
বলাবল নাহি তথা নাহি ডাকাচুরি।
রাজ্যেতে কোটাল নাহি আপনি প্রহরী॥
হারাইলে ধন পায় অর্জ্জুন স্মরণে।
চন্দ্রবংশে রাজা নাই সম তাঁর গুণে॥
চরাচরে মহাবীর বিষ্ণু-অংশধর।
সে অর্জ্জুনরাজারে মারেন ভৃগুবর॥
অনিত্য শরীর নিত্য বলি মান বৃথা।
অর্জ্জুনের এই দশা অন্যে কিবা কথা॥
অর্জ্জুনের কীর্ত্তিগানে পূরিত সংসার।
কৃত্তিবাস রচিল অর্জ্জুন অবতার॥

বালিহস্তে রাবণের লাঞ্ছনা

শুনিয়া মুনির বাক্য রামের উল্লাস।
'কহ কহ' বলি রাম করেন প্রকাশ॥
সেথা হৈতে আর কোথা গেল দশানন।
কহ কহ শুনি, প্রভু, অপূর্ব্ব কথন॥
মুনি বলে সদা দুষ্ট যুদ্ধচিন্তা করে।
বালির নিকটে গেল কিষ্কিন্ধ্যানগরে॥
ভুবন জিনিয়া ভ্রমে নাহি অবসাদ।
বালির দুয়ারে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ॥
বালির দুয়ারে দেখে অনেক বানর।
আপনার পরিচয় কহে লঙ্কেশ্বর॥
লঙ্কার রাবণ আমি দশমুণ্ড ধরি।
বাঞ্ছা করি বালির সহিত যুদ্ধ করি॥
বলিল বানরগণ ওহে দুরাচার।
এমন বচন মুখে না আনিস আর॥
হইলে বালির সনে তোর দরশন।
দশমুণ্ড খণ্ড করি বধিবে জীবন॥
যে বীর করিয়া দর্প যুদ্ধ চাহে আসি।
হেথা দেখ তা সবার হাড় রাশি রাশি॥
সন্ধ্যা করিতেছে বালি দক্ষিণসাগরে।
কিছুকাল থাক যদি যাবে যমঘরে॥
মহাপরাক্রমী বালি খ্যাত ত্রিভুবনে।
তৃণজ্ঞান নাহি করে সহস্ররাবণে॥
বালির বিক্রমকথা শুন নিশাচর।
দুর্জ্জয় শরীর বালি বলের সাগর॥

প্রভাতে উঠিয়া বালি অরুণ-উদয় ।
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয় ॥
আকাশে উপাড়ি ফেলে পর্ব্বতশিখর ।
পুনঃ হাত পসারিয়া লুফে সে সত্বর ॥
সপ্তদ্বীপ ভ্রমে বালি এক নিমিষেতে ।
কি কব অন্যেরে বায়ু না পারে ছুঁইতে ॥
অমর ভাবিয়া কেন কর অহঙ্কার ।
পড়িলে বালির হাতে যাবে যমঘর ॥
কুপিল রাবণরাজা দুয়ারী উপরে ।
উত্তরিল গিয়া শীঘ্র দক্ষিণসাগরে ॥
সুমেরুপর্ব্বত হেন সাগরের কূলে ।
সূর্য্যের কিরণ যেন রাঙ্গামুখ জ্বলে ॥
সত্তরিযোজন দেহ উভেতে দীঘল ।
উচ্চলেজ স্পর্শ করে গগনমণ্ডল ॥
দূরে থাকি রাবণ নেহালে তথা বালি ।
শশারুর দৃষ্টে যেন সিংহ মহাবলী ॥
নিঃশব্দে বালির কাছে চলিল রাবণ ।
সিংহের নিকটে যায় শৃগাল যেমন ॥
অকস্মাৎ বালিরাজা মেলিল নয়ন ।
দেখিলেক নিকটেতে আইসে দশানন ॥
মনে মনে হাসিল বুঝিয়া অভিপ্রায় ।
আসিতেছে আশা করি জিনিবে আমায় ॥
বালি বলে, দশানন, মরিবি নিশ্চয় ।
মরিবার আশে এস প্রাণে নাহি ভয় ॥
ব্রহ্মার বরেতে হইয়াছে অহঙ্কার ।
আজি রে রাবণ তোরে করিব সংহার ॥
কেমনে সারিয়া যাবি ঘরে আপনার ।
পড়িলি আমার হাতে রক্ষা নাহি আর ॥
মারিতে আইসে যেই তারে আমি মারি ।
যে জন সমর চাহে সেই জন অরি ॥
আমায় জিনিতে এলি মরিবার আশে ।
সাধ না করিস, বেটা, পুনঃ যাবি দেশে ॥
নির্জীব করিব আজি রাজা লঙ্কেশ্বরে ।
লেজে বান্ধি ডুবাইব চারিটি সাগরে ॥
লেজেতে বান্ধিব আজি দুষ্ট দশাননে ।
কৌতুক দেখুক আজি এ তিনভুবনে ॥
সর্পদরশনে যেন বিনতানন্দন ।
রাবণেরে দেখে বালি করেন গর্জ্জন ॥
পাছু দিয়া দশানন ধরিল কাঁকালি ।
লেজে বান্ধি রাবণে গগণে উঠে বালি ॥
দশমুণ্ড কুড়িহাত করে নড়বড় ।
ভুজঙ্গ ধরিয়া যেন গরুড়ের রড় ॥
ফাঁফর রাক্ষসগণ চায় চারিভিতে ।
মেঘ যেন ধেয়ে যায় সূর্য্য আচ্ছাদিতে ॥
অতিশীঘ্র ধায় বালি পবনের বেগে ।
রাক্ষস না পায় লাগ অবসাদে ভাগে ॥
পূর্ব্বদিকে সাগর যোজন চারিশত ।
তথা গিয়া সন্ধ্যা করে বালি শাস্ত্রমত ॥
সেইস্থানে সন্ধ্যা করি উঠিল আকাশে ।
লেজেতে রাবণ নড়ে সর্ব্বলোকে হাসে ॥
লেজের বন্ধনহেতু রাবণ মূর্চ্ছিত ।
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠিল শোণিত ॥
লেজের সহিত তারে ধুয়ে কক্ষতলি ।
উত্তরসাগরে সন্ধ্যা করে রাজা বালি ॥
তথায় করিয়া সন্ধ্যা উঠিল গগন ।
লেজে বন্ধ রাবণেরে দেখে সর্ব্ব জন ॥
রাবণের দুর্গতিতে সবে হাস্য করে ।
পশ্চিমসাগরে বালি গেল তার পরে ॥
ডুবায় বাঁধিয়া লেজে বালি লঙ্কেশ্বরে ।
এত জল খাইল যে পেটে নাহি ধরে ॥
অকট-বিকট করে পড়িয়া তরাসে ।
রাবণ জলের মধ্যে বালি ত আকাশে ॥
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মন্ত্র পড়ে ।
রাবণে লইয়া বালি কিষ্কিন্ধ্যায় নড়ে ॥

বালিকর্তৃক রাবণের বন্ধনমোচন

দেশে গিয়া বালিরাজা এড়ে রাবণেরে ।
হাসি বলে কোথা থেকে আইলে এথারে ॥
রাবণ বলিছে আমি বীরকে পরখি ।
তোমা-হেন বীর আমি কোথাও না দেখি ॥
অর্জ্জুন বরুণ বায়ু তুমি যে বানর ।
চারিজন দেখিলাম একই সোসর ॥
দেখাইলা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অন্ত ।
তোমায় আমায় সিংহ পশুর বৃত্তান্ত ॥
আমা হেন বীর তুমি বান্ধিলে লাঙ্গুড়ে ।
চারিসাগরের সন্ধ্যাধ্যান নাহি নড়ে ॥
বলে টুটা পাই যদি আছাড়িয়া মারি ।
আমা হৈতে অধিক পাইলে মিতা করি ॥
আজি হৈতে তুমি মোর ভাই সহোদর ।
মোর লঙ্কা তোমার সে ভাগের ভিতর ॥
উভয়ে মিতালি করে অগ্নি করি সাক্ষী ॥
উভয়ে উভয়প্রীত হইলেক সুখী ॥
শ্রীরাম সে, উভয়ে পড়িল তব বাণে ।
যে জানে তোমার তত্ত্ব সেই সব জানে ॥
শুনিয়া মুনির কথা শ্রীরামের হাস ।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

যমলোকে রাবণের অভিযান

'কহ কহ' বলি রাম করেন প্রকাশ ।
আর কিছু কহ ত পুরাণ ইতিহাস ॥
সে স্থান ছাড়িয়া কোথা গেল সে রাবণ ।
'কহ কহ' শুনি, মুনি, অপূর্ব্ব কথন ॥
মুনি বলে যুদ্ধ চাহি বেড়ায় রাবণ ।
নারদের সনে পথে হৈল দরশন ॥
নারদেরে প্রণাম করিল দশানন ।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কহেন তপোধন ॥
রাবণ, ব্রহ্মার বর পাইলা বহু তপে ।
দেব দৈত্য স্থির নহে তোমার প্রতাপে ॥
রোগে শোকে লোক সব জরায় পীড়িত ।
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ আনন্দিত ॥
অবশ্য মরণপথ কেহ নাহি দেখি ।
বন্ধুবান্ধবের শোকে সর্ব্বলোক দুখী ॥
পড়েছে যমের মুখে সকল সংসার ।
যমেরে এড়িয়া অন্যে মার কি আচার ॥
তোমার সংগ্রামে যম পাবে পরাজয় ।
যমেরে মারিয়া লোকে করাও নির্ভয় ॥
দৈত্য মারি বিষ্ণুলোকে করিলেন সুখী ।
লোকের হিতার্থে সর্প খায় গরুড়পাখী ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর জিনিলে ভুবন ।
তোমার বাণেতে স্থির নহে দেবগণ ॥
যমেরে মারিয়া নাশ লোকের তরাস ।
যমহেতু লোক মরে লোকে উপহাস ॥
যমেরে মারিয়া, বীর, কর উপকার ।
চিরকাল তব কীর্ত্তি ঘুষিবে সংসার ॥
শুনিয়া মুনির কথা বলিছে রাবণ ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিব ত্রিভুবন ॥
আগে মর্ত্ত্য জিনি তৎপরেতে পাতাল ।
তবে সে জিনিব গিয়া অষ্ট লোকপাল ॥
ছোট জিনে বড় জিনি এই পরিপাটি ।
বড় জিনে ছোট জিনি পৌরুষেতে ঘাটী ।
মুনি বলে যদি যমে না কর দমন ।
সর্ব্বলোকের তবে ত রহিবে মরণ ॥
কুড়িপাটিদশনে সে দশমুখে হাসে ।
চতুর্দ্দিকে কেয়া যেন ফুটে ভাদ্রমাসে ॥
ভুবন জিনিব আমি কৌতুকের তরে ।
তোমার আজ্ঞায় যাব যম জিনিবারে ॥
মুনির বচনে যায় রাবণ দক্ষিণে ।
সে গেলে নারদমুনি ভাবে মনে মনে ॥
হেন জন নাহি যে যমের নহে বশ ।
যমেরে জিনিতে যায় বড়ই সাহস ॥

যত প্রাণী আছে যম সবার ঈশ্বর।
ভুবন বৃত্তান্ত যত তাহার গোচর।।
পাইয়া ব্রহ্মার বর দুর্জ্জয় রাবণ।
শমনের সহ যুদ্ধে জিনে কোন্ জন।।
উভয়ের কে জিনিবে জানিতে না পারি।
নারদ দেখিতে যুদ্ধ চলে যমপুরী।।
অবিবাদে বিসম্বাদ ঘটায় নারদ।
নারদ যাহাতে যায ঘটায় আপদ।।
হইলে শনির দৃষ্টি পুড়ে সর্ব্বলোকে।
রাবণে ঠেকায়ে গেল যমের সম্মুখে।।
না যাইতে রাবণ মুনির আগুসার।
যেখানে করেন যম ধর্ম্মের বিচার।।
নারদে দেখিয়া যম উঠিয়া সম্ভ্রমে।
জিজ্ঞাসেন প্রণাম করিয়া ভক্তিক্রমে।।
ত্রিদিব ছাড়িয়া কেন হেথা আগমন।
আমার নিকটে তব কোন্ প্রয়োজন।।
নারদ বলেন, যম, ছিলা নিরুদ্বেগে।
তোমা-সহ যুঝিতে রাবণ আসে বেগে।।
দণ্ডহস্তে সমর করিও দণ্ডধর।
দেখিবারে আইলাম দোঁহার সমর।।
নারদের বাক্যে যম চাহে বহুদূরে।
রাক্ষস কটক চাপ দেখিল প্রচুর।।
চড়িয়া পুষ্পকরথে আইসে রাবণ।
বহু সৈন্য সান্ধাইল যমের ভুবন।।
আগে থানা সান্ধাইল তার পূর্ব্বদ্বার।
দেখে তথা সর্ব্বলোক ধর্ম্ম-অবতার।।
দেবপিতৃভক্ত সত্যবাদী যেই-জন।
তাহার সম্পদ দেখি বিস্মিত রাবণ।।
গোদান করিয়া যেই তুষেছে ব্রাহ্মণ।
ঘৃতদুগ্ধে দেখে তার অপূর্ব্ব ভোজন।।
দুঃখীকে দেখিয়া যেবা করে অন্নদান।
সুবর্ণের থালেতে সে করে সুধাপান।।
বস্ত্রহীনে বস্ত্র দেয় পিপাসায় জল।
রাবণ তাহার দেখে সম্পদ সকল।।
ব্রাহ্মণেরে ভূমিদান করে যেই জন।
যমপুরে দেখে তারে রাজ্যের ভাজন।।
অন্যকে তুষিল যেবা বলি প্রিয়বাণী।
তার সুখ দেখিয়া রাবণ অভিমানী।।
যে করে অতিথিসেবা দিয়া বাসাঘর।
সোণার আবাস তার দেখে লঙ্কেশ্বর।।
স্বর্ণদান করিয়া যে তুষেছে ব্রাহ্মণ।
স্বর্ণখাটে শুয়ে আছে দেখিল রাবণ।।
ব্রাহ্মণের সেবা যে করেছে একমনে।
তাহার সম্পদ দেখি রাবণ বাখানে।।
উত্তমপাত্রে যেবা করেছে কন্যাদান।
সব হতে দেখে রাবণ তাহার সম্মান।।
করেছে বিষ্ণুকীর্ত্তন যেবা নিরন্তর।
তাঁহার সম্পদ দেখি হৃষ্ট লঙ্কেশ্বর।।
চতুর্ভুজ যম তারে করিয়া স্তবন।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া তারে দিলেন আসন।।
বৈকুণ্ঠে যায় সেই না যায় স্বর্গবাস।
দিব্যদেহ ধরি তার হয় যে প্রকাশ।।
চতুর্ভুজরূপে তারে সম্ভাষ করিল।
নানাবিধ প্রকারেতে তাহারে তুষিল।।
সে লোক পুণ্যের তেজে এত সুখ করে।
আপনা ভাবিয়া দশানন পুড়ে মরে।।
দেখিয়া লোকের সুখ হৃষ্ট লঙ্কেশ্বর।
পূর্ব্বদ্বার এড়ি গেল পশ্চিমদুয়ার।।
বহু তপপুণ্য করিয়াছে যেই জন।
তাহার সম্পদ দেখি হরিষ রাবণ।।
রাবণ উত্তরদ্বারে করিল গমন।
তথা পুণ্যবান লোক করে দরশন।।
শুনিয়াছে আগমপুরাণ যেই রাজা।
পালিয়াছে পুত্রহেন যেবা নিজ প্রজা।।

পরহিংসা পরদার না করে যে জন ।
মহামহৈশ্বর্য্য তার দেখিল রাবণ ॥
পূর্ব্ব আর পশ্চিমদুয়ার যে উত্তর ।
তিনদ্বারে ধার্ম্মিক সে দেখিল বিস্তর ॥
যমের দক্ষিণদ্বার ঘোর অন্ধকার ।
রাত্রিদিন নাহি তথা সব একাকার ॥
যত যত পাপিলোক সেই দ্বারে থাকে ।
একত্র থাকিয়া কেহ কারে নাহি দেখে ॥
চৌরাশীসহস্র কুণ্ড দক্ষিণদুয়ারে ।
নরকে ডুবায়ে সব যমদূতে মারে ॥
যমের প্রহারে লোক হয়েছে কাতর ।
কলরব শুনি তথা গেল লঙ্কেশ্বর ॥
প্রবেশিল দক্ষিণদ্বারেতে দশানন ।
বিষম প্রহার তথা দেখিছে তখন ॥
যত যত পাপ করিয়াছে যত জন ।
যমদূতে প্রহারিছে যাহার যেমন ॥
যেই যত পরদার করেছে কৌতুকে ।
কুম্ভীপাকে পড়ি সেই ডুবিছে নরকে ॥
সুতপ্ত তৈলের কুণ্ড অগ্নির উথাল ।
তাহাতে ধরিয়া ফেলে যায় গার ছাল ॥
অগম্যা গমন করে যে হরে ব্রাহ্মণী ।
তার প্রহারের শুন ভীষণ কাহিনী ॥
লোহার ডাঙ্গস দূত মারে গোটা গোটা ।
রুষিয়া ডাঙ্গস মারে যাহে লোহকাঁটা ॥
সর্ব্বাঙ্গ ছেদনে তার পচে সব মাংস ।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পোকা খুলে খায় অংশ ॥
হাতে গলে বান্ধে তার দিয়া চর্ম্মদড়ি ।
মাথার উপরে তুলি মারে লোহবাড়ি ॥
মস্তক ফাটিয়া যায় রক্ত পড়ে ধারে ।
পরিত্রাহি ডাকে তারা দারুণপ্রহারে ॥
গদাঘাতে মাথা চিরে রক্ত পড়ে স্রোতে ।
বিষম প্রহার তারে করে যমদূতে ॥
নরকে ধরিয়া ফেলে পাপী সকলেরে ।
বিষ্ঠা খেয়ে পাপিলোক ফাঁফরিয়া মরে ॥
গৃধিনী শকুনি মাংস টানে চারিভিতে ।
উপাড়ে সাঁড়াশি দিয়া চক্ষু যমদূতে ॥
হস্ত পদ নাসা কর্ণ নয়ন জিহ্বায় ।
লোহার মুদ্গর মারে অসহ্য সে দায় ॥
পাপপুণ্যে ভাগী হয় যে ইন্দ্রিয়গণ ।
বিষমপ্রহারে ভুঞ্জে যমের তাড়ন ॥
পরনারী চুরি করিয়াছে যেই জন ।
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন ॥
লৌহময়ী এক নারী আনে যমদূতে ।
অগ্নিমধ্যে তাহাকে তাতায় ভালমতে ॥
সেই লোহ অগ্নিসম জ্বলন্ত ভীষণ ।
পাপী সব তায় ধরি দেয় আলিঙ্গন ॥
গার মাংস জ্বলে পরিত্রাহি ডাকে পাপী ।
তাহা দেখি রাবণ হইল অতি তাপী ॥
পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণপ্রহারে ।
জ্বলায় জ্বলিয়া পাপী ধড়ফড় করে ॥
পরদার হরিয়াছে রাবণ বিস্তর ।
বিষম প্রহার দেখি ভাবিত-অন্তর ॥
শরণ লইলে তার যে হরে পরাণ ।
করাতে চিরিয়া তারে করে খান খান ॥
নিদারুণ পিপাসায় তালু তার শোষে ।
পানীয় চাহিলে যমদূতে মারে রোষে ॥
ব্রাহ্মণ-দেবের বস্তু হরে যেই জন ।
তার প্রহারের কথা করি নিবেদন ॥
হস্তপদ বান্ধে তার দিয়া চর্ম্মদড়ি ।
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি ॥
বুকে শূলে মারে কেহ চক্ষু টানি ধরে ।
পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণ প্রহারে ॥
দেবতা স্থাপিয়া যেবা না করে পূজন ।
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন ॥

হাত-পা বান্ধিয়া ফেলে দিয়া চামদাঁড় ।
তাহার উপরে মারে দোহাতিয়া বাড়ি ।।
ঘাড়ে মুড়ে বান্ধি ফেলে অগ্নির ভিতর ।
বিষম প্রহার ভুঞ্জে সহস্র বৎসর ।।
পরধন যেই জন করে ডাকাচুরি ।
ক্ষুরধারে কাটে তারে খণ্ড খণ্ড করি ।।
পরহিংসা পরদ্বেষ করেছে যে জন ।
তার প্রহারের কথা অকথ্য কথন ।।
মিথ্যাশাপ দেয় আর বলে মিথ্যাবাণী ।
তার প্রহারের কত কহিব কাহিনী ।।
প্রতপ্ত সাঁড়াশি দিয়া জিহ্বা লয় কাড়ি ।
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি ।।
যে হরে গচ্ছিত আর হরে স্থাপ্যধন ।
নরকে ডুবায় তারে যমদূতগণ ।।
ব্রাহ্মণেরে মন্দ বলে মারে জ্যেষ্ঠভাই ।
মুষলে তাহারে মারে কারো রক্ষা নাই ।।
পরহিংসা করে বলে অসত্য বচন ।
বিষম তাহার হয় যমের তাড়ন ।।
অপাত্রেতে কন্যা দেয় আরো লয় কড়ি ।
তাহার মাথায় দেয় মাংসের চুপড়ি ।।
'মাংস লহ লহ' বলি সদা ডাক ছাড়ে ।
মাংসের রসানি তার বুকে বয়ে পড়ে ।।
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যেই সভামধ্যে বসি ।
তার জিহ্বা টানে দিয়া জ্বলন্ত সাঁড়াশি ।।
তার পূর্বপুরুষেরা ভুঞ্জে সেই পাপ ।
চিরকাল পাপ ভুঞ্জে পায় বড় তাপ ।।
অতিথি পাইয়া সেই না করে জিজ্ঞাসা ।
অপার দুর্গতি তার নরকেতে বাসা ।।
একজন দান করে অন্যে হয় হাঁতা ।
তার বুকে দেয় যম জগদ্দল জাঁতা ।।
সীমা হরে যেই জন পোড়ায় পরঘর ।
বিষম প্রহার করে যমের কিঙ্কর ।।
উভয়ের ন্যায়ে যেই করে পক্ষপাত ।
কুম্ভীপাকে ফেলে তারে করিয়া আঘাত ।।
হারাণেরে জিনায় যে হইয়া সাপক্ষ ।
যমদূতে মারে তারে কহিতে অশক্য ।।
চুরিডাকা করে যে না করে লোকহিত ।
যমদূতে তাহারে প্রহারে বিপরীত ।।
লোকে পীড়া দিয়া যেই তুষেছে ঈশ্বর ।
পায় সে কুক্কুরজন্ম হাজার বছর ।।
লোকরক্ষা না করি যে রাজা করে নাশ ।
হইয়া শৃগালযোনি খায় মৃতমাস ।।
না চিন্তিয়া দেশহিত চিন্তে নিজ হিত ।
বিষম প্রহার তারে করে সমুচিত ।।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন ।
বিষম যাতনাভোগ করে অনুক্ষণ ।।
গুরুপত্নী হরণেতে যত পাপ হয় ।
তাহার উচিত দণ্ড শরীরে না সয় ।।
মরণে মরণ নাহি দুঃখমাত্র সার ।
কর্ম্মভোগ ভুঞ্জে লোক না দেখে নিস্তার ।।
পাতকী জনের সহ যে জন সম্ভাষে ।
ধার্ম্মিকের ধর্ম্মলোপ হয় সেই দোষে ।।
রাজা হয়ে প্রজা যদি না করে পালন ।
পরলোকে নরক যে তার অখণ্ডন ।।
পুত্র পালনেতে যদি রাজা পালে প্রজা ।
কোটি কল্প স্বর্গসুখ ভুঞ্জে সেই রাজা ।।
শুদ্ধ মনে যেই জন না করে পূজন ।
অর্থের লোভেতে হয় দেবল ব্রাহ্মণ ।।
যেবা হরে দেবস্ব বা করে দুরাচার ।
দেবলিয়া ব্রাহ্মণের নাহিক নিস্তার ।।
হাতে করি ঘৃত দেয় নৈবেদ্য উপরে ।
সেই ঘৃত ঢুকে তার নখের ভিতরে ।।
সে ঘৃত অন্নের তাপে উনাইয়া পড়ে ।
অন্ন সহ ঘৃত যায় শরীর ভিতরে ।।

শাস্ত্রে আছে সঘৃত নৈবেদ্য করে পূজা।
সে পাপে ব্রাহ্মণ হয় কালিঞ্জরে রাজা।।
এ সকল কথা শুনি লাগে চমৎকার।
দেবল ব্রাহ্মণের যে নাহিক নিস্তার।।
যে জন করিয়া ঋণ না করে শোধন।
তার পিতৃলোকে ভুঞ্জে যমের তাড়ন।।
বিঘত প্রমাণ পোকা যে বিষ্ঠার কুণ্ডে।
তাহার উপরে ফেলে ধরি তার মুণ্ডে।।
প্রতপ্ত তৈলের কুণ্ডে অগ্নির উথাল।
তাহার উপরে ফেলে যায় গার ছাল।।
অগ্নি মধ্যে সাঁড়াশি তাতায় ভালমতে।
তাহা দিয়া গাত্রমাংস কাটে যমদূতে।।
ইত্যাদি নরক ভোগ করে বহুবার।
ব্রহ্মস্ব হরণ পাপে নাহিক নিস্তাব।।
পরহিংসা করে যেবা সুজনেরে নিন্দে।
চাম দড়ি দিয়া তারে যমদূতে বান্ধে।।
গলায় বঁড়শি দিয়া করে টানাটানি।
খাণ্ডা দিয়া মাথে তার করে হানাহানি।।
দেখিল রাবণ যত পুরুষ যন্ত্রণা।
ইহা হইতে বাইশগুণ নারীর যাতনা।।
ছোট করুক বড় করুক যত করে পাপ।
পাপানুসারেতে ভুঞ্জে শমনের তাপ।।

রাবণের নিকট যমের পরাজয়

লোকের যাতনা ভাবি দশানন চিতে।
বন্দী মুক্ত করিল সে মারি যমদূতে।।
শরাঘাতে রাবণ যে করে চুরমার।
যমদূত মারি করে বন্দীর উদ্ধার।।
যত পাপ করে লোক ভুঞ্জিবে সকলে।
পাপেতে বান্ধিয়া আনে দাঁড় দিয়া গলে।।
পাপের কারণে পাপী চক্ষে নাহি দেখে।
পাপ দোষে আর বার পড়িল নরকে।।

দশানন বলে বন্দী করিনু উদ্ধার।
আর বার কেন তারে করিছ প্রহার।।
দূত বলে রাবণ আমারে কেন গঞ্জে।
আপনার পাপ লোক আপনি সে ভুঞ্জে।
ইহলোকে, রাবণ, তুমি যত কর পাপ।
পরলোকে এমনি ভুঞ্জিবে পরিতাপ।।
পবলোকে তব সনে হেথা হবে দেখা।
তখন তোমার সঙ্গে হবে লেখাজোখা।।
কুপিল বাবণ রাজা দূতের বচনে।
সন্ধান পুরিয়া বাণ যমদূতে হানে।।
যমেব কিঙ্কর যত নানা অস্ত্র ধরে।
শেল শূল জাঠা জাঠি ফেলে তদুপরে।।
যমদূত সকল সহজে ভয়ঙ্কর।
রাবণেব সনে যুদ্ধ করিল বিস্তর।।
বড় বড় শালগাছ ফেলিল পাথর।
ভাঙ্গিল রথের চাকা রাবণ ফাঁফর।।
ব্রহ্মার বরেতে রথ অক্ষয় অব্যয়।
যত ভাঙ্গে তত হয় নাহি অপচয়।।
নানা শিক্ষা জানে সেই ব্রহ্মার কারণ।
বিচক্ষণ শেলে রাবণ কবিল তাড়ন।।
তিতিল রাবণ-অঙ্গ আপন শোণিতে।
রাবণের গা বহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।।
যমের কিঙ্কর সব বড়ই চতুর।
রাবণের সনে রণ করিল প্রচুর।।
নীল হরিতাল বাণ যমদূতে মারে।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাবণ রথ হতে পড়ে।।
ছট্‌ফট্‌ করে রাজা বাণের জ্বালায়।
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি দূতপানে চায়।।
'থাক থাক' করি সবে গর্জ্জয়ে রাবণ।
পাশুপত বাণ এড়ে রুষিয়া তখন।।
আলো করি আসে বাণ অগ্নি-অবতার।
যম দূত পুড়ে সব হইল সংহার।।

পুড়িয়া মরিল যত দূত অগ্নিতেজে ।
রাবণের রথোপরে জয়ঢাক বাজে ।।
রথোপরি সিংহনাদ ছাড়য়ে রাবণ ।
বাহির হইল রথে রবির নন্দন ।।
রাঙ্গামুখ রথখান অষ্টঘোড়া বহে ।
ত্বরিতে আসিয়া রাবণের আগে রহে ।।
যে মূর্ত্তিতে যমরাজ পৃথিবী সংহারে ।
সে মূর্ত্তিতে মহারাজ আইল সমরে ।।
কালদণ্ড মহা-অস্ত্র যমের প্রধান ।
যুঝিবার বেলা আসি হৈল অধিষ্ঠান ।।
যমেরে কহিছে, প্রভু কর আজ্ঞাদান ।
পরশিয়া রাবণেরে করি খান খান ।।
পরশনে কিবা কাজ দরশনে মরে ।
আজ্ঞা কর আমি গিয়া মারি লঙ্কেশ্বরে ।।
যম বলে, মৃত্যু, দেখ সংগ্রাম সরস ।
দণ্ডহস্তে মারি পাড়ি রাবণ রাক্ষস ।।
তোমার সংগ্রাম আজি ক্ষণেক থাকুক ।
মারি পাড়ি রাবণেরে দেখহ কৌতুক ।।
কালদণ্ডমুখে উঠে অগ্নি খরশান ।
যার দরশনে লোক হারায় পরাণ ।।
চারিভিতে অস্ত্র যার সর্পের আকার ।
কালদণ্ড-অস্ত্রে কারো নাহিক নিস্তার ।।
হেন কালদণ্ড যম তুলে নিল হাতে ।
তাহা হৈতে বাহিরায় সর্প চারিভিতে ।।
অজগর কালসর্প শঙ্খিনী চিত্রাণী ।
মুখে বিষ-অগ্নি তার শিরে জ্বলে মণি ।।
সর্পের বিকটদন্ত স্পর্শমাত্র মরি ।
দণ্ড দেখি ত্রিভুবন কাঁপে থরহরি ।।
বাণমুখে অগ্নি জ্বলে লোকের তরাস ।
সর্ব্বলোকে দেখে দশাননের বিনাশ ।।
ডাক দিয়া যমে সবে করয়ে বাখান ।
রাবণ মরিলে যত দেবে পাবে ত্রাণ ।।

আজি যদি, যম, তুমি মারহ রাবণে ।
তোমার প্রসাদে তবে বাঁচে দেবগণে ।।
দেবতাসহিত ব্রহ্মা আছে অন্তরীক্ষে ।
যমহাতে দণ্ড দেখে আইল সমক্ষে ।।
শমনেরে চতুর্ম্মুখ কহেন বচন ।
ক্ষান্ত হও, যমরাজা, না করিও রণ ।।
রাবণ পাইল বর নাহি তব মনে ।
রাবণে হঠাৎ তুমি মারিবে কেমনে ।।
দণ্ড সৃজিলাম আমি মৃত্যুর কারণ ।
যাহার আঘাতে লুপ্ত হয় ত্রিভুবন ।।
যাহার দর্শনে মরে স্পর্শে কিবা কথা ।
হেন দণ্ড রাবণে মারিবা কেন বৃথা ।।
দণ্ড ব্যর্থ যাবে নাহি মরিবে রাবণ ।
আমার বচন শুন না করিহ রণ ।।
দণ্ড রাখ দণ্ড রাখ শুন দণ্ডধর ।
রাবণেরে জয় দিয়া তুমি যাহ ঘর ।।
যম বলে তব বরে সবার ঠাকুরাল ।
যে লঙ্ঘে তোমার বাক্য যাবে সে পাতাল ।।
যমরাজ কালদণ্ড মৃত্যু তিনজন ।
এ তিনের মূর্ত্তি দেখি কাঁপে ত্রিভুবন ।।
যম কালদণ্ড মৃত্যু এ তিনের গন্ধে ।
পলায় রাক্ষসসৈন্য চুল নাহি বান্ধে ।।
বড় বড় রাক্ষস সে রাবণ সোসর ।
এ তিনের মূর্ত্তি দেখি হইল ফাঁফর ।।
এ তিনের বিক্রম সহিবে কার প্রাণে ।
পলায় রাক্ষস সব ছাড়িয়া রাবণে ।।
অমাত্য পলায় সব ত্যজিয়া রাবণে ।
একেশ্বর রাবণ রহিল মাত্র রণে ।।
যুঝিবার কাজ থাকুক দেখি যমরাজে ।
হেন বীর নাহি যে সম্মুখ হয়ে যুঝে ।।
নির্ভয় রাবণরাজা বিধাতার বরে ।
যমের সম্মুখে যুঝে শঙ্কা নাহি করে ।।

দশদিক দশানন ছাইলেক বাণে।
রাবণের বাণ যম কিছুই না গণে ॥
জাঠা জাঠি শেল এড়ে রবির নন্দন।
রাবণ জর্জ্জর হয় তবু করে রণ ॥
ছাইল যমের রথ রাবণের বাণে।
দশবাণে সারথিরে বিন্ধে দশাননে ॥
সন্ধান পূরিয়া সে ধনুকে যোড়ে শর।
সহস্রেক বাণ এড়ে যমের উপর ॥
মৃত্যুর উপরে করে বাণবরিষণ।
বাণ ব্যর্থ হয় দেখি চিন্তিত রাবণ ॥
অতি মত্ত রাবণ সে বিধাতার বরে।
মৃত্যুর উপরে বাণ ফেলে নাহি ডরে ॥
মৃত্যুর নাহি যে মৃত্যু কি করিবে বাণে।
অবোধ রাবণ তবু যুঝে তাঁর সনে ॥
বাণ খেয়ে মৃত্যু তবে অতি কোপে জ্বলে।
যোড়হাত করিয়া যমের আগে বলে ॥
নিবেদন করি, প্রভু, কর, অবধান।
তোমার অস্ত্রের মধ্যে আমি সে প্রধান ॥
মধুকৈটভাদি যত ছিল দৈত্যগণ।
বালি বলি মান্ধাতা করিয়াছিল রণ ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ দুর্জ্জয়।
তার সহ যুদ্ধ করা উপযুক্ত নয় ॥
তোমার বচন, প্রভু, করি আমি দড়।
রণ ছাড়ি তব বাক্যে দিলাম আমি রড় ॥
রথ হৈতে যম তবে হৈল অদর্শন।
'ধর ধর' বলি পিছে ডাকে দশানন ॥
মন্দ মদ হাসিয়া রাবণরাজা ভাষে।
যম পলাইয়া যায় আমার তরাসে ॥
যম যদি পলাইল দেখিল রাবণ।
আমি যমজয়ী বলি ভাবে দশানন ॥
কৃত্তিবাসকবিত্ব অতি চমৎকার।
সর্ব্বলোকে রামায়ণ করিল প্রচার ॥

রাবণের নিকট বাসুকির পরাজয়

শ্রীরাম বলেন, মুনি, জিজ্ঞাসি কারণ।
বিষম শুনিনু আমি যমের তাড়ন ॥
পাপীর প্রহার শুনি লাগে চমৎকার।
পাতক করিলে কি না হয় প্রতিকার ॥
মুনি বলে, রাম, তুমি কর অবধান।
তব অবতারে পাপী পায় পরিত্রাণ ॥
যেই জন শুনিবেক এই রামায়ণ।
যমের সহিত তার নাহি দরশন ॥
ইহা বিনা পাপীর নাহিক পরিত্রাণ।
রামনাম শুনিবেক পাপী সাবধান ॥
চারিবেদ-অধ্যয়নে যত পুণ্য হয়।
একবার রামনামে তত ফলোদয় ॥
শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস।
'কহ কহ' বলি রাম করেন প্রকাশ ॥
সেথা হতে কোথা গেল দুষ্ট দশানন।
কহ কহ শুনি, মুনি, অপূর্ব্ব কথন ॥
মুনি বলে রাবণ জিনিল সর্ব্বদেশ।
পাতাল জিনিতে শেষে করিল প্রবেশ ॥
বাসুকির বিষে দগ্ধ হয় ত্রিভুবন।
তাহাকে জিনিতে যায় পাতাল ভুবন ॥
চলিল রাবণরাজা অদ্ভুত সাজনি।
আইল তিরাশীকোটি কালভুজঙ্গিনী ॥
এক এক ভুজঙ্গের বিষে বিশ্ব পোড়ে।
নাগিনী তিরাশীকোটি রাবণেরে বেড়ে ॥
চারিভিতে বেড়ে সর্প রাবণ ফাঁফর।
রাবণে এড়িয়া সেনাপতি দিল রড় ॥
রাবণ মুদ্গর ঘোর ফেলে চারিভিতে।
পলায় নাগিনী সব না পারে সহিতে ॥
বাসুকিরে এড়িয়া পলায় উভরড়ে।
আসিয়া রাবণরাজা বাসুকিরে বেড়ে ॥

বাসুকি করিল বিষবাণ অবতার।
ব্রহ্মজালবাণে করে রাবণসংহার ॥
বিষজাল মহাবিষ বাসুকিতে এড়ে।
রাবণ সে বিষজাল সহিতে না পারে ॥
মায়াধারী রাবণ সে জানে নানাসন্ধি।
বাসুকিরে মহাজালবাণে করে বন্দী ॥
বাসুকিরে বন্দী করি লোটে তারপুরী।
বিচিত্র আবাসঘরে ভরা নাগপুরী ॥
বন্দী হয়ে সে বাসুকি মানে পরাজয়।
রাবণ তাহার প্রতি দিলেক অভয় ॥
শতমুণ্ডে সহস্রেক ফণা যেই ধরে।
যার বিষাগ্নিতে সর্ব্ব চরাচর পুড়ে ॥
মুখে জ্বলে অগ্নি যার শিরে মণি জ্বলে।
হেন সব সর্পেরে সে জিনিল পাতালে ॥

রাবণের নিপাতকসহ যুদ্ধ ও মৈত্রী

জিনিয়া সর্পের দেশ নামে ভোগবতী।
নিপাতক রাজ্যেতে চলিল শীঘ্রগতি ॥
নিপাতকরাজ্যে তার নাহি কোন ডর।
পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ দুর্দ্ধর ॥
রাবণ ডাকিয়া বলে নিপাতকঠাঁই।
লঙ্কার রাবণ আমি আজি যুদ্ধ চাই ॥
নিপাতকরাজা সেই যমদরশন।
ধাইয়া আইল শীঘ্র করিবারে রণ ॥
শেল জাঠি ঝকড়া যে অস্ত্র খরশান।
খাঁড়া আর ডাঙ্গস বিচিত্র ধনুর্ব্বাণ ॥
নানাঅস্ত্র লইয়া উভয়ে করে রণ।
উভয়ের অস্ত্র গিয়া ছাইল গগন ॥
দুই হস্তী রণে যেন দন্তহানাহানি ॥
দুই সূর্য্যতেজে যেন ছাইল মেদিনী ॥
দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুইজনে যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ ॥
উভয়ের যুদ্ধেতে হইল মহামার।
সকল পাতালপুরী হল অন্ধকার ॥
কেহ কারে নাহি পারে দুজনে সোসর।
মাসেক দুজনে যুদ্ধ করে নিরন্তর ॥
একমাস যুদ্ধ করে কেহ কারে নারে।
দেবগণে লয়ে ব্রহ্মা আইল সত্বরে ॥
ব্রহ্মা বলে, নিপাতক, শুনহ বচন।
তোমারে জিনিতে নাহি পারিবে রাবণ ॥
নিপাতকে প্রবোধিয়া বিরিঞ্চি তখন।
রাবণের প্রতি কিছু কহেন বচন ॥
রাবণ, তোমারে বলি শুনহ বচন।
নিপাতকে জিনিতে না পারিবে কখন ॥
মম বরে দুইজন হয়েছ দুর্জ্জয়।
দুইজনে প্রীতি করি থাকহ নির্ভয় ॥
লঙ্ঘিবারে পারে কেবা ব্রহ্মার বচন।
অস্ত্র ছাড়ি প্রীতি করে তবে দুইজন ॥
নানাভোগে রাবণেরে রাখিল সম্মানে।
একবর্ষ রাবণ রহিল সেই স্থানে ॥

রাবণের বরুণপুরী বিজয়

লঙ্কার অধিক ভোগ ভুঞ্জি তার ঘর।
বরুণেরে জিনিতে চলিল লঙ্কেশ্বর ॥
রত্নেতে নির্মিত পুরী দিক আলো করে।
সুরভি আছেন সেই বরুণনগরে ॥
রাবণ করিল সুরভিরে দরশন।
ক্ষীরধারা বহিতেছে তার অনুক্ষণ ॥
যার ক্ষীরে ভাসিয়াছে ক্ষীরোদসাগর।
হেন ধেনু প্রদক্ষিণ করে লঙ্কেশ্বর ॥
সুরভিকে দেখিয়া রাবণ মনে ভাবে।
যে যা চায় তাই পায় আমি চাই তবে ॥
বরুণে জিনিয়া যেন আসি শীঘ্রগতি।
গমন সময়ে তোমা লইব সংহতি ॥

এত বলি বরুণে জিনিতে দ্রুত চলে।
সুরভি সে অন্তর্দ্ধান হৈল হেনকালে।।
বরুণের দ্বারে গিয়া ডাকিল রাবণ।
কোথা গেলে বরুণ আসিয়া দেহ রণ।।
বরুণের পাত্র বলে তিনি নাহি ঘরে।
কার ঠাই যুদ্ধ চাহ এ শূন্য নগরে।।
রাবণ বলিছে কোথা গিয়াছে বরুণ।
তথা গিয়া আজি আমি করি মহারণ।।
বরুণেব পুত্রগণ সবে মহাবীর।
লইয়া সামন্ত সৈন্য হইল বাহির।।
তা সবারে রাবণ যে আকাশে নিরখে।
রাবণ চড়িয়া রথে যায় অন্তরীক্ষে।।
বরুণের পুত্র করে বাণ বরিষণ।
বাণে বিন্ধ রাবণ হইল অচেতন।।
রাবণ ফুটিয়া বাণ হইল কাতর।
তাহা দেখি রুষিল রাক্ষস মহোদর।।
মহোদর বীর যেন মদমত্ত হাতী।
বাণেতে বিন্ধিয়া পাড়ে রথের সারথি।।
পড়িল সারথি যদি বাণ বিন্ধে বুকে।
তিনভাই পলাইয়া যায় অন্তরীক্ষে।।
অন্তরীক্ষে থাকি করে বাণ বরিষণ।
বাণে বিন্ধ মহোদর হৈল অচেতন।।
অচেতন মহোদরে দেখি লঙ্কেশ্বর।
সন্ধান পুরিয়া বাণ এড়িল বিস্তর।।
আকাশে রহিতে নারে তিন সহোদর।
ভূমেতে পড়িয়া হয় ধূলায় ধূসর।।
তিন ভায়ে ধরিল অনেক অনুচর।
ধরিয়া আনিল সবে পুরীর ভিতর।।
রণ জিনি রাবণের হরিষ অন্তর।
বরুণের অন্বেষণ করে লঙ্কেশ্বর।।
বরুণের পুত্রে জিনি বরুণেরে চাহে।
প্রভাস নামেতে পাত্র রাবণেরে কহে।।
ব্রহ্মলোকে গীত গায় শুনিতে সুন্দর।
গিয়াছেন সেখানে বরুণ জলেশ্বর।
এত শুনি গেল রাবণ ভিতর আবাস।
পালঙ্কে পাইল বরুণের নাগপাশ।।
নাগপাশ পাইয়া সে সিংহনাদ ছাড়ে।
বিদায় হইয়া রাবণ তথা হৈতে নড়ে।।

বলির সঙ্গে যুদ্ধে রাবণের লাঞ্ছনা

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
'কহ কহ' বলি রাম করেন প্রকাশ।।
সেথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ।
কহ দেখি শুনি, মুনি, পুরাণ কথন।।
মুনি বলে বলিরাজা পাতালেতে বৈসে।
দশানন গেল তথা জিনিবার আশে।।
পাতালে আবাস ঘর অতি সুনির্ম্মিত।
দেখিয়া রাবণ রাজা হৈল চমকিত।।
সোণার প্রাচীর ঘর পর্ব্বত প্রমাণ।
বিষ্ণুর আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।।
প্রহস্তকে রাবণ পাঠাল জিনিবারে।
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া প্রহস্ত গেল দ্বারে।।
বলির দুয়ারে দ্বারী স্বয়ং নারায়ণ।
শরীরের জ্যোতিঃ কোটি সূর্য্যের কিরণ।।
আছেন বসিয়া দ্বারে রত্নসিংহাসনে।
শ্বেত চামরের বায়ু পড়ে ঘনে ঘনে।।
প্রহস্ত বিস্মিত হয়ে আসিয়া সত্বর।
নিবেদন করিছে শুন হে লঙ্কেশ্বর।।
দেখিতেছি, মহারাজ, দুয়ারে বলির।
পরম পুরুষ এক সুন্দর শরীর।।
আজানুলম্বিত তাঁর ভুজ চতুষ্টয়।
শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ তথি শোভা পায়।।
শ্যামল কোমল তনু সুপীত বসন।
তড়িতজড়িত যেন দেখি নব ঘন।।

বক্ষঃস্থল কৌস্তুভেতে শোভে অতিশয় ।
বনমালা তদুপরি করেছে আশ্রয় ॥
শুনিয়া রাবণ যায় পুরুষের পাশে ।
রাবণে দেখিয়া সেহ মৃদু মৃদু হাসে ॥
রূপে আলো করিয়াছে বলির দুয়ার ।
নিরখিয়া রাবণের লাগে চমৎকার ॥
রাবণ বলিছে, দ্বারী, পলাবি কোথায় ।
লঙ্কার রাবণ আমি যুদ্ধ দে আমায় ॥
শুনিয়া পুরুষ মৃদু হাসিয়া সম্ভাষে ।
বলি সনে যুঝ গিয়া ভিতর আবাসে ॥
বীরমধ্যে বীর আমি মুনিমধ্যে মুনি ।
ত্রিভুবন সব আমি দিবস রজনী ॥
আমা সহ যুঝিবে শুনিতে উপহাস ।
কারো সনে যুঝিতে না করি অভিলাষ ॥
সমানে সমানে যুদ্ধ হয় ত উচিত ।
তোমার আমার সনে যুদ্ধ অনুচিত ॥
আমি বলি তোমারে শুনহ দশানন ।
বলিকে জিজ্ঞাসা কর আমি কোন্ জন ॥
এতেক শুনিয়া দশানন রাজা হাসে ।
বলির নিকটে গেল ভিতর আবাসে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল বলি বসিতে আসন ।
জিজ্ঞাসিল পাতালেতে এলে কি কারণ ॥
সে বলে পাতালে বিষ্ণু রাখিল তোমারে ।
সাজিয়া আইনু আমি বিষ্ণু জিনিবারে ॥
বলি বলে হেন বাক্য নাহি বল তুণ্ডে ।
ত্রিভুবন আইলে বন্ধন নাহি খণ্ডে ॥
দুয়ারে যাঁহার সনে হৈল দরশন ।
সে পুরুষ সৃজিলেন এই ত্রিভুবন ॥
যাঁহার উপরে কারো নাহি অধিকার ।
সকল সৃজিয়া তিনি করেন সংহার ॥
রাবণ বলিছে যম মৃত্যু কালদণ্ড ।
ইহা হতে কোন্ জন আছে হে প্রচণ্ড ॥
বলি বলে কি করিবে ভাই যমরাজ ।
ত্রিভুবনে কেহ নাহি পুরুষ সমাজ ॥
যম ইন্দ্র বরুণ যতেক লোকপাল ।
পুরুষের প্রসাদেতে সকলে বিশাল ॥
ইঁহার প্রসাদে দেব হয়েছে অমর ।
এঁর বড় বীর নাই ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
দানব রাক্ষস আদি বড় বড় বীর ।
পুরুষ দর্শনে, ভাই, কেহ নহে স্থির ॥
সেই সে পুরুষবর স্বয়ং নারায়ণ ।
তোমায় কিঞ্চিৎ কহি শুন হে রাবণ ॥
সেই দেব নারায়ণ মধুকৈটভারি ।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী ॥
রাবণ শুনিয়া ইহা হইল বাহির ।
পুরুষের দেখা নাহি অদৃশ্য শরীর ॥
রাবণ বলিছে ত্রাসে হৈল অদর্শন ।
পেলে চড়ে বধিতাম তাহার জীবন ॥
রাবণ আবার গেল পুরুষ উদ্দেশে ।
উপস্থিত হইল সে ভিতর আবাসে ॥
বলি বলে রাবণের নাহি পাই মন ।
পুনঃ পুনঃ আবাসে আইসে কি কারণ ॥
পাত্র লয়ে বসি তবে করে অনুমান ।
বিনা যুদ্ধে রাবণে করিব অপমান ॥
বলিরে ধরিতে যায় রাবণ সেখানে ।
আপন বন্ধন বলি দিল ততক্ষণে ॥
বন্ধনে পড়িল দুষ্ট আপনার দোষে ।
রাবণ পড়িল বন্দী বলিরাজ হাসে ॥
রাবণেরে বন্দী দেখি তুষ্ট দেবগণ ।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ ॥
যত দেবকন্যা তারা করে হুলাহুলি ।
বলির উপরে ফেলে পুষ্পের অঞ্জলি ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আর দেবঋষি ।
নাচিয়া বেড়ায় স্বর্গে যত স্বর্গবাসী ॥

আজি হৈতে দেবগণ পাইল নিস্তার ।
দেখিয়া রাক্ষসগণ করে হাহাকার ॥
এইমত বন্দীশালে আছে ত রাবণ ।
কৌতুকে নাচিয়া বেড়ায় যত দেবগণ ॥
বলি ভূপতির আছে সাত শত দাসী ।
দেখিতে মোহিনী সবে পরমা রূপসী ॥
উচ্ছিষ্ট ব্যঞ্জন অন্ন পূর্ণ স্বর্ণথালে ।
পাখালিতে যায় তারা সাগরের জলে ॥
রাবণ বলেন, কন্যা, শুনহ বচন ।
একমুষ্টি অন্ন দিয়া রাখহ জীবন ॥
চেড়ী সব বলে শুন রাজা লঙ্কেশ্বর ।
দিতেছি তুলিয়া অন্ন মেল ত অধর ॥
দয়া করি চেড়ী অন্ন দিল ততক্ষণ ।
মুখ পসারিয়া অন্ন খাইল রাবণ ॥
কুঁজী বলে, রাবণ, তুমি হে মহারাজ ।
উচ্ছিষ্ট খাইতে তুমি নাহি বাস লাজ ॥
বন্ধন লইতে বলি চিন্তে মনে মনে ।
আপনার বন্ধন লইল ততক্ষণে ॥
লজ্জা পেয়ে রাবণ করিল হেঁটমাথা ।
রাবণ বন্ধন ছাড়ি পলাইল কোথা ॥
যথায় যথায় আছে বিষ্ণু অধিষ্ঠান ।
তথা তথা রাবণ পাইল অপমান ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরাম কৌতুকী ।
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসেন মনে হৈয়া সুখী ॥
সেথা হতে আর কোথা গেল সে রাবণ ।
কহ দেখি শুনি, মুনি, অপূর্ব্ব কথন ॥

মান্ধাতার সহিত রাবণের যুদ্ধ ও মৈত্রী

মুনি বলে রাবণ আছয়ে রথোপর ।
দিব্য রথে চড়ি যায় এক নরবর ॥
স্বর্ণরথখান তার বহে রাজহংসে ।
সাতশত দেবকন্যা পুরুষের পাশে ॥
কেহ হাসে কেহ নাচে কারো মুখে বাঁশী
স্ত্রীগণ বেষ্টিত সে পুরুষ স্বর্গবাসী ॥
রথের উপরে যায় পরমকৌতুকে ।
আপনার রথে থাকি রাবণ তা দেখে ॥
রাবণ বলিছে কোথা পুরুষ পলাও ।
লঙ্কার রাবণ আমি যুদ্ধ মোরে দাও ॥
পুরুষ ডাকিয়া বলে শুন লঙ্কেশ্বর ।
বহুদিন করিলাম তপস্যা বিস্তর ॥
পৃথিবীতে রাজা আমি ছিলাম প্রধান ।
তোমা হেন অনেকের লইয়াছি প্রাণ ॥
না করিল কেহ মোরে যুদ্ধে পরাজয় ।
স্বর্গবাসে যাই আমি একথা নিশ্চয় ॥
আমারে জিনিতে কেহ নারিল সংগ্রামে ।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি পূর্ব্বমুনি নামে ॥
পৃথ্বীলীলা অবসানে যাই স্বর্গবাসে ।
এমন সময় যুদ্ধ যুক্তি না আইসে ॥
রাবণ বলিল তুমি মোর ধর্ম্মবাপ ।
পূর্ব্বে মোর পিতৃসহ তোমার আলাপ ॥
দিগ্বিজয় করি আমি ত্রিভুবন জিনি ।
কার সনে যুদ্ধ করি মনে অনুমানি ॥
দিনেক রহিতে নারি আমি বিনা রণে ।
তুমি যুক্তি বল আমি যুঝি কার সনে ॥
পূর্ব্বমুনি বলে আছে মান্ধাতা নৃপতি ।
তার সনে যুঝহ সে সপ্তদ্বীপপতি ॥
গেল সে ভ্রমিতে দেশ উত্তর দিকেতে ।
থাক আজি বাসা করি এ রম্য পর্ব্বতে ॥
এ পর্ব্বতে তার সনে হবে দরশন ।
মান্ধাতা আইলে যুদ্ধ করিও তখন ॥
এত বলি পূর্ব্বমুনি গেল স্বর্গবাসে ।
হেনকালে মান্ধাতা কটকসহ আইসে ॥
মান্ধাতাকে দেখিয়া যে রুষিল রাবণ ।
মান্ধাতা রাবণ দোঁহে বড় বাজে রণ ॥

দিগ্বিজয় করিয়া বেড়ায় দুই জন।
নানা অস্ত্র দুই রাজা করে বরিষণ ॥
দুই রাজা নানা অস্ত্র করে অবতার।
উভয় রাজার সেনা পলায় অপার ॥
মান্ধাতা হীরার টাঙ্গী পাক দিয়া এড়ে।
রাবণ খাইয়া টাঙ্গী রথ হৈতে পড়ে ॥
পড়িল রাবণরাজা বেড়ে সেনাপতি।
হর্ষে সিংহনাদ ছাড়ে মান্ধাতা নৃপতি ॥
চক্ষুর নিমিষে পায় রাবণ সম্বিত।
ধনুক পাতিয়া যুঝে মান্ধাতা চিন্তিত ॥
অগ্নিবাণ এড়িলেক রাক্ষস রাবণ।
জ্বলিয়া আগ্নেয় বাণ উঠিল গগন ॥
দেখিয়া ত্রিদশগণে লাগে চমৎকার।
মান্ধাতা পড়িল সৈন্য করে হাহাকার ॥
সম্বিত পাইয়া উঠে চক্ষুর নিমিষে।
উঠি সিংহনাদ করে মান্ধাতা হরিষে ॥
উভয়ের সিংহনাদে পৃথিবী উলটে।
দুইরাজা বাণ এড়ে দুই রাজা কাটে ॥
দুইরাজা ক্রোধে বাণ এড়িছে বিস্তর।
মহাশব্দ করে বাণ তূণের ভিতর ॥
কেহ কারে জিনিবারে নাহি পায় আশ।
এবই সমান যুদ্ধ করে দশমাস ॥
মান্ধাতা এড়িল বাণ নামে পাশুপত।
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে পৃথিবী পর্ব্বত ॥
সপ্ত স্বর্গ কাঁপে আর সে সপ্ত সাগর।
শুনিয়া বাণের শব্দ স্বর্গে লাগে ডর ॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল মহর্ষি ভার্গবে।
অবিলম্বে তথা আসি কন তিনি তবে ॥
সম্বর সম্বর ক্রোধ না কর মান্ধাতা।
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিলেন শুন তার কথা ॥
আছে যে ব্রহ্মার বর রাবণ না মরে।
তব বাণে রাবণের কি করিতে পারে ॥
তব বংশে যে পুরুষ জন্মিবেন শেষে।
তাঁর ঠাঁই দশানন মরিবে সবংশে ॥
তব বাণে না মরিবে লঙ্কার রাবণ।
অস্ত্র সম্বরিয়া প্রীতি কর দুইজন ॥
মুনির বচন রাজা না করিল আন।
সম্প্রীতি করিয়া দোঁহে গেল নিজ স্থান ॥
মান্ধাতারাবণেতে সমান গেল রণে।
জয়পরাজয় কারো নহিল সেক্ষণে।
অগস্ত্যের কথা শুনি রাম উল্লসিত।
'কহ' বলি মুনিকে করেন উৎসাহিত ॥
মান্ধাতা ছাড়িয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি শুনি, মুনি, অপূর্ব্ব কথন ॥

রাবণ কর্তৃক চন্দ্রলোক জয়

মুনি বলে একদিন ঘটিল এমন।
রথোপরি চড়িয়া ভ্রমিছে দশানন ॥
হেনকালে গগনে হইল চন্দ্রোদয়।
দেখিয়া হইয়া রুষ্ট দুষ্ট স্পষ্ট কয় ॥
আমার বাণেতে মেরু নাহি ধরে টান।
আমার উপর দিয়া করিছে পয়াণ ॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল কম্পিত যার ডরে।
লঙ্কার রাবণ আমি গ্রাহ্য নাহি করে ॥
দেখিব কেমন চন্দ্র কত তার বল।
তাহারে জিনিব আর হরিব সকল ॥
এইমত ভাবিয়া সে উঠিল আকাশে।
চন্দ্রলোকে গেল চন্দ্র জিনিবার আশে ॥
চন্দ্রলোক দুইলক্ষ যোজনের পথ।
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া যাইবে চড়ি রথ ॥
উঠিল প্রথম স্বর্গে রাজা দশানন।
পর্ব্বত এড়িয়া উঠে সহস্রযোজন ॥
উঠিল দ্বিতীয় স্বর্গে যাইতে যাইতে।
সহস্রযোজন উঠে পর্ব্বত হইতে ॥

উঠিল তৃতীয় স্বর্গে সেই মহারথী ।
সেই স্বর্গে বিরাজিতা গঙ্গাভাগীরথী ।।
রাজহংস আদি পক্ষী চরে গঙ্গানীরে ।
রাবণ কটক সহ গঙ্গাস্নান করে ।।
গঙ্গাতটে নিত্যকর্ম্ম করি সমাপন ।
সকল কটক রথে করিল গমন ।।
আছেন শঙ্করগৌরী তাহার উপর ।
রথে চড়ি সেই স্বর্গে গেল লঙ্কেশ্বর ।।
গৌরীভক্ত যেই জন পূজেছে পার্ব্বতী ।
সে স্থানে দেখে রাবণ তাহার বসতি ।।
তদুপরি শিবলোক উঠিল রাবণ ।
দেখে যক্ষ পিশাচ সে শঙ্করের গণ ।।
তিন কোটি দেব ছিল ধূর্জ্জটির পাশে ।
রাবণে দেখিয়া তারা পলায় তরাসে ।।
তদুপরি বৈকুণ্ঠেতে উঠিল রাবণ ।
পুরী প্রদক্ষিণ করি করিল গমন ।।
ব্রহ্মালোকে গেল সে ব্রহ্মার নিজ স্থান ।
আড়ে দীঘে অযুতেক যোজন প্রমাণ ।।
তাহাতে সহস্র স্বর্গ দেখিল নির্ম্মাণ ।
বিশ্বকর্ম্মাকৃত পুরী অদ্ভুত বিধান ।।
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া সে উঠিল রাবণ ।
চন্দ্রের সহিত পরে হইল মিলন ।।
রাবণে দেখিয়া চন্দ্রদেব বড় রোষে ।
সহস্র সহস্র গুণ তুষার বরিষে ।।
হিম বরিষণে কটকের হৈল জাড় ।
কটকের হস্তপদ জাড়ে হৈল আড় ।।
হস্তপদ নাহি সরে বদ্ধ হয়ে জাড়ে ।
তথাপি রাবণ রাজা রণ নাহি ছাড়ে ।।
প্রহস্ত বলিছে জাড়ে জোর নাহি হাতে ।
পলাইয়া চল যাই বাঁচি কোনমতে ।।
রাবণ কাতর হৈয়া যুঝিতে না পারে ।
প্রাণ যায় তথাপি সে রণ নাহি ছাড়ে ।।
রাবণ করিল এই উপায় প্রধান ।
বাহির করিল অগ্নিময় মহাবাণ ।।
ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে সেই বাণ-অগ্রভাগে ।
সে বাণের প্রতাপেতে সব জাড় ভাগে ।
অগ্নিবাণ এড়িলেক রাজা লঙ্কেশ্বর ।
বাণে বিদ্ধ চন্দ্রমা হইল জরজর ।।
বাণাঘাতে চন্দ্রমা হইল অচেতন ।
পাইয়া চেতন পুনঃ উঠিল তৎক্ষণ ।।
উভরড়ে চন্দ্রমা পলায় ত্যজি রণ ।
পলায় চীৎকার ছাড়ি যত তারাগণ ।।
প্রাণ লয়ে গেল চন্দ্র গণিয়া প্রমাদ ।
ব্রহ্মালোকে গিয়া চন্দ্র করেন বিষাদ ।।
ক্রন্দন করেন চন্দ্র ব্রহ্মা পান দুঃখ ।
ত্বরিত গেলেন ব্রহ্মা রাবণসম্মুখ ।।
ব্রহ্মা বলিলেন শুন অবোধ রাবণ ।
চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ ।।
সর্ব্বলোকে বন্দে দেখ দ্বিতীয়ার চন্দ্র ।
পূর্ণিমার চন্দ্র দেয় জগতে আনন্দ ।।
সর্ব্বলোকে হৃষ্ট করে জোছনা রজনী ।
চন্দ্রের সহিত কেন কর হানাহানি ।।
কারো মন্দ না করে সবার করে হিত ।
হেন চন্দ্রে মারিতে তোমার অনুচিত ।।
শুন রে রাবণ তোরে মন্ত্র কহি কাণে ।
পরেরে মারিতে পাছে নিজে মর প্রাণে ।।
দুইজনে যুদ্ধ হৈলে মরে একজন ।
অতঃপর ক্ষমা দেহ অবোধ রাবণ ।
বিধাতার বচন লঙ্ঘিবে কোন্ জন ।
রাবণ প্রবোধ মানি করিল গমন ।।
অগস্ত্যের কথা শুনি হৃষ্ট রঘুমণি ।
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন কহ মুনি ।।
চন্দ্রকে জিনিয়া কোথা গেল দশানন ।
কহ দেখি, মুনি, শুনি পুরাণকথন ।।

রাবণের কুশদ্বীপে গমন ও মহাপুরুষের সহিত দ্বন্দ্ব

অগস্ত্য বলেন শুন জানকীবল্লভ ।
রাবণের দিগ্বিজয় কহি আমি সব ।।
জম্বুদ্বীপ পার গেল রাজা লঙ্কেশ্বর ।
কুশদ্বীপে দেখে এক পুরুষপ্রবর ।।
সুমেরু পর্ব্বত যেন দেহের আকার ।
দেবের দেবতা যেন দেবতার সার ।।
বারযোজনের পথ আড়ে পরিসর ।
বার শত যোজন শরীর দীর্ঘতর ।।
রাবণ বলিছে হে পুরুষ কেবা তুমি ।
দেহ রণ সংগ্রাম চাহিয়া আমি ভ্রমি ।।
পুরুষের কাছে গিয়া দশানন তর্জ্জে ।
অজগর সর্প যেন সে পুরুষ গর্জ্জে ॥
পুরুষ বলেন আজি ঘুচাই বিষাদ ।
কতদিন সব আর তোর অপরাধ ।।
কুড়িহাতে রাবণ সে নানা-অস্ত্র এড়ে ।
পুরুষের গায়ে ঠেকি উখাড়িয়া পড়ে ।।
নর নহে পুরুষ আপনি নারায়ণ ।
বাণ ব্যর্থ যায় দেখি চিন্তিত রাবণ ॥
পর্ব্বত যুগল যেন উরু দুই খণ্ড ।
আজানুলম্বিত দুই মহাবাহুদণ্ড ।।
অষ্টবসু আছে সেই পুরুষশরীরে ।
বহিছে সাগর সপ্ত পুরুষ উদরে ।।
দশদিকপাল আছে পুরুষের পাশে ।
উনপঞ্চাশৎ বায়ুসহ বায়ু বৈসে ।।
হৃদিপদ্মে পুরুষের ব্রহ্মার বসতি ।
নাভিপদ্ম আসনে বৈসেন হৈমবতী ॥
তাঁহার ললাটে সন্ধ্যা গায়ত্রী লিখন ।
অদ্ভুত দেখিল যেন মেঘের পতন ॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব দানব বিদ্যাধর ।
তিনকোটি দেবকন্যা তাঁহার সোসর ।।
করণ নক্ষত্র যোগ গ্রহ তিথি বার ।
গাত্রে লোমাবলী রূপে আছে অবতার ॥
বাসুকির বিষজালে বিশ্ব দগ্ধ করে ।
সে বাসুকি পুরুষের মস্তক উপরে ।
রসনায় সরস্বতী সদা স্ফূর্ত্তিমতী ।
চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষু সদা করে দ্যুতি ॥
রাবণেরে চারিহাতে ধরেন তখন ।
বিংশহস্ত রাবণ সে হৈল অচেতন ॥
অচেতন হয়ে ভূমে লোটায় রাবণ ।
পুরুষ গেলেন পরে পাতাল ভুবন ॥
উলটিয়া চাহিতে লাগিল লঙ্কেশ্বর ।
দেখিতে না পায় কিছু হইল কাতর ॥
শরীর ঝাড়িয়া শুক সারণেরে পুছে ।
পুরুষ আমারে মারি গেল কার কাছে ॥
বলে শুক সারণ শুনহ লঙ্কেশ্বর ।
তোমারে মারিয়া গেল পাতাল ভিতর ।।
রাবণ পাতালে গেল পুরুষ-উদ্দেশে ।
কোটি চতুর্ভুজ দেখে পুরুষের পাশে ॥
সকল পাতালপুরী করে নিরীক্ষণ ।
মায়া রূপী তিনি তাঁরে না চিনে রাবণ॥
ত্রাস পেয়ে মনে মনে ভাবিত রাবণ ।
পুরুষ রাবণে দেখা দেন ততক্ষণ ॥
পুরুষ সুবর্ণখাটে হরিষ-অন্তরে ।
তিনকোটি দেবকন্যা পরিচর্য্যা করে ॥
বসিয়াছে দেবকন্যাগণ কুতূহলে ।
পুরুষে রাবণ যায় ধরিবারে বলে ॥
কোপদৃষ্টে পুরুষ রাবণপানে চায় ।
অগ্নিতে পুড়িয়া ভূমে রাবণ লোটায় ॥
'উঠ উঠ' বলিয়া পুরুষ ডাকে তারে ।
উঠিয়া রাবণ সে গায়ের ধূলা ঝাড়ে ॥

রাবণ বলিছে তুমি কোন্ অবতার।
পরিচয় দেহ তুমি ভুবনের সার॥
পুরুষ ডাকিয়া শুনরে রাবণ।
তোরে পরিচয় দিয়া কোন্ প্রয়োজন॥
যোড়হাত করিয়া বলিছে লঙ্কেশ্বর।
ব্রহ্মার প্রসাদে মোর কারে নাহি ডর॥
তুমি হে আমারে মার তবে সে মরণ।
তোমা বিনা অন্য হাতে না মরে রাবণ॥
রাবণের কথা শুনি পুরুষের হাস।
নিতান্ত আমার হাতে হইবে বিনাশ॥
পরিচয় দিলেন পুরুষ রাবণেরে।
রাবণ বিদায় হৈয়া তথা হৈতে সরে॥
শ্রীরাম বলেন কহ মুনি মহাশয়।
সে পুরুষ কোন্ জন দেহ পরিচয়॥
অগস্ত্য বলেন তিনি ভুবনের সার॥
চতুর্ভুজ তিনকোটি তাঁর পরিবার॥
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ কৌশল্যানন্দন।
তথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ॥

সুর্পণখার বৈধব্য

মুনি বলে দশানন দেশে দেশে চলে।
একদিন উঠিল সে গগন মণ্ডলে॥
তিনকোটি দৈত্য তথা কালকুলপতি।
রাবণেরে বেড়ে তারা সবসেনাপতি॥
তিনকোটি দৈত্য তারা যমের দোসর।
রাবণেরে বিন্ধি তারা করিল জর্জ্জর॥
জিনিতে না পারে দৈত্য চিন্তিত রাবণ।
অগ্নিবাণ ধনুকেতে যুড়িল তখন॥
অগ্নিবাণ যুড়িলেক অগ্নি-অবতার।
অগ্নিবাণে দৈত্য সব হইল সংহার॥
একবাণে তিনকোটি করিল সংহার।
রাবণ বলিল লুট দৈত্যের ভাণ্ডার॥
সুর্পণখা নামে ছিল রাবণভগিনী।
রাবণের কাছে কান্দে চক্ষে পড়ে পানি॥
সুর্পণখা বলে, ভাই, তুমি মোর অরি।
বিধবা করিলে মোরে মোর পতি মারি॥
তিনকোটি দৈত্য যে মারিলে তুমি বলে।
মারিলে আমার স্বামী তাহার মিশালে।
পাত্র মিত্র আদি আর বিভীষণ ভাই।
সকলে বিবাহ দিল দানবের ঠাঁই॥
যে দিন বিবাহ সেই দিন হৈনু রাঁড়ী।
সাগরে প্রবেশ করি আমি প্রাণ ছাড়ি॥
সুর্পণখার হাতে ধরি বলে মহারাজ।
অজ্ঞাতে হইল কর্ম্ম কত দেহ লাজ॥
দুই ভাই আছয়ে খর আর দুষণ।
তাহারা তোমার সদা করিবে পালন॥
স্বতন্ত্রা হইয়া তুমি থাক জনস্থানে।
স্বতন্ত্রের নামে রাঁড়ী হৃষ্ট হয় মনে॥
আর যত রাণ্ডী ঘরে বঞ্চয়ে যৌবন।
স্বতন্ত্রা করিল তারে কুবুদ্ধি রাবণ॥
সুর্পণখা চলিল সে রাবণ-আদেশে।
সবংশে রাবণ মরে সে রাণ্ডীর দোষে॥
সে রাণ্ডীর নাক কাণ কাটিল লক্ষ্মণ।
তাহা হৈতে সবংশেতে মরিল রাবণ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
'কহ কহ' বলি রাম করিলা প্রকাশ॥

রাবণের স্বর্গ জয় করিতে গমন

অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
ইন্দ্র রাবণের যুদ্ধ কহি তব স্থান॥
কৌতুকে রাবণরাজা আছে লঙ্কাপুরে।
হেনকালে বিভীষণ বলে রাবণেরে॥
বলে হরে আন তুমি পরের সুন্দরী।
মধুদৈত্য আসি তব ভগ্নী কৈল চুরি॥

যত পাপ কর তুমি তোমারে সে ফলে।
কুম্ভনসী ভগ্নী দৈত্য হরে নিল বলে ॥
প্রহস্ত মামার কন্যা নামে কুম্ভনসী।
রাত্রিতে করিল চুরি মধুদৈত্য আসি ॥
অপমান শুনি রাজা কহিছে বিষাদে।
লঙ্কাপুরে কি করিতে আছে মেঘনাদে ॥
সুমেরু কাটিয়া পাড়ে মেঘনাদ বাণে।
এত অপমান করে তার বিদ্যমানে ॥
তুমি আছ বিভীষণ ভাই সহোদর।
এত বীর সবে আছ লঙ্কার ভিতর ॥
কারো শক্তি নাহি যুদ্ধ কর দৈত্য সনে।
তোমা সবাকারে ধিক্ কি ফল জীবনে ॥
কুম্ভকর্ণবীর যদি লঙ্কাপুরে জাগে।
ভুবনের শত্রু নাহি আসে তার আগে ॥
দিগ্বিজয় করে এনু আমি ত্রিভুবন।
থাকুক দৈত্যের কাজ ভাগে দেবগণ ॥
ত্রিভুবন সে জিনিয়া এনু একেশ্বর।
ভগিনী রাখিতে নার ঘরের ভিতর ॥
কুম্ভকর্ণ আর আমি আছি দুইজন।
মেঘনাদ আদি সব বীর অকারণ ॥
লজ্জা পেয়ে রাবণেরে বলে বিভীষণ।
কারো দোষ নাহি দোষ দেহ অকারণ ॥
মেঘনাদ যজ্ঞ করে হইয়া তপস্বী।
ফলমূল খাই আমি থাকি উপবাসী ॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন।
সন্ধান পাইয়া হানা দিল দৈত্যগণ ॥
রাবণ বলে যজ্ঞ কেন করে মেঘনাদ।
যজ্ঞ লাগি লঙ্কাপুরে এতেক প্রমাদ ॥
মেঘনাদ যজ্ঞকথা কহে বিভীষণ।
যজ্ঞস্থানে রাজা তবে করিল গমন ॥
বিচিত্র যজ্ঞের স্থান বটবৃক্ষতলা।
মেঘনাদ যজ্ঞ করে নামে নিকুম্ভিলা ॥
অনাহারে যজ্ঞশালে রাত্রিদিন থাকে।
দ্বাদশ বৎসর নাহি নারীমুখ দেখে ॥
স্বর্ণ নামে আছিল প্রধান পুরোহিত।
তাহারে লইয়া যাগ করয়ে ত্বরিত ॥
ন্যাস করি পুরোহিত অগ্নিকুণ্ড পূজে।
অগ্নি আসি অধিষ্ঠান হয় মন্ত্রতেজে ॥
অধিষ্ঠান হয়ে অগ্নি রহিলা সম্মুখে।
মেঘনাদ পূজা দেয় দশানন দেখে ॥
যজ্ঞের আহুতি খেয়ে অগ্নির সন্তোষ।
মেঘনাদে বর দেন হয়ে পরিতোষ ॥
অগ্নি বলে মেঘনাদ বর দিনু তোরে।
যজ্ঞ করি যথাতথা যাহ যুঝিবারে ॥
পরাজয় না হইবে আমি দিনু বর।
অন্তরীক্ষে যুঝিবে রিপুর অগোচর ॥
যজ্ঞে আসি বর দিনু তব বিদ্যমানে।
এতেক বলিয়া অগ্নি গেল নিজ স্থানে ॥
চমৎকার লাগিল দেখিয়া রাবণে।
রাজা বলে, মেঘনাদ, চল মোর সনে ॥
ত্রিভুবন জিনিলাম আমি একেশ্বর।
তোমারে লইয়ে আজি জিনি পুরন্দর ॥
ত্রিভুবন উপরেতে ইন্দ্র হয় রাজা।
ইন্দ্রেরে জিনিলে সবে করে মোর পূজা ॥
সাক্ষাতে দেখিব তোর যজ্ঞের পরীক্ষে।
ইন্দ্রসনে কেমনেতে যুঝ অন্তরীক্ষে ॥
আপন কটক লয়ে চলহ সত্বর।
শীঘ্রগতি উঠ গিয়া রথের উপর ॥
চৌদ্দবর্ষ অনাহারে ছিল মেঘনাদ।
মধুপান করিয়া ঘুচিল অবসাদ ॥
অন্তঃপুরে নাহি যায় সে চৌদ্দ বছর।
প্রকাশ না করে লাজে রাজার গোচর ॥
নারী সম্ভাষণে পুত্র নাহি গেল লাজে।
যজ্ঞস্থল হৈতে বীর যুঝিবারে সাজে ॥

শতকোটি হস্তী নড়ে লক্ষকোটি ঘোড়া।
তের অক্ষৌহিণী সাজে জাঠি ও ঝকড়া ।।
সারথি জানিল আজি সংগ্রামে গমন।
সংগ্রামের রথখান করিল সাজন ।।
সাজায়ে আনিল রথ অতি মনোহর।
সংগ্রামের অস্ত্র তুলে রথের উপর ।।
বীরদাপে মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে।
হস্তী ঘোড়া সৈন্য ঠাট নড়ে মুড়েমুড়ে ।।
নিজ ঠাটে মেঘনাদ করিছে সাজনি।
মেঘনাদের বাদ্যভাণ্ড তিন অক্ষৌহিণী ।।
রাজার ছত্রিশকোটি মুখ্য সেনাপতি।
সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলে শীঘ্রগতি ।।
মহোদর মহাপাশ খর ও দূষণ।
তালভঙ্গ সিংহরব ঘোর দরশন ।।
মহাবাহু শঙ্কবাহু যজ্ঞধূম আর।
বাঁকামুখ মেঘমালী বিক্রমে অপার ।।
শুক সারণ শার্দ্দূল চলে বিদ্যুন্মালী।
শোণিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ বলে মহাবলী ।।
চলে শঠ নিশঠ সে বিক্রমে কেশরী।
রাবণের সৈন্য যত কহিতে না পারি ।।
রথে গজে অশ্বেতে কুমার ভাগে নড়ে।
শিক্ষামত যে যাহার বাহনেতে চড়ে ।।
অক্ষয়কুমার আদি চলে দেবান্তক।
ত্রিশিরা অতিকায় ও চলে নরান্তক ।।
নানা-অস্ত্রে সাজি চলে কুমার ত্রিশিরা।
রথের সাজনি কত মাণিক্যাদি হীরা ।।
কুম্ভকর্ণ পুত্র কুম্ভ নিকুম্ভ দুজন।
যাহাদের ভয়েতে কম্পিত ত্রিভুবন ।।
কনকরচিত রথ প্রভাকরজ্যোতি।
চড়ে তাহে প্রধান যতেক সেনাপতি ।।
সাজিয়া চলিল তিনকোটি তেজী ঘোড়া।
শত অক্ষৌহিণী ঠাট জাঠি ও ঝকড়া ।।

মুদ্গর মুষল টাঙ্গি খাঁড়া খরশান।
বাছিয়া বাছিয়া তোলে খরতর বাণ ।।
মকরাক্ষ চলিল দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
তার সম বীর নাই লঙ্কার ভিতর ।।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভঙ্গ হৈল সেই দিনে।
ইন্দ্র জিনিবারে চলে রাবণের সনে ।।
একদিন জাগে ছয় মাসের অন্তর।
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে উঠে ক্ষুধায় কাতর ।।
ছয় মাস ক্ষুধাতে না খায় অন্নজল।
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে বীর ক্ষুধায় বিকল ।।
সাত শত খাইলেক মদের কলসী।
পর্ব্বত প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি ।।
অর্দ্ধেক লঙ্কার ভোগ করিল ভক্ষণ।
সাজিল যে কুম্ভকর্ণ করিবারে রণ ।।
ভূমিকম্প হয় যেন দেখি ভয় করে।
টলমল করে লঙ্কা কটকের ভরে ।।
রাবণের রথ লয়ে যোগায় সারথি।
রাজহংস বহে রথ পবনের গতি ।।
হস্তী ঘোড়া নড়ে ঠাট-কটক অপার।
সপ্ত দ্বীপা পৃথিবীতে লাগে চমৎকার ।।
ইন্দ্র জিনিবারে করে এতেক সাজন।
নিজ ঠাট রাবণের শত-অক্ষৌহিণী ।।
ইন্দ্র জিনিবারে সবে করিল গমন।
চারিদিকে নানা শব্দে বাজিছে বাজন ।।
শত লক্ষ কাঁসি তিন লক্ষ করতাল।
সহস্রেক ঘন্টা বাজে শুনিতে রসাল ।।
ভেরী ও ঝাঁঝরী বাজে তিন কোটি কাড়া
আগে চলে লক্ষ লক্ষ দামামা দগড়া ।।
খঞ্জনী খমক বাজে লক্ষ লক্ষ বীণা।
অসংখ্য রাক্ষসী ঢাক না হয় গণনা ।।
ঢেমচা খেমচা বাজে ঝম্প কোটি কোটি।
সাত লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাঠি ।।

একশত লক্ষ বীণা তিনকোটি শঙ্খ।
দোহারী মোহারী শাণী গণিতে অসংখ্য॥
মৃদঙ্গ সেতারা ঢোল তিনলক্ষ কাঁসী।
খঞ্জনীতে মিলাইতে দুইলক্ষ বাঁশী॥
গভীর শব্দেতে বাজে অসংখ্য মাদল।
প্রলয় কালেতে যেন হয় গণ্ডগোল॥
রাবণের সাজনে দেখে চমৎকার।
মহাশব্দে রথেতে সাগর হৈল পার॥

মধু দৈত্যের সহিত রাবণের মিলন

মনেতে ভাবিয়া তবে বলে লঙ্কেশ্বর।
আগে মধুদৈত্য জিনি পিছে পুরন্দর॥
সাগর হইয়া পার সৈন্য চলে ত্বরা।
চক্ষুর নিমিষে গেল নগর মথুরা॥
ঘেরিল মথুরাপুরী রাক্ষস সকল।
সুখে নিদ্রা যায় মধু দৈত্য মহাবল॥
নিদ্রায় কাতর দৈত্য খাটের উপরি।
কুম্ভনসী বাহির হইল একেশ্বরী॥
রাবণ বলে কহ ভগ্নি দৈত্য গেল কোথা।
আজি দেখা পাইলে কাটিব তার মাথা॥
আমি যদি থাকিতাম লঙ্কার ভিতর॥
সেই দিন পাঠাইতাম তারে যমঘর॥
রাবণের কথা শুনি কুম্ভনসী ভাষে।
পলাইয়া গেল দৈত্য তোমার তরাসে॥
তোমার বাণেতে ভাই কারো নাহি রক্ষা।
রাঁড়ী কৈলে সহোদরা ভগ্নী সুর্পনখা॥
তার স্বামী মারিলে হইয়া মহারাজ।
মোরে রাণ্ডী করি ভাই সাধিবে কি কাজ॥
ধর্ম্মপথে রহিয়াছে পতি সে আমার।
সম্মুখে দাণ্ডায়ে এই ভগিনী তোমার॥
হইলে তোমার কোপ কম্পে দেবগণ।
অনন্ত বাসুকি ভাগে দৈত্য কোন্ জন॥
কোপ ছাড় মোর তরে স্বামী দেহ দান।
লবণ নামেতে পুত্র দেখ বিদ্যমান॥
কুড়ি পাটি দন্ত মেলি দশানন হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্র মাসে॥
দশানন বলে আমি না মারিব প্রাণে।
ইন্দ্রে জিনিতে যাব আসুক মোর সনে॥
কুম্ভনসী চলিল রাবণ-আজ্ঞা পেয়ে।
শুয়ে ছিল মধুদৈত্য তথা গেল ধেয়ে॥
কুম্ভনসী ধেয়ে যায় আলুলিত চুল।
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে মধু দৈত্য মহাবল॥
ঘূর্ণিত লোচনে দৈত্য শয্যাপরি বৈসে।
কুম্ভনসী ত্রাস দেখি তাহারে জিজ্ঞাসে॥
আচম্বিতে মথুরায় কেন গণ্ডগোল।
গড়ের বাহিরে কেন কটকের রোল॥
কুম্ভনসী বলে তুমি না জান কারণ।
তোমারে বধিতে আইল লঙ্কার রাবণ॥
লঙ্কা হৈতে তুমি বলে আনিলে আমারে।
সেই কোপে তোমারে সে এল কাটিবারে॥
দৈত্য বলে শীঘ্র আন শঙ্করের শুল।
সবংশে রাবণে আজি করিব নির্ম্মূল॥
শুনিয়া দৈত্যের কথা কুম্ভনসী কয়।
রাবণের সনে বাদে মরণ নিশ্চয়॥
থাকুক তোমার কার্য্য না পারে বিধাতা।
রাবণের সঙ্গে বাদে অন্যের কি কথা॥
রাবণের দোষ নাই তুমি সর্ব্বদোষী।
আমারে আনিলে হরে ত্রিপ্রহর নিশি॥
অবিচার কর্ম্ম হেন করিলে আপনে।
আপদি করহ কোপ কিসের কারণে॥
রাবণের কাছে আমি গিয়াছিনু আগে।
তুষ্ট করি আসিয়াছি মিষ্ট অনুযোগে॥
তুষ্ট হয়ে কহিল আমার বিদ্যমানে।
সম্ভাষ করুক দৈত্য এসে মোর সনে॥

প্রধান কুটুম্ব তব হয় মম ভ্রাতা।
আদরে বাটীতে আন কয়ে মিষ্টকথা ॥
পূর্ব্বকোপে যদি কিছু কহে মোর ভাই।
সহ্য সমাবেশ কর তাহে ক্ষতি নাই ॥
কুম্ভনসীকথা শুনি মধুদৈত্য হাসে।
যোড়হাত করি গেল রাবণের পাশে ॥
রাবণ বলে করেছিলে বড়ই প্রমাদ।
আমার ভগিনী আন এত বড় সাধ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আমারে করে ডর।
যম নাহি যায় ভয়ে লঙ্কার ভিতর ॥
কত বল ধর তুমি কত আছে সেনা।
কোন্ সাহসেতে দেহ লঙ্কাপুরে হানা ॥
তোরে বান্ধি লইতাম সাগরের পার।
ভস্মরাশি করিতাম মথুরা নগর ॥
বিস্তর কাঁদিল আসি ভগ্নী পায়ে ধরে।
ভগ্নীরে কাতর দেখি ক্ষমিলাম তোরে ॥
মধুদৈত্য রাবণের বন্দিল চরণ।
যোড়হাত করি বলে শুনহ রাবণ ॥
তোমার সংগ্রামে হরি হরে করে ভয়।
আমারে করহ কোপ উপযুক্ত নয় ॥
হীনবীর্য্য দৈত্য আমি তুমি মহাবল।
অপরাধ ক্ষমা কর আমার সকল ॥
পরম পণ্ডিত তুমি লঙ্কার ঈশ্বর।
আমার মথুরা তব ভোগের ভিতর ॥
মার্জ্জনা করহ দোষ অবোধ জনার।
আসি পদধূলি দেহ আশ্রমে আমার ॥
হাসি হাসি রথ হৈতে নামিয়া রাবণ।
মধুদৈত্য আলয়েতে করিল গমন ॥
আগে আগে মধুদৈত্য পশ্চাতে রাবণ।
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল দুইজন ॥
সিংহাসনে বসাইল রাজা দশাননে।
যথাযোগ্য স্থানে বসায় অন্য যত জনে ॥
দৈত্যের আদরে তুষ্ট লঙ্কার ঈশ্বর।
দশানন বলে তব চরিত্র সুন্দর ॥
মধুদৈত্য বলে আজি থাক এইখানে।
কালি গিয়া যুদ্ধ কর পুরন্দর সনে ॥
রাবণ বলে কালি কুম্ভকর্ণের শয়ন।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে যুঝে কোন্ জন ॥
নানা ভোগে রাবণেরে ভুঞ্জায় দানব।
তথা হৈতে চলে রাবণ পাইয়া গৌরব ॥
রাবণ বলিছে, দৈত্য, শুন মোর বাণী।
আরম্ভ করিব যুদ্ধ থাকিতে রজনী ॥
কত অস্ত্র আছে তব জাঠি ও ঝকড়া।
কত সেনা আছে তব হাতী আর ঘোড়া।
আপন কটক লয়ে চলহ সত্বর।
লুটিব অমরাবতী রাত্রের ভিতর ॥
রাত্রের ভিতরে স্বর্গে করিব সংগ্রাম।
আসিবার কালে হেথা করিব বিশ্রাম ॥
মধুদৈত্যের হাতীঘোড়া কটক বিস্তর।
সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলিল সত্বর ॥

রাবণ কর্তৃক অমরাবতী আক্রমণ

অন্তরীক্ষে ঠাট যত চলে মুড়ে মুড়ে।
রাত্রি দুইপ্রহরে অমরাবতী বেড়ে ॥
বিষম অমরাবতী না পারে লঙ্ঘিতে।
রহিল অসংখ্য ঠাট বেড়ি চারিভিতে ॥
ত্রিভুবন জিনি স্থান অমর নগরী।
প্রবাল মাণিক্য মণি শোভে সারি সারি ॥
সুবর্ণনির্ম্মিত পুরী বিচিত্র গঠন।
উভেতে প্রাচীর তিন শতেক যোজন ॥
শতেক যোজন পুরী আড়ে পরিসর।
দীঘে ওর নাহি তার বায়ু-অগোচর ॥
একৈক যোজন এক দুয়ার গঠন।
বহু অক্ষৌহিণী ঠাট দ্বারের রক্ষণ ॥

সোণার কপাট খিল পর্ব্বতের চূড়া ।
সোণার হুড়কা তায় নবরত্ন বেড়া ।।
শত অক্ষৌহিণী ঠাট ইন্দ্রের গণনা ।
চারি অংশ করি সেনা চারি দ্বারে থানা ।।
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা থাকে দুইদ্বারে ।
কাহার নাহিক শক্তি পথ লঙ্ঘিবারে ।।
শতবৃন্দ ভিতরেতে আছে অন্তঃপুরী ।
শচী দেবকন্যা তথা পরমাসুন্দরী ।।
পরমা সুন্দরী শচী তিনি মুখ্য রাণী ।
ত্রিভুবন জিনি রূপ দেবতামোহিনী ।।
পদ্মকোটি ঘর আছে পুরীর ভিতর ।
নানারত্ন পরিপূর্ণ পরম সুন্দর ।।
রত্নেতে নির্ম্মিত ঘর দুয়ার চৌতারা ।
দেবকন্যাগণ তাহে রূপে মনোহরা ।।
স্থানে স্থানে শোভিত বিচিত্র নাট্যশালা ।
দেবগণ লয়ে ইন্দ্র করে তাতে খেলা ।।
নাহি শোক দুঃখ নাহি অকাল মরণ ।
ত্রিভুবন জিনি স্থান ভুবনমোহন ।।
সদানন্দময় সে অমরাবতী নাম ।
যত দেব আসি তথা করয়ে বিশ্রাম ।।
নানারঙ্গে নৃত্য করে বহু পক্ষিগণ ।
কুসুম সুগন্ধে সবে আনন্দে মগন ।।
প্রমাদ পড়িল তাহা ইন্দ্র নাহি জানে ।
অমরনগরী গিয়া বেড়িল রাবণে ।।
রাবণ বেড়িল স্বর্গ শুনি পুরন্দর ।
দেবগণে লয়ে গেল বিষ্ণুর গোচর ।।
বিষ্ণুর নিকটে ইন্দ্র করেন স্তবন ।
রাবণে মারিয়া রক্ষা কর দেবগণ ।।
দেখিয়া ইন্দ্রের ত্রাস হাসে নারায়ণ ।
দেবগণে আশ্বাসিয়া বলেন বচন ।।
নারায়ণ বলেন শুনহ পুরন্দর ।
এ শরীরে আমি না মারিব লঙ্কেশ্বর ।।
তোমারে কহি যে ইন্দ্র শুনহ কারণ ।
আমা বিনা কারো হাতে না মরে রাবণ ।।
ব্রহ্মা দিয়াছেন বর তপে হয়ে তুষ্ট ।
বিনা নর বানরেতে না মরিবে দুষ্ট ।।
পৃথিবীমণ্ডলে আমি হব অবতার ।
সবংশেতে রাবণেরে করিব সংহার ।।
দেবতার হাতে কভু না মরে রাবণ ।
যুদ্ধ করি খেদাড়িয়া দেহ দেবগণ ।।

রাবণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ও পরাজয়

বিষ্ণুর আজ্ঞায় ইন্দ্র যায় শীঘ্রগতি ।
যুঝিবারে সাজিলেন অমরের পতি ।।
ত্রিভুবন উপরেতে ইন্দ্র অধিকার ।
দশ দিকপাল আসি হৈল আগুসার ।।
দক্ষিণে কুবের আর কৈলাস উত্তরে ।
যক্ষরক্ষ লয়ে এল যুঝিবার তরে ।।
একবার রাবণের যুদ্ধে পেল লাজ ।
আরবার আইল কুবের যক্ষরাজ ।।
যম মৃত্যু সংগ্রামে আইল দুইজন ।
একবার যুদ্ধে দোঁহে জিনিল রাবণ ।।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল রাবণের যুদ্ধে ।
আর বার আইল ইন্দ্রের অনুরোধে ।।
পাতালেতে বাসুকিরে জিনিল রাবণ ।
সেই কোপে যুঝিতে আইল নাগগণ ।।
আইল তিরাশীকোটি চিত্রিণী শঙ্খিনী ।
যাহাদের বিষজালে দহয়ে মেদিনী ।।
একবার বরুণেরে জিনিছে রাবণ ।
যুঝিতে বরুণ কোপে এল সে কারণ ।।
মরুজ অসুর আর এল বিদ্যাধর ।
ভূতপ্রেতপিশাচাদি আইল বিস্তর ।।
চন্দ্রসূর্য্য আইল নক্ষত্র আরবার ।
রাবণের রণেতে হইল আগুসার ।।

শনি রাহু কেতু আদি যত গ্রহগণ।
রাত্রিদিবা ঝড়বৃষ্টি আইল তখন ।।
সমর দেখিতে আইলেন মহেশ্বরী।
চৌষট্টি যোগিনী তার সঙ্গে সহচরী ।।
দেবীর অসীম মূর্ত্তি ষোড়শী বগলা।
ইন্দ্রানী রুদ্রাণী দেবী ব্রহ্মাণী কমলা ।।
নীলসিংহী বারাহী ধরেন নানাকলা।
কাত্যায়নী চামুণ্ডা গলেতে মুণ্ডমালা ।।
রণে আইলেন দেবী বেশ ভয়ংকর।
আছুক অন্যের কাজ দেবে লাগে ডর ।।
রক্তবীজ আদি যিনি মারিলা কটাক্ষে।
রাবণের তরে রহিলেন অন্তরীক্ষে ।।
স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল।
চারিদিকে পড়ে অস্ত্র অগ্নির উথাল ।।
নানা অস্ত্র পড়ে নাহি যায় সংখ্যা করা
অমরাবতীতে যেন বরিষয়ে ধারা ।।
নানা অস্ত্র রাক্ষস করিছে অবতার।
সুরপুরী বাণেতে হইল অন্ধকার ।।
জাঠা জাঠী শেল শূল মুষল মুদ্গর।
খাণ্ডা খরশান বাণ অতি ভয়ঙ্কর ।।
পড়ে গদা সাবল নাহিক লেখাজোখা।
চারিদিকে ফেলে বাণ যার যত শিক্ষা ।।
রথে রথে ঠেকাঠেকি ভাঙ্গি পড়ে কত।
হস্তীঘোড়াচাপনেতে হস্তীঘোড়া হত ।।
যুঝে দেব দানব গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
লেখাজোখা নাহি বাণ পড়িছে বিস্তর ।।
দেবতা রাক্ষসে অস্ত্র করে অবতার।
সকল অমরাবতী বাণে অন্ধকার ।।
দুই সৈন্য যুদ্ধে পড়ে রক্তে হয়ে রাঙ্গা।
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্রমাসে গঙ্গা ।।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত রক্তোপরি ভাসে।
হরিষে পিশাচ গুলা মনে মনে হাসে ।।
বিম্বকে বিম্বকে রক্তে বান্ধি উঠে ফেনা।
শকুনি গৃধিনী তাহে করিছে পারণা ।।
ইন্দ্র বলে রাবণ কি করহ যুদ্ধছল।
জনে জনে যুঝ দেখি কার কত বল ।।
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা হাসিল রাবণ।
মোর সনে যুঝেছে সকল দেবগণ ।।
বরুণ কুবের যম জিনেছি মান্ধাতা।
যুঝিবে আমার সনে কে আছে দেবতা ।।
হেনকালে শনি গেল রাবণের পাশে।
দশমাথা খসে পড়ে দেবগণ হাসে ।।
রাবণ বিকৃত হৈল সংগ্রাম ভিতরে।
দেখি যত দেবগণ উপহাস করে ।।
দশমাথা খসে পড়ে বল নাহি টুটে।
ব্রহ্মার বরেতে তার দশমাথা উঠে ।।
বারেক ভিন্ন শনির আর নাহি রণ।
উড়িল শনির প্রাণ দেখিয়া রাবণ ।।
ব্রহ্মার বরেতে মাথা খসিলে না মরে।
পলাইয়া গেল শনি রাবণের ডরে ।।
শনি পলাইল দেখি রাক্ষসেরা হাসে।
হেনকালে যম গেল রাবণের পাশে।
যমেরে দেখিয়া পরে দশানন হাসে।
মরিবারে কেন, যম, এলি মোর পাশে ।।
যম বলে, বেটা, না করিস অহঙ্কার।
আমি তোরে করিতাম সেদিন সংহার ।।
ভাগ্যেতে বাঁচিলি প্রাণে ব্রহ্মার কারণ।
ব্রহ্মা আজি নাহি হেথা জীবি কতক্ষণ ।।
আছয়ে চৌষট্টি রোগ যমের সংহতি।
প্রবেশিল রাবণের অঙ্গে শীঘ্রগতি ।।
কত কত মায়া জানে রাজা দশানন।
ব্রহ্ম অগ্নি শরীরেতে জ্বালিল তখন ।।
পুড়ে মরে রোগ সব ডাকে পরিত্রাহি।
সহিতে না পারি সবে গেল যমঠাঞি ।।

রোগপীড়া পলাইল রক্ষোরাজ হাসে।
মোর কাছে যম তুমি দর্প কর কিসে ।।
যম বলে, বেটা কি করিস অহঙ্কার।
আমার হাতেতে তোর সবংশে সংহার ।।
রোগ পীড়া পলাইল পেলি মনে আশ।
আমার দণ্ডেতে তোর সবংশে বিনাশ ।।
করিলি বিস্তর তপ হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর ।।
অবশ্য মরণ হবে যাবি মোর ঘর।
চক্ষু পাকাইয়া গর্জ্জে যমের কিঙ্কর ।।
যমরাজ রাবণে দুজনে গালাগালি।
দূর হৈতে শুনে কুম্ভকর্ণ মহাবলী ।।
ধাইয়া যায় কুম্ভকর্ণ যমে গিলিবারে।
কুম্ভকর্ণে দেখি যম পলাইল ডরে ।।
পলাইয়া রহে যম ইন্দ্রের গোচর।
দেখিয়া যমের ভঙ্গ কহে পুরন্দর ।।
সর্ব্বজনে মরে যম তোমা দরশনে।
যম তুমি ভঙ্গ দিলে যুঝে কোন্ জনে।।
হেনকালে বহাইল বায়ু মহাঝড়।
উড়ায়ে রাক্ষসগণে কৈল একজড় ।।
রাবণের যত ঠাট ঝড়ে উড়াইল।
ভয়েতে রাবণরাজা চিন্তিত হইল ।।
কুম্ভকর্ণবীরে ঝড়ে উড়াইতে নারে।
কুম্ভকর্ণ চলিল পবনে গিলিবারে ।।
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া পবন দিল রড়।
পলাইল পবন ঘুচিল সব ঝড় ।।
পবন পালায়ে গেল মনে পাইয়া ডর।
বরুণ প্রবেশ করে রণের ভিতর ।।
বরুণের মায়াতে সকল জলময়।
জল দেখি রাবণের বড় লাগে ভয় ।।
কুম্ভকর্ণের নাহি ভয় দুর্জ্জয় শরীর।
আর যত সেনা সব হইল অস্থির ।।

বরুণের মায়া চূর্ণ করিতে রাবণ।
অগ্নিবাণ ধনুকেতে যুড়িল তখন ।।
অগ্নিবাণ রাবণের অগ্নি-অবতার।
অগ্নিবাণে সব জল করিল সংহার ।।
বরুণের মায়া যদি ভাঙ্গিল রাবণ।
রণেতে প্রবেশ করে যত গ্রহগণ ।।
একাদশ রুদ্র এল দ্বাদশ ভাস্কর।
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল হইল দীপ্তিকর ।।
একেবারে হইল দ্বাদশ সূর্য্যোদয়।
ভয়েতে রাক্ষসগণ গণিল সংশয় ।।
ধনুকেতে রাজা যোড়ে বাণ ব্রহ্মজাল ।।
বাণ হতে বরিষয়ে অগ্নির উথাল ।।
রাবণের বাণেতে সে দেবগণ কাঁপে।
সূর্য্যতেজ নিভাইল রাবণ প্রতাপে ।।
যতেক দেবতাগণে জিনিল রাবণ।
মেঘনাদ জয়ন্ত দুজনে বাজে রণ ।।
দুই রাজপুত্র যুঝে দুজনে প্রধান।
কেহ কারে নাহি জিনে দুজনে সমান ।।
মেঘনাদ বাণেতে জয়ন্ত পায় ডর।
পলায়ে জয়ন্ত গেল পাতাল ভিতর ।।
পুলোমা দানব তার মাতামহ হয়।
পাতালে লুকায়ে রহে তাহার আলয় ।।
ইন্দ্র স্থানে বার্ত্তা কহে যত দেবগণ।
আচম্বিতে জয়ন্তে না দেখি কি কারণ ।।
মেঘনাদের বাণ বুঝি না পারি সহিতে।
আছে কিনা আছে বেঁচে না পারি বলিতে ।।
অন্তঃপুরে নারীগণ যুড়িল ক্রন্দন।
যম গিয়া ইন্দ্রে কহে প্রবোধ বচন ।।
পরলোকে গেলে মোর সঙ্গে হতো দেখা।
মরে নাই জয়ন্ত সে পাইয়াছে রক্ষা ।।
পুলোমা দানব তার পাতালে নিবাস।
লুকাইয়া জয়ন্ত রয়েছে তার পাশ ।।

যমের প্রবোধে ইন্দ্র সম্বরে ক্রন্দন ।
তবে ইন্দ্র রাজা গেল চণ্ডীর সদন ।।
তোমা বিদ্যমানে দেবগণের সংহার ।
রাবণে মারিয়া মাতা, কর প্রতিকার ।।
চৌষট্টি যোগিনী ছিল দেবীর সংহতি ।
যুঝিতে যোগিনীগণ চলে শীঘ্রগতি ।।
যুঝিতে যোগিনীগণ চলে নেচে নেচে ।
রক্তমাংস খাইয়া যোগিনী সব নাচে ।।
দেখিলে যোগিনী সব মহাভয় করে ।
একৈক যোগিনী শত রাক্ষসে সংহারে ।।
রাবণ যোগিনী যুদ্ধ দেখি ভয়ঙ্কর ।
জোড়হাতে স্তুতি করে দেবীর গোচর ।।
দশানন বলে, মাতা, কর অবধান ।
যুদ্ধ সম্বরিয়া তুমি যাহ নিজ স্থান ।।
মোর সনে, মাতা, তব কিসে বিসম্বাদ ।
তোমার চরণে নাহি করি অপরাধ ।।
শঙ্কর সেবক আমি তুমি মা শঙ্করী ।
একারণ তব সনে যুদ্ধ নাহি করি ।।
আমারে জিনিয়া তব হইবে কি কাজ ।
তুমি যদি হার, মাতা, পাবে বড়লাজ ।।
রাবণের বচনে চণ্ডীর হৈল হাস ।
চৌষট্টি যোগিণী লয়ে চলিলা কৈলাস ।।
একে একে দেবগণে জিনিল রাবণ ।
ইন্দ্র আর রাবণ দুজনে বাজে রণ ।।
ঐরাবতে চড়ে ইন্দ্র বজ্র-অস্ত্র হাতে ।
সাজিয়া রাবণরাজা এল দিব্যরথে ।।
ইন্দ্রের সে বজ্র-অস্ত্র করিছে গর্জ্জন ।
বজ্রের গর্জ্জন শুনি চিন্তিত রাবণ ।।
হেনকালে কুম্ভকর্ণ আইল ধাইয়ে ।
ইন্দ্রের সম্মুখে আসি রহিল দাণ্ডায়ে ।।
কুম্ভকর্ণ বলে, ইন্দ্র, আর যাবি কোথা ।
স্বর্গপুরী নিবসতি করিব দেবতা ।।
বজ্র বিনা, ইন্দ্র, তোর আর নাহি বাড়া ।
দন্তে চিবাইয়া বজ্র করে যাব গুঁড়া ।।
ইন্দ্র বলে, কুম্ভকর্ণ, ছাড় অহংকার ।
বজ্র অস্ত্রে আমি তোরে করিব সংহার ।।
মহামন্ত্র পড়ি ইন্দ্র বজ্র তবে ফেলে ।
লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণ বজ্র-অস্ত্র গিলে ।।
বজ্র-অস্ত্র গিলি বীর ছাড়ে সিংহনাদ ।
দেখি যত দেবগণ গণিল প্রমাদ ।।
চলিল সে কুম্ভকর্ণ দেবতা গিলিতে ।
ভয়েতে দেবতাগণ ছুটে চারিভিতে ।।
সৃষ্টিনাশ হেতু তারে সৃজিলা বিধাতা ।
চারিভিতে লাফ দিয়া গিলিছে দেবতা ।।
অমর দেবতাগণ নাহিক মরণ ।
নাসিকাকর্ণের পথে পলায় তখন ।।
শ্রবণ নাসিকা পথ ঘরের দুয়ার ।
তাহা দিয়া দেবগণ বেরয় অপার ।।
স্বর্গ হতে দেবগণে আছাড়িয়া ফেলে ।
হাত পা ভাঙ্গিয়া যায় পড়ি ভূমিতলে ।।
কুম্ভকর্ণের রণে কারো নাহি অব্যাহতি ।
হইল সমর স্বর্গে সমুদয় রাতি ।।
মাত্র এক দিনরাত্রি কুম্ভকর্ণ জাগে ।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে সুখী দেবভাগে ।
ছয়মাসে কুম্ভকর্ণ জাগে একদিন ।
রজনীপ্রভাতে হয় চেতনাবিহীন ।।
রাত্রি পোহাইল বীর নিদ্রায় বিভোল ।
এতক্ষণে রক্ষা পেল দেবতা সকল ।।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে রাবণ চিন্তিত ।
রথে তুলি লঙ্কাপুরে পাঠায় ত্বরিত ।।
ইন্দ্রসহ রাবণের বাজে মহারণ ।
দুইজনে নানাবাণ করে বরিষণ ।।
দুইজনে বাণ মারে নাহি লেখাজোখা ।
চারিদিকে বাণ ফেলে যত যার শেখা ।।

দুইজন সম কেহ না পারে জিনিতে।
প্রস্বাপনবাণ ইন্দ্রের পড়িল মনেতে ॥
ইন্দ্র বলে কৌতুক দেখহ দেবগণ।
প্রস্বাপনবাণে বন্দী করিব রাবণ ॥
ব্রহ্মমন্ত্র পড়ি ইন্দ্র প্রস্বাপন এড়ে।
ব্রহ্ম-অস্ত্র রাবণের গায়ে গিয়া পড়ে ॥
ছুঁলে মাত্র নিদ্রা যায় হেন প্রস্বাপন।
রথোপরি রাবণ নিদ্রায় অচেতন ॥
অচেতন হয়ে পড়ে রথের উপরে।
সকল দেবতা আসি বেড়ে রাবণেরে ॥
লোহার শিকলে বান্ধে হাতে ও গলায়।
রাবণে বান্ধিল লয়ে ঐরাবত পায় ॥
অবনীতে রাবণের লোটে দশমাথা।
রাবণের দশা দেখে হাসেন দেবতা ॥
হিঁচড়িয়া লয়ে যায় বুকে ছড় যায়।
ঐরাবতদন্ত ঠেকে রাবণের গায় ॥
খান খান হয় অঙ্গ দন্ত দিয়া চিরে।
পরিত্রাহি ডাকে রাবণ বিষম প্রহারে ॥
হরষিত দেবগণ জিনিয়া রাবণ।
শিরে হাত কান্দে যত নিশাচরগণ ॥
রাবণ হইল বন্দী দেখে মেঘনাদ।
রথে চড়ি অন্তরীক্ষে করে সিংহনাদ ॥
মেঘনাদ গর্জ্জে যেন মেঘের গর্জ্জন।
ঘরে না যাইস ইন্দ্র ফিরে দেহ রণ ॥
রাবণকুমার আমি নাম মেঘনাদ।
আজিকার যুদ্ধে তোর পড়িল প্রমাদ ॥
পিতারে করিলি বন্দী আমা-বিদ্যমানে।
বিনাশিব স্বর্গপুরী আজিকার রণে ॥
গর্জ্জিতেছে মেঘনাদ থাকিয়া আকাশে।
মেঘনাদগর্জ্জনেতে ইন্দ্ররাজ হাসে ॥
তোর ঠাঁই শুনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী।
পিতা হৈতে পুত্র বড় কোথাও না শুনি ॥
এত যদি দুজনে হইল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী ॥
অন্তরীক্ষে মেঘনাদ মেঘে হয় লুকি।
মেঘের আড়েতে থাকি যুঝে সেধানুকী ॥
নানা-অস্ত্র মেঘনাদ ফেলে চারিভিতে।
ফাঁফর হইল ইন্দ্র না পারে সহিতে ॥
অন্তরীক্ষে থাকি বাণ ফেলে ঝাঁকে ঝাঁকে।
কোথা হৈতে পড়ে বাণ কেহ নাহি দেখে ॥
খাণ্ডা খরশান শেল শূল একধারা।
চারিভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা ॥
নানা-অস্ত্র মেঘনাদ করে বরিষণ।
জর্জ্জর হইল বাণে যত দেবগণ ॥
ইন্দ্রে ছাড়ি দেবগণ পলায় তখন।
একেশ্বর থাকি ইন্দ্র করে মহারণ ॥
সন্ধান পূরিয়া ইন্দ্র উর্দ্ধদৃষ্টে চায়।
কোথা হতে আসে বাণ দেখিতে না পায় ॥
সহস্রচক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে।
দেখিতে না পায় আর না পারে সহিতে ॥
মেঘনাদ যুড়িল বন্ধন নাগপাশ।
তাহা দেখি দেবগণে লাগিল তরাস ॥
মেঘনাদ বড় বড় বাণে পেলো শিক্ষা।
যজ্ঞেতে পাইল বাণ কারো নাহি রক্ষা ॥
একবাণে ভুজঙ্গম অনেক জন্মিল।
হাতে গলে দেবরাজে বান্ধিয়া পাড়িল ॥
বিষের জ্বালাতে ইন্দ্র হইল মূর্চ্ছিত।
ইন্দ্রে ছাড়ি দেবগণ পলায় ত্বরিত ॥
স্বর্গ ছাড়ি পলায় যতেক দেবগণ।
রাক্ষসেতে রাবণের ছাড়ায় বন্ধন ॥
ইন্দ্রেবান্ধে মেঘনাদ পিতা বিদ্যমান।
মেঘনাদে দশানন করয়ে বাখান ॥
আমারে বান্ধিয়াছিল ইন্দ্র দেবরাজ।
হেন ইন্দ্রে বাঁধিয়া করিলে পুত্রকাজ ॥

ইন্দ্রকে বান্ধিয়া, পুত্র, লহ লঙ্কাপুরী।
তবে আমি লুটিব এ অমর নগরী ॥
মেঘনাদ বলে, পিতা, আজ্ঞা কর তুমি।
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া আগে লয়ে যাই আমি ॥
শুনি মেঘনাদ বাক্য কহে দশানন।
আজ্ঞা দিনু কর তাহা যাহে তব মন ॥
আজ্ঞা পেয়ে মেঘনাদ ইন্দ্রকে ধরিল।
রথের নিকটে লয়ে কহিতে লাগিল ॥
পিতারে বান্ধিয়াছিলি ঐরাবত পায়।
বান্ধিব তোমারে ইন্দ্র রথের চাকায় ॥
ইন্দ্রে বান্ধি পাঠাইল লঙ্কার ভিতর।
অমর নগরী লুটে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
একে দশানন তাহে অমর নগরী।
বাছিয়া বাছিয়া লুটে স্বর্গবিদ্যাধরী ॥
নানা রত্ন মাণিক্য ভাণ্ডার হৈতে নিল।
স্বর্গবিদ্যাধরী তথা অনেক পাইল ॥
শচীরে চাহিয়া বেড়ায় রাজা দশানন।
শচী লয়ে দেবগণ হৈল অদর্শন ॥
শচী-জন্য রাবণের ছিল বড় আশ।
শচী না পাইয়া রাজা হইল নিরাশ ॥
ইন্দ্রের নন্দন বন দেখে মনোহর।
প্রবেশে নন্দনবনে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
উপাড়িল পারিজাত বৃক্ষ ডালেমূলে।
লুটিয়া অমরপুরী চলে কুতূহলে ॥
লঙ্কার ভিতরে গিয়া করিল দেয়ান।
কটক ছত্রিশকোটি সম্মুখে প্রধান ॥
মেঘনাদ গেল তবে বাপের গোচর।
জিজ্ঞাসে রাবণ কোথা আছে পুরন্দর ॥
ইন্দ্ররাজ করিয়াছে আমার অবস্থা।
হেন ইন্দ্রে বান্ধি,পুত্র,রাখিয়াছ কোথা ॥
মেঘনাদ বলে তবে বাপের গোচর।
বান্ধিয়া রেখেছি ইন্দ্রে লঙ্কার ভিতর ॥
লোহার শৃঙ্খলে তারে বান্ধি হাতে গলে।
বুকে ভার চাপায়ে রেখেছি যজ্ঞস্থলে ॥
এত যদি কহে মেঘনাদ বীরবর।
রাজপ্রসাদ পায় বহু বাপের গোচর ॥
বহু ধন পায় লুটি অমর নগরী।
দিগ্বিজয়দ্রব্য রাজা আনে লঙ্কাপুরী ॥
কৌতুকেতে লঙ্কাপুরে আছে লঙ্কেশ্বর
সকল দেবতা গেল ব্রহ্মার গোচর ॥
আচম্বিতে, ব্রহ্মা, তব সৃষ্টি হয় নাশ।
দিবারাত্রি গেল চন্দ্রসূর্য্যের প্রকাশ ॥
আচম্বিতে স্বর্গ আসি বেড়ে লঙ্কেশ্বর।
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া নিল লঙ্কার ভিতর ॥
দেবগণ ছাড়িয়াছে স্বর্গের বসতি।
কি প্রকারে দেবরাজ পাবে অব্যাহতি ॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা ভাবেন বিষাদ।
রাবণের বর দিয়ে পাড়িনু প্রমাদ ॥
দেবগণে রাখি ব্রহ্মা চলিল সত্বর।
একেশ্বর ব্রহ্মা গেল লঙ্কার ভিতর ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল রাবণ।
ভক্তিভাবে পূজে রাবণ ব্রহ্মার চরণ ॥
আচম্বিতে, ব্রহ্মা, কেন হেথা আগমন।
আজ্ঞা কর আছে তব কোন্ প্রয়োজন ॥
বিরিঞ্চি বলেন দুষ্ট কৈলি সৃষ্টিনাশ।
রাত্রিদিবা গেল চন্দ্রসূর্য্যের প্রকাশ ॥
ইন্দ্রে বান্ধি লঙ্কাতে আনিলি কিকারণ।
স্বর্গপুরে নাহি রহে যত দেবগণ ॥
যোড়হাতে বলে রাবণ ব্রহ্মার গোচর।
ত্রিভুবন জিনিলাম পেয়ে তব বর ॥
সকল জিনিখু আমি তোমার প্রসাদে।
ইন্দ্রে বান্ধিয়াছে মোর পুত্র মেঘনাদে ॥
যজ্ঞশালে রাখিয়াছে দেব পুরন্দরে।
আজ্ঞা কর আনি আমি তোমার গোচরে ॥

ব্রহ্মা বলিলেন রাজা, চল যজ্ঞশালা ।
দেখাইবে মেঘনাদ-যজ্ঞ নিকুম্ভিলা ।।
আগে আগে ব্রহ্মা যান পশ্চাতে রাবণ ।
তার পিছু চলিল রাক্ষস বিভীষণ ।।
মেঘনাদ-যজ্ঞ দেখি বিরিঞ্চির হাস ।
মেঘনাদে বলে ব্রহ্মা করিয়া প্রকাশ ।।
ইন্দ্ররণে তোর বাপ পেল পরাজয় ।
হেন ইন্দ্র জিন তুমি সংগ্রামে দুর্জ্জয় ।।
তোর বাণে ত্রিভুবন হইল কম্পিত ।
আজি হৈতে তোর নাম হৈল ইন্দ্রজিৎ ।।
বর মাগ, ইন্দ্রজিৎ, তুষ্ট হনু আমি ।
সৃষ্টি রক্ষা কর ইন্দ্রে ছাড়ি দেহ তুমি ।।
ইন্দ্রজিৎ বলে আগে দেহ তুমি বর ।
তবে আমি ছাড়িব এ রাজা পুরন্দর ।।
অমর করিয়া মোরে কর সম্বিধান ।
অন্য বর আমি নাহি চাহি তব স্থান ।।
ইন্দ্রজিৎকথা শুনি বিরিঞ্চির হাস ।
অমর হইলে তুমি মোর সর্ব্বনাশ ।।
ব্রহ্মা বলে দিনু বর শুন ভালমতে ।
ত্রিভুবন জিনিলে যে যজ্ঞের ফলেতে ।।
এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোর করিবে যে জন ।
সেই জন হবে তোর বধের ভাজন ।।
শুনেছিল এ সন্ধি রাক্ষস বিভীষণ ।
তারি জন্য ইন্দ্রজিতে বধিল লক্ষ্মণ ।।
ইন্দ্রে এনে দিল তবে ব্রহ্মা বিদ্যমান ।
অধোমুখে রহে ইন্দ পেয়ে অপমান ।।
ব্রহ্মা বলিলেন, ইন্দ্র, কিবা ভাব মনে ।
এ দুঃখ পাইলে ব্রহ্মশাপের কারণে ।।
গৌতমমুনির পত্নী অহল্যাসতীরে ।
অপমান করিলে যে একা পেয়ে ঘরে ।।
তোমারে সে মুনি শাপ দিল মহাকোপে ।
সর্ব্বগায়ে চক্ষু তব হৈল তার শাপে ।।
ধরিয়া মুনির পায়ে করিলে ক্রন্দন ।
এই মহাপাপ মোর করহ খন্ডন ।।
মুনি বলে খন্ডন না যায় এই পাপ ।
এই পাপে পরে তুমি পাবে মনস্তাপ ।।
মুনির বচন কভু না যায় খন্ডন ।
এত দুঃখ পেলে সেই পাপের কারণ ।।
বিরিঞ্চি বলেন ইন্দ্র কহি তব কানে ।
রামনামমন্ত্র তুমি যপ রাত্রিদিনে ।।
ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার ।
রামনামে হয় সর্ব্বপাপের সংহার ।।
একনামে সহস্র নামের ফল হয় ।
রামনামের তুল্য নাহি চারিবেদে কয় ।।
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলেন স্বস্থান ।
ইন্দ্র গেল স্বর্গপুরে পেয়ে প্রাণদান ।।
ব্রহ্মার কারণে ইন্দ্র পেয়ে অব্যাহতি ।
আইল অমরাবতী আপন বসতি ।।
রামনাম জপে সদা সহস্রলোচন ।
তার ফলে তব হস্তে মরিল রাবণ ।।
দিগ্বিজয় করি রাবণ আইল নিজ ঘর ।
চৌদ্দযুগ রাজ্য করে লঙ্কার ঈশ্বর ।।
আর চৌদ্দযুগ ছিল রাবণের আয়ু ।
সীতার চুলেতে ধরি হৈল অলপআয়ু ।।
লঙ্কাতে করিল রাজ্য মালী ও সুমালী ।
পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী ।।
তৎপরে লঙ্কায় রাজ্য করিল রাবণ ।
তব কৃপাবলে এবে রাজা বিভীষণ ।।
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস ।
'কহ কহ' বলি রাম করিলা প্রকাশ ।।
রাবণের দিগ্বিজয় কহিলা হে মুনি ।
রাবণ অধিক হনুমানেরে বাখানি ।।
বহুস্থানে রাবণের শুনি পরাজয় ।
হনুমান পরাজয় কোথাও না হয় ।।

গন্ধমাদন পর্ব্বত রাত্রির মধ্যে আনে।
হনুমানসম বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥

হনুমানের বিবরণ

অগস্ত্য বলেন কি কহিব তার কথা।
হনুমান গুণ সব না জানে দেবতা ॥
তাহার যতেক গুণ কহিতে না জানি।
সংক্ষেপেতে কহি কিছু শুন রঘুমণি ॥
জননী অঞ্জনা তার পিতা সে পবন।
হনুমানজন্মকথা কহি বিবরণ ॥
অঞ্জনা বানরী ছিল পরমাসুন্দরী।
তারে বিভা করিলেক বানর কেশরী ॥
পবনের বরে সেই প্রসবে সন্তান।
আঠার মাসেতে জন্ম নিল হনুমান ।
অমাবস্যা দিনে হৈল হনুর জনম।
জন্মমাত্রে সেই দিন বিশাল বিক্রম ॥
জন্মিয়া মায়ের কোলে বসে স্তন্যপান।
উদয় হইল রক্তবর্ণ ভানুমান ॥
ফলজ্ঞানে ধরিতে সে চাহিল কৌতুকে।
অঞ্জনার কোল হৈতে উঠে অন্তরীক্ষে ॥
পর্ব্বতসূর্য্যেতে হয় লক্ষক যোজন।
একলাফে উঠে তথা পবননন্দন ॥
জন্মমাত্র বালক সে উঠিল আকাশে।
সূর্য্যকে ধরিতে যায় অসীম সাহসে ॥
গ্রহণ লাগিবে সূর্য্যে সেই সে দিবসে।
ধাইয়াছে রাহু সূর্য্যে গিলিবার আশে ॥
হনুমানে দেখে রাহু পলাইল ডরে।
কহিল সকল কথা ইন্দ্রের গোচরে ॥
মম অধিকার ইন্দ্র দিলে তুমি কারে।
না জানি কে আসিয়াছে সূর্য্যে গিলিবারে ॥
শুনিয়া রাহুর কথা দেবের তরাস।
সূর্য্যকে গিলিতে কেটা করিয়াছে আশ ॥
ঐরাবতে চড়ি ইন্দ্র বজ্র হাতে লয়ে।
সূর্য্যের নিকটে হনু দেখিল আসিয়ে ॥
হনুমানে দেখি ইন্দ্র ভয়েতে অস্থির।
সুমেরু পর্ব্বত জিনি প্রকাণ্ড শরীর ॥
ঐরাবতমাথা রাঙ্গা হিঙ্গুলে মণ্ডিত।
তাহা দেখি হনুমান হৈল হরষিত ॥
ঐরাবতে এড়ি যায় সূর্য্যেরে ধরিতে।
কোপেতে উঠিল ইন্দ্র বজ্র লয়ে হাতে ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে দেবরাজ আপনা পাসরে।
বিনা দোষে বজ্রাঘাত শিরে তার করে ॥
হনুমান পীড়িত হইল বজ্রাঘাতে।
অচেতন হয়ে পড়ে মলয়পর্ব্বতে ॥
নিরখিয়া অঞ্জনার উড়িল পরাণ।
ব্যাকুল হইয়া কান্দে কোলে হনুমান ॥
'পুত্র পুত্র' বলি করে অঞ্জনা ক্রন্দন।
হেনকালে আইলেন দেবতা পবন ॥
অঞ্জনা বলেন, দেব, তুমি দিলা বর।
তথাপি মরিল পুত্র তোমার গোচর ॥
অঞ্জনার বচনে পবন পড়ে লাজে।
জগতের প্রাণ আমি ধরি কোন্ কাজে ॥
জগতেতে হই আমি জীবনের নিধি।
মম বর নষ্ট হয় রঙ্গ দেখে বিধি ॥
বিধাতা করিল সৃষ্টি বড় কার আশ।
স্বর্গমর্ত্ত্য-আদি আজি করিব বিনাশ ॥
বহে শ্বাস পবন সে লোকের জীবন।
পবন ছাড়িল বিশ্ব হল অচেতন ॥
স্থাবর জঙ্গম-আদি যতে যত জীবী।
মুনি সব অচেতন সকল পৃথিবী ॥
ইন্দ্র আদি অচেতন সকল দেবতা।
সৃষ্টিনাশ হয় দেখি চিন্তিত বিধাতা ॥
মলয়পর্ব্বতে ব্রহ্মা আসিয়া সত্বর।
বলেন, পবন শুন আমার উত্তর ॥

সৃষ্টি সৃজিলাম আমি বহুতর ক্লেশে ।
হেন সৃষ্টি নাশ কর যুক্তি না আইসে ।।
সৃজিলাম বায়ু আমি লোকের জীবন ।
শ্বাসেতে বহয়ে বায়ু এই সে কারণ ।।
হেন বায়ু রোধ করি মারিলা জগৎ ।
আপনি মরিবে বুঝি কর সেই মত ।।
আত্ম রাখ সৃষ্টি রাখ শুনহ উত্তর ।
চারিযুগ হনুমান হইবে অমর ।।
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা পবনের হাস ।
রুদ্ধ ছিল পবন সে করিল প্রকাশ ।।
আপনা প্রকাশ যদি করিল পবন ।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল উঠিল ত্রিভুবন ।।
বিধাতা বলেন শুন কহি দেবগণ ।
হনুমানে আশীর্ব্বাদ করহ এখন ।।
সর্ব্ব অগ্রে যম বলে আমি দিনু বর ।
আমা হৈতে নাহি তব মরণের ডর ।।
তবে বর দিলেন যে দেবতা বরুণ ।
না হবে আমার জলে তোমার মরণ ।।
অগ্নি বলে, হনুমান, দিলাম এ বর ।
অগ্নিতে না পুড়িবে তোমার কলেবর ।।
যত যত দেবতা যতেক বল ধরে ।
আপন আপন বল দিলেন তাহারে ।।
ইন্দ্র বলে হনুমান পবননন্দন ।
বড় লজ্জা পাইলাম তোমার কারণ ।।
যেই বজ্রাঘাতে তুমি হইলা অস্থির ।
সে বজ্র সমান হউক তোমার শরীর ।।
ব্রহ্মা বলেন, মারুতি, আমার এ বর ।
এই বরে হও তুমি অজয় অমর ।।
আপনি দিলেন বর আপনি বিমর্ষে ।
ধ্যানে জানিলেন ব্রহ্মশাপ হবে শেষে ।।
বর দিয়া দেবগণ গেলা নিজ স্থান ।
মলয়পর্ব্বতে রহিলেক হনুমান ।।

পিতৃঘরে আছে বীর পর্ব্বতশিখর ।
নানাবিদ্যা মল্লযুদ্ধ শিখিল বিস্তর ।।
পড়িবারে গেল বীর ভার্গবের স্থানে ।
চারিবেদ মল্লযুদ্ধ শিখে চারিদিনে ।।
পড়াইতে নারে গুরু তারে ঘৃণা করে ।
কুপিয়া ভার্গবমুনি শাপ দিল তারে ।।
বানর হইয়া কর গুরুকে যে ঘৃণা ।
বলবুদ্ধি বিক্রম সে পাসর আপনা ।।
সেই শাপে হনুমান আপনা পাসরে ।
তেঁই পলাইয়াছিল সে বালির ডরে ।।
হনুমানবীর যদি আপনারে জানে ।
ভুবন জিনিতে পারে একদিন রণে ।।
অযুত বছর যদি করি পরিশ্রম ।
বলিতে না পারি হনুমানের বিক্রম ।।
আপনি সাক্ষাৎ রাম তুমি নারায়ণ ।
তোমার সেবক তার কি কব কথন ।।
যত গুণ ধরে বীর কি কহিতে পারি ।
শ্রীরাম বিদায় দেহ দেশে গতি করি ।।
দুই বর্ষ ধরি পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহিয়া ।
স্বদেশে গেলেন মুনি বিদায় লইয়া ।
নানাধনে রাম পূজা করেন তাঁহাব ।
মহাহৃষ্ট অগস্ত্য পাইয়া পুরস্কার ।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাক্য সুধাভাণ্ড ।।
বাল্মীকির আদেশে গীত উত্তরাকাণ্ড ।।

রামসীতার জন্য বিশ্বকর্ম্মার প্রমোদভবন-নির্ম্মাণ ও তাহাতে রামসীতার বাস

শ্রীরাম করেন রাজ্য ধর্ম্মপরায়ণ ।
রাজ্যে নাই দুর্ভিক্ষ কি অকালমরণ ।।
শ্রীরাম বলেন ভরত শুনহ বচন ।
করহ রাজ্যের চর্চ্চা লয়ে সভাজন ।।

যুদ্ধ করে অবসাদ হয়েছে আমার।
অন্তঃপুরে রব আমি দিয়া রাজ্যভার।।
কিছুদিন বিশ্রাম করিব আছে মন।
তিন ভাই মিলে কর প্রজার পালন।।
মন দিয়া শুন, ভাই, বচন আমার।
সাবধানে থাকিয়া পালিবে রাজ্যভার।।
অন্তঃপুরে রব আমি করিয়াছি মনে।
সাবধানেতে পালিবে সদা প্রজাগণে।।
জোড়হাতে ভরত করেন নিবেদন।
সেবক হইয়া রাজ্য করেছি পালন।।
চৌদ্দবর্ষ রাজ্য ছাড়ি করিলে গমন।
পাদুকা করিয়া রাজা পালি রাজগণ।।
সাক্ষাতে আপনি আছ রাজ্যের ঈশ্বর।
ত্রিভুবন ভিতরেতে কারে করি ডর।।
সুখে অন্তঃপুরে তুমি থাক মনোরথে।
সেবক হইয়া রাজ্য পালিবে ভরতে।।
ভরতের বাক্যে তুষ্ট হৈল রঘুনাথ।
আলিঙ্গন দিল রাম পসারিয়া হাত।।
তিনভাই শ্রীরামে করিল প্রণিপাত।
অন্তঃপুরে চলিলেন প্রভু রঘুনাথ।।
অন্তঃপুরে গেলা রাম হরষিত মন।
সীতা করিলেন রামের চরণবন্দন।।
রাম বলে শুন সীতা আমার বচন।
লঙ্কাপুরে যেমন সে অশোক কানন।।
বিশ্রামার্থ আছে তথা অতি শোভাকর।
তাহার অধিক পুরী রচিব সুন্দর।।
তুমি আমি তাহে বাস করিব দুজন।
নানাবর্ণ পুষ্পবৃক্ষ করিব রোপণ।।
রঘুনাথ আনন্দেতে ব্রহ্মা পুলকিত।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মে আনিলা ত্বরিত।।
ব্রহ্মা বলে, বিশ্বকর্ম্মা, কর অবধান।
রামের অশোকবন করহ নির্ম্মাণ।।
ব্রহ্মার বচনে বিশ্বকর্ম্মা হরষিত।
অযোধ্যানগরে আসি হৈল উপনীত।।
বসি আছে রঘুনাথ হরষিত মন।
হেনকালে বিশ্বকর্ম্মা বন্দিল চরণ।।
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিলা তব স্থান।
সোনার অশোকবন করিল নির্ম্মাণ।।
মনে মনে বিশ্বকর্ম্মা করেন যুকতি।
নির্ম্মায়ে অশোকবন জন্মাব পিরীতি।।
সোণার অশোকবন করিল নির্ম্মাণ।
দেখিতে সুন্দর বড় হৈল সেই স্থান।।
সুবর্ণের বৃক্ষসব ফলফুল ধরে।
ময়ূরময়ূরী নাচে ভ্রমর গুঞ্জরে।।
সুললিত পক্ষিনাদ শুনিতে মধুর।
নানাবর্ণ পক্ষী ডাকে আনন্দ প্রচুর।।
বিকশিত পদ্মবন শোভে সরোবরে।
রাজহংসগণ তথা আসি কেলি করে।।
সরোবর চারিপাশে সুবর্ণের গাছ।
জলজন্তু কেলি করে নানাবর্ণ মাছ।।
মণিমাণিক্যেতে বান্ধা যত বৃক্ষগুঁড়ি।
স্থানে স্থানে রহিয়াছে রত্নময় পীঁড়ি।।
চন্দ্রোদয় হয় যেন আকাশ উপরে।
তেমনি উদ্যান এই পুরীর ভিতরে।।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল অশোককানন।
ত্রিভুবন জিনি স্থান অতি সুশোভন।।
অশোক কানন দেখি রাম হৈলা সুখী।
প্রবেশ করেন তাহে লইয়া জানকী।।
অশোকের বৃক্ষতলে চলিলেন রঙ্গে।
বসিলেন তথা তিনি জানকীর সঙ্গে।।
শত শত বিদ্যাধরী সীতার যে দাসী।
নানারসে সেবা করে রঘুনাথে তুষি।।
সীতারূপ দেখি রাম হরষিত মনে।
সীতারে তোষেন অতি মধুরবচনে।।

বিদ্যাধরীগণ এল অপ্সরা বিমলা ।
প্রথমযৌবনী তারা জিনি শশিকলা ।।
বিদ্যাধরীগণ রূপে আলো করে বন ।
সেবা করে সীতারে হইয়া একমন ।।
প্রথমযৌবনী সীতা লক্ষ্মীস্বরূপিনী ।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ ভুবনমোহিনী ।।
এত রূপ দিয়া তাঁরে সৃজিল বিধাতা ।
কাঁচাস্বর্ণবর্ণরূপে আলো করে সীতা ।।
দেখিয়া সীতার রূপ জুড়ায় যে আঁখি ।
চন্দ্রবদন শ্রীরাম সীতা চন্দ্রমুখী ।।
পূর্ণ-অবতার রাম সীতা মনোহরা ।
চন্দ্রের পাশেতে যেন শোভা পায় তারা ।।
আনন্দে আছেন রাম সীতা সম্ভাষণে ।
রাজকর্ম্ম এড়ি তথা রহে রাত্রিদিনে ।।
সীতার সেবায় রাম অতি তুষ্টমতি ।
শচীর সেবাতে যেন তুষ্ট শচীপতি ।।
ভিন্ন ভিন্ন দিনে সীতা ভিন্নমূর্ত্তি ধরে ।
একদিন অন্যরূপ বিষ্ণু ভাণ্ডবারে ।।
সাতহাজার বর্ষ রাম সীতাদেবী সঙ্গে ।
ষড়ঋতু বঞ্চন করেন নানা রঙ্গে ।।
নিদাঘকালেতে চৈত্র বৈশাখ যে মাসে ।
আনন্দে কাটান রাম হাস্যপরিহাসে ।।
বিকশিত পদ্ম শোভে চারিসরোবরে ।
মধুলোভে নলিনীতে ভ্রমর গুঞ্জরে ।।
রৌদ্রেতে পৃথিবী পুড়ে রবি যে প্রবল ।
সীতার সঙ্গেতে রাম সদা সুশীতল ।।
বরিষা দেখিয়া রাম পরমকৌতুকী ।
জলজন্তু কলরব তৃষিত চাতকী ।।
প্রমত্ত ময়ূর নাচে ময়ূরীর সঙ্গে ।
অশোকবনেতে রাম বঞ্চিলেন রঙ্গে ।।
সীতার সঙ্গেতে রাম পরম-উল্লাস ।
বরিষা হইল গত শরৎ প্রকাশ ।।
আসিয়া শরৎঋতু প্রকাশ হইল ।
নির্ম্মল চন্দ্রমা আর কুমুদ ফুটিল ।।
ফুটিল কেতকী দেখি অতিসুশোভন ।
ছাড়িল বরিষা ডাক শরৎ গর্জ্জন ।।
মন্দ মন্দ বরিষণ বায়ু বহে ধীরে ।
আনন্দেতে শরৎ বঞ্চিলা রঘুবরে ।।
কার্ত্তিকে হেমন্তঋতু বরিষে সঘনে ।
হিমময় বরিষণ অশোকের বনে ।।
সুরঙ্গ নারঙ্গ ফল বিস্তর সুন্দর ।
নারিকেল আদি যত ফল বহুতর ।।
পরমহরিষে আর সুখেতে বিশেষ ।
এরূপে শ্রীরামের হেমন্ত হৈল শেষ ।।
প্রবল হইল শীত শিশির-উদয়ে ।
পরমাপরীত রাম শীতকাল পেয়ে ।।
দিনে দিনে হইল মলিন শশধর ।
রজনী প্রবল হৈল অতি ভয়ংকর ।।
দেখি কোটিসূর্য্যতেজ ধরে রঘুবীর ।
দূরে গেল শীত রাম বঞ্চিলা শিশির ।।
আইল বসন্ত ঋতু সর্ব্ব ঋতুসার ।
কৌতুকসাগরে রাম করেন বিহার ।।
ফুটিল অশোক যে মাধবী নাগেশ্বর ।
প্রমত্ত ময়ূর নাচে গুঞ্জরে ভ্রমর ।।
আদরে তোষেন রাম সীতা চন্দ্রমুখী ।
পরমকৌতুক পান ঋতুরাজ দেখি ।।
এইরূপে দোঁহে সাতহাজার বৎসর ।
রাত্রিদিন আনন্দেতে থাকে নিরন্তর ।।
পঞ্চমাস গর্ভ হইল সীতার উদরে ।
কৌতুকে শ্রীরাম কিছু জিজ্ঞাসে সীতারে ।।
গর্ভবতী হৈলে কিবা খেতে অভিলাষ ।
কোন্ দ্রব্য খাবে, সীতা, করহ প্রকাশ ।।
লাজে হেঁটমাথা করে সীতা চন্দ্রমুখী ।
দ্রব্যে অভিলাষ নাহি সংসারেতে দেখি ।।

একদ্রব্য খেতে মোর হইয়াছে মন।
একদিন আজ্ঞা পেলে যাই তপোবন॥
যমুনার কূলে শ্রাদ্ধ করে মুনিগণে।
খাইতাম সে তণ্ডুল মুনিকন্যা সনে॥
মুনিপত্নী সঙ্গে যেয়ে স্নান করিবারে।
হংস খেদাড়িয়া পিণ্ড খাইতাম তীরে॥
যোগী ঋষি মুনি তথা করে পিণ্ডদান।
হংসেতে ভাঙ্গিয়া ডিম্ব করে খান খান॥
সত্য করিয়াছি আমি মুনিপত্নীস্থানে।
দেশে গেলে সম্ভাষ করিব তব সনে॥
এই সত্য পালিবারে দেহ ত মেলানি।
নানাধনে তুষিব সে মুনির রমণী॥
বিস্ময় মানিয়া রাম বলেন তখন।
কালি দিব মেলানি যাইতে তপোবন॥

ভদ্র নামক মন্ত্রীর নিকট শ্রীরামের সীতা-সম্বন্ধে জনাপবাদ শ্রবণ

এতেক আশ্বাস রাম দিলেন সীতারে।
সাতহাজার বর্ষান্তে আইলা বাহিরে॥
সহস্র বৃহন্দ ছাড়ি আইলা যখন।
পাত্রমিত্র কাণাকাণি করিছে তখন॥
রাবণের ঘরে সীতা ছিল দশমাস।
হেন সীতা লয়ে রাম করিছেন বাস॥
হেনকালে আসি রাম বাহির চৌতারা।
দেয়ানে বসিলা লয়ে সভাখণ্ড পুরা॥
পাত্রমিত্র ভয় পেয়ে করে কাণাকাণি।
সীতানিন্দা রঘুনাথ শুনিলা আপনি॥
সীতানিন্দা শুনি রাম ত্রাসিত অন্তরে।
সীতাদেবী না জানেন থাকি অন্তঃপুরে॥
ধর্ম্মে রাজ্য কৈল বড় দশরথ বাপ।
নানাসুখ ভুঞ্জে লোক না জানে সন্তাপ॥
আমি রাজা হইতে হে কে আছে কেমন।
রাজ্য ব্যবহার কিছু কহ পাত্রগণ॥
এতেক জিজ্ঞাসে রাম সভার ভিতর।
নিঃশব্দ হইল লোক না দেয় উত্তর॥
ভদ্র নামে মহাপাত্র উঠে আচম্বিতে।
রামের সম্মুখে কথা কহে যোড়হাতে॥
পাত্র সে দুর্ম্মুখ বড় কারে নাহি ভয়।
নিষ্ঠুর হইয়া কথা রাম-আগে কয়॥
পাত্র বলে, রঘুনাথ, কর অবধান।
রঘুবংশে আমি আছি পাত্রের প্রধান॥
সর্ব্বলোকে চিন্তে, প্রভু, তোমার কল্যাণ।
তোমার প্রসাদে রাজ্যে নাহি অসম্মান॥
দশরথ রাজার রাজত্ব যেই কালে।
সুবর্ণের পাত্র প্রজা নিত্য নিত্য ফেলে॥
এখন ফেলিছে পাত্র দিনেক অন্তর।
নির্ধন হতেছে রাজ্য শুন রঘুবর॥
শ্রীরাম বলেন কেন নির্ধন সংসার।
রাজা হয়ে করিলাম কোন্ অবিচার॥
রাজার পুণ্যেতে প্রজা বঞ্চে অতিসুখে।
রাজা যদি পাপ করে দুঃখে প্রজা থাকে॥
ভদ্র বলে, রঘুনাথ, কহিতে যে নারি।
পাত্র হয়ে অধিক কহিতে ভয় করি॥
শ্রীরাম বলেন, ভদ্র, না হও চিন্তিত।
পাত্র যে নির্ভয়ে কহে সেই সে উচিত॥
যোড়হাতে কহে ভদ্র করিয়া প্রণাম।
মোর এক নিবেদন শুন প্রভু রাম॥
ভদ্র বলে, রঘুনাথ, যাই যথা তথা।
সর্ব্বলোকে কহে, প্রভু, সীতার বারতা॥
দেবাসুর যুদ্ধ মত হইয়াছে রণ।
সীতা উদ্ধারিলা, রাম, মারিয়া রাবণ॥
দোষ না বুঝিয়া সীতা আনিয়াছ ঘরে।
নিৰ্ম্মলকুলেতে কালি দিলা রঘুবরে॥

যে নারী বলেতে ধরি লইল রাক্ষসে ।
রাখিয়াছ সেই নারী নিজ গৃহবাসে ॥
এই অপযশ তব সর্ব্বজন ঘোষে ।
তোমার সম্মুখে কেহ নাহি কয় ত্রাসে ॥
এত যদি কহে ভদ্র পাত্র সে দুর্ম্মুখ ।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন রামের সম্মুখ ॥
রামের নিকটে ছিল যত পাত্রগণ ।
শ্রীরাম বলেন কহ যথার্থ বচন ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা বলে পাত্রগণ ।
যে বলিল ভদ্র, প্রভু সত্য সে বচন ॥
শুনিয়া শ্রীরঘুনাথ ছাড়েন নিশ্বাস ।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

সীতার বনবাস

পাত্রমিত্র সবাকারে দিলেন মেলানি ।
অভিমানে শ্রীরামের চক্ষে পড়ে পানি ॥
নিদাঘ সময় অতি রবি খরতর ।
সরোবরে স্নানহেতু যান রঘুবর ॥
একেশ্বর যান কেহ নাহিক সহিত ।
সরোবরকূলে গিয়া হৈলা উপনীত ॥
পর্ব্বত জিনিয়া সেই সরোবরপাড় ।
চারিধারে শোভিছে বিচিত্র ফুলঝাড় ॥
দক্ষিণে রজক বস্ত্র কাচে স্বর্ণপাটে ।
স্নানহেতু চলে রাম উত্তরের ঘাটে ॥
অঙ্গ ডুবাইয়া রাম শিরে ঢালে পানি ।
দ্বন্দ্ব হয় রজকের শুনেন কাহিনী ॥
দুইজনে কথা কহে শ্বশুরজামাই ।
এই দুইজন বিনা আর কেহ নাই ॥
শ্বশুর বলিছে তুমি কুলেতে কুলীন ।
সর্ব্বগুণধর তুমি ধোপেতে ধুলিন ॥
নিজগোত্রপ্রধান আছিল তব পিতা ।
ধনী মানী দেখে তোরে দিলাম দুহিতা ॥
কোন্ দোষ করে কন্যা মারো কোন্ ছলে ।
আমার বাটীতে একা এল রাত্রিকালে ॥
একেশ্বরী এল কন্যা বড় পাই ভয় ।
পিতৃগৃহে যুবাকন্যা শোভা নাহি পায় ॥
জামাতারে এত যদি বলিল শ্বশুরে ।
বাক্ছলে জামাতা সে বলিছে প্রচুর ॥
যে বাক্য কহিলে তুমি সহিতে না পারি ।
থাকুক তোমার গৃহে তোমার ঝিয়ারী ॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি কেহ নাই সাথী ।
কাহার আশ্রমে কালি বঞ্চিলেক রাতি ॥
পৃথিবীর রাজা রাম সম্বরিতে পারে ।
রাবণ হরিল সীতা ফিরে আনে ঘরে ॥
রাম হেন নহি আমি পৃথিবীর পতি ।
জ্ঞাতিবন্ধু খোঁটা দিবে আমি হীনজাতি
শ্বশুর ঘরেতে গেল শুনিয়া বচন ।
থাকিয়া উত্তরঘাটে শুনে নারায়ণ ॥
ভদ্র যত বলিল রামের মনে লয় ।
শ্রীরাম ভাবেন ভদ্রবাক্য মিথ্যা নয় ॥
রজকের মুখে শুনি নিষ্ঠুর বচন ।
ঘরে চলিলেন রাম বিরস বদন ॥
মনেতে ভাবেন রাম অনেক বিষাদ ।
সীতা লয়ে পড়ে হেথা আর পরমাদ ॥
পঞ্চমাস আছে গর্ভ সীতার উদরে ।
জায়ে জায়ে একঠাঁই বসেছেন ঘরে ॥
মাথায় সীতার কেহ দিতেছে চিরুণী ॥
সীতারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রমণী ॥
সীতারে চাহিয়া বলে যত নারীগণ ।
দশমুণ্ড কুড়িহস্ত কেমন রাবণ ॥
তোমা লয়ে লঙ্কাপুরে করেছে দুর্গতি ।
ভূমিতে লিখহ তার মুণ্ডে মারি লাথি ॥
সীতা বলে সেছারে না দেখি কোনকালে ।
ছায়ামাত্র দেখিয়াছি সাগরের জলে ॥

তথাপি জিজ্ঞাসা করে যত নারীগণ।
জলেতে দেখেছ ছায়া কেমন রাবণ।।
রাবণ লিখিতে সীতার মনে হৈল সাধ।
বিধির নির্ব্বন্ধ হেথা পড়িল প্রমাদ।।
হাতে খড়ি ধরে সীতা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
দশমুণ্ড কুড়িহস্ত লিখে দশস্কন্ধ।।
গর্ভবতী নারী হাই উঠে সর্ব্বক্ষণ।
সদাই অলস সীতা ভূমিতে শয়ন।।
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা।
নেতের অঞ্চল পাতি শুইলেন সীতা।।
ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরী।
রামে দেখি বাহির হইল যত নারী।।
সীতাপাশে দেখে রাম লিখিত রাবণ।
সত্য অপযশ মম করে সর্ব্বজন।।
পড়িয়া আমার হাতে জন্ম গেল দুখে।
তবু উচ্চ বচন নাহিক সীতামুখে।।
সাধে কি সীতার জন্য লোকে করে বাদ।
সীতাত্যাগী হব আমি আর নাহি সাধ।।
সীতারে দেখিয়া রাম আসিলা বাহিরে।
মনোদুঃখে তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরে।।
সত্যহেতু মম পিতা আমা পুত্রে বর্জ্জে।
সত্যকার্য্য করি যদি লোকে নাহি গঞ্জে।।
রূপগুণে সীতাসম কোথাও না শুনি।
রূপগুণে দেখি তারে না দিনু সতিনী।।
সীতা লাগি বলিলেন পিতা দশরথে।
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা দিলা হাতেহাতে।।
দেশে আনিলাম সীতা করিয়া আশ্বাস।
হেন সীতা লাগি লোকে করে উপহাস।।
উপহাস করে লোকে সহিতে না পারি।
ডাক দিয়া রঘুনাথ আনিলা দুয়ারী।।
দুয়ারী ডাকিয়া রাম বলেন বচন।
ঝাট আন ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন।।

পাইয়া রামের আজ্ঞা সে দ্বারী সত্বর।
তিনজনে আনি দিল রামের গোচর।।
তিনভাই আসিয়া বন্দিল শ্রীচরণ।
তিনভায়ে লয়ে যুক্তি করেন তখন।।
যে কর্ম্ম করিলে লজ্জা পায় সভা ভাগ।
আমা সবাকার যুক্তি করি পরিত্যাগ।।
শ্রীরাম বলেন আর না বল উত্তর।
সীতা লাগি লজ্জা পাই সভার ভিতর।
অপযশ কত সব নারীর কারণ।
অকীর্ত্তি হইলে বর্জ্জি তোমা তিনজন।।
আমার বচন শুন ভাই রে লক্ষ্মণ।
সীতা লয়ে রাখ গিয়া মুনি তপোবন।।
বাল্মীকির তপোবন খ্যাত চরাচরে।
দেশের বাহিরে সীতা রাখ নিয়া দূরে।
কালি সীতা বলিলেন আমারে আপনি।
নানারত্নে তুষিব সে মুনির ব্রাহ্মণী।।
এই কথা কহ গিয়া প্রাণের লক্ষ্মণ।
রামের আজ্ঞায় তুমি চল তপোবন।।
একথা কহিলে তার পড়িবেক মনে।
সীতা যাবে আপনি মুনির তপোবনে।।
শীঘ্র যাহ, লক্ষ্মণ, আমার কর হিত।
রথে তুলি লয়ে যাহ সুমন্ত্র সহিত।।
তুমি আর সীতাদেবী সুমন্ত্র সারথি।
আর যেন কোন জন না যায় সংহতি।।
এত যদি নিষ্ঠুর বলিলা রঘুনাথ।
তিনভায়ের মুণ্ডে যেন পড়ে বজ্রাঘাত।।
হাহাকার করি লক্ষ্মণ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
কি দোষে সীতারে তুমি দিবে বনবাস।।
তুমি স্বামী থাকিতে হইবে অনাথিনী।
কেমনে বঞ্চিবে বনে হয়ে রাজরাণী।।
বিনা দোষে সীতারে দিও না মনস্তাপ।
রঘুবংশ নষ্ট হবে সীতা দিলে শাপ।।

দেশের বাহির নাহি করহ সীতাস্ত্রী ।
সীতা ছাড়া হৈলে হবে যে হত লক্ষ্মীশ্রী ।।
যদি রঘুনাথ সীতা করিবে বর্জ্জন ।
ভিন্ন গৃহে রাখ সীতা এই নিবেদন ।।
শ্রীরাম বলেন, ভাই, না কর বিষাদ ।
সীতা গৃহে থাকিলে হইবে অপবাদ ।।
দিলাম আমার দিব্য কর পরিহার ।
সীতার লাগিয়া কেন কহ বার বার ।।
শ্রীরামের কথাতে লক্ষ্মণে লাগে ভয় ।
সুমন্ত্রে আনিয়া তবে কথাবার্ত্তা কয় ।।
রথসহ সুমন্ত্রেরে রাখিয়া দুয়ারে ।
প্রবেশ করেন লক্ষ্মণ সীতার আগারে ।।
অশ্রুজলে লক্ষ্মণের সর্ব্ব-অঙ্গ তিতে ।
লক্ষ্মণে দেখিয়া কবে পরিহাস সীতে ।।
আইস দেবর আজি হল শুভদিন ।
এবে হে দেবর তুমি হয়েছ প্রবীণ ।।
চৌদ্দবর্ষ একত্রেতে বঞ্চিলাম বনে ।
রাজ্যশ্রী পাইয়া তুমি পাসরিলে মনে ।।
কহিয়াছি কত মন্দকথা অবিনয় ।
তেকারণে দেবর হে হয়েছ নির্দ্দয় ।।
বৈসহ বৈসহ, লক্ষ্মণ, সীতাদেবী বলে ।
বার্ত্তা কহ দেবর হে আছ ত কুশলে ।।
না দেখি তোমারে মম সদা পোড়ে মন ।
উত্তর না দেহ কেন বিরসবদন ।।
লক্ষ্মণ বলে যত বল অনুচিত ।
তোমা-দরশনে মন আছয়ে নিশ্চিত ।।
রাজার মহিষী তুমি থাক অন্তঃপুরে ।
সেবকেতে আজ্ঞাবিনা আসিতে না পারে ।।
সীতারে প্রণাম করি বন্দিলা চরণ ।
ভাগ্যফলে পাইলাম তোমার দর্শন ।।
আশীর্ব্বাদ করিলেন সীতাঠাকুরাণী ।
কি কারণে অন্তঃপুরে আইলা আপনি ।।
অকস্মাৎ দেবর হে কেন আগমন ।
মনেতে বিস্ময় হয় না জানি কারণ ।।
লক্ষ্মণ বলেন, মাতা, কর অবধান ।
শ্রীরামের আজ্ঞাতে আইনু তব স্থান ।।
কালি তুমি কহিয়াছ রাম বিদ্যমানে ।
সাক্ষাৎ করিতে যাবে মুনিপত্নী সনে ।।
আইলাম তব স্থানে এই সে কারণ ।
মম সঙ্গে চল বাল্মীকির তপোবন ।।
মণি বস্ত্র ধন লহ যেবা লয় চিতে ।
নানারত্ন লয়ে আসি উঠ দিব্যরথে ।।
এত শুনি জানকীর হইল উল্লাস ।
স্বরূপ কহিলে তুমি কিম্বা উপহাস ।।
লক্ষ্মণ বলেন, দেবি, বুঝহ আপনি ।
তোমা দুজনার কথা আমি কিসে জানি ।।
কহিতে এমন কথা কে সাহস করে ।
পরিহাস করিবারে তোমা কেবা পারে ।।
ইহা শুনি সীতাদেবী চলিল ভাণ্ডারে ।
নানারত্ন আনিলেন অতি যত্ন করে ।।
হীরামণিমাণিক্যের আভরণ আনি ।
লইয়া চন্দন গন্ধ সীতাঠাকুরাণী ।।
নানারত্ন-অলঙ্কার সীতাদেবী লয়ে ।
পট্টবস্ত্রে বান্ধিলেন আনন্দিত হয়ে ।।
বহুমূল্য ধন লয়ে সীতাদেবী নড়ে ।
পরমকৌতুকে সীতা রথে গিয়া চড়ে ।।
হেনকালে জানকীরে বলেন লক্ষ্মণ ।
তুমি আমি সুমন্ত্র সারথি তিনজন ।।
রামের আছয়ে আজ্ঞা যাব গুপ্তবেশে ।
বালবৃদ্ধযুবা কেহ নাহি জানে দেশে ।।
সীতাসঙ্গে চাহে যেতে অনেক রমণী ।
সবারে আশ্বাস দেন সীতাঠাকুরাণী ।।
মায়া সম্বরিয়া সবে থাক নিজ ঘরে ।
মুনিপত্নী প্রণমিয়া আসিব সত্বরে ।।

রথেতে চড়িল সীতা পরম হরিষে।
সবে ঘরে চলি গেল সীতার আশ্বাসে ॥
সীতা আলো করে রূপে দ্বাদশ যোজন।
সীতা বিনা অন্ধকার রামের ভবন ॥
দুর্ব্বল হইল লোক ছাড়ে রাজলক্ষ্মী।
রাজ্যখণ্ডে অমঙ্গল হইতেছে দেখি ॥
নদী ছাড়ে স্রোত লোকে ছাড়িল আহার।
দিবস দুপুরে হৈল ঘোর অন্ধকার ॥
সূর্য্যের কিরণ ছাড়ে পৃথিবীমণ্ডল।
সীতার বিদায় দেখি বৃক্ষ ছাড়ে ফল ॥
ভরতশত্রুঘ্ন আছে রামের নিকট।
সীতা লয়ে যান লক্ষ্মণ করিয়া কপট ॥
সীতা বলে আজি কেন দেখি অমঙ্গল।
নাহি জানি আমি রঘুনাথের কুশল ॥
শাশুড়ীরে না কহিনু আসিবার কালে।
বুঝি তার মনোদুঃখ হৈল সেই ফলে ॥
বামেতে দেখেন সর্প শৃগাল দক্ষিণে।
অমঙ্গল দেখি সীতা কহেন লক্ষ্মণে ॥
লক্ষ্মণ অশুভ নানা কেন দেখি পথে।
না যাব অযোধ্যা ফিরে হেন লয় চিতে ॥
সীতার বচনে লক্ষ্মণ হেঁট কৈলা মাথা।
রামের ভয়েতে কিছু না কহিলা কথা ॥
অধোমুখে কান্দে তার চক্ষে পড়ে পানি।
উত্তর না করে বীর সীতাবাক্য শুনি ॥
সীতা কন কেন তব বিরসবদন।
দেশে ফিরে যাব রথ চালাও লক্ষ্মণ ॥
আপনি বিদায় লব প্রভুর চরণে।
তবে সে যাইব বাল্মীকির তপোবনে ॥
লক্ষ্মণ বলেন, সীতা, না হও ব্যাকুল।
হের দেখ আইলাম যমুনার কূল ॥
বিধির নির্ব্বন্ধকর্ম্ম খণ্ডন না যায়।
এ কূলে রাখিয়া রথ দোঁহে চড়ে নায় ॥
পার হৈয়া যান বাল্মীকির তপোবন।
আগে সীতাদেবী যান পশ্চাতে লক্ষ্মণ ॥
কান্দিতে লাগিল বীর মনে পেয়ে ভয়।
লক্ষ্মণের ক্রন্দনেতে সীতা ভীতা হয় ॥
কি দুঃখ হইল মনে দেবর লক্ষ্মণ।
কি কারণে উচ্চৈঃস্বরে করিছ ক্রন্দন ॥
লক্ষ্মণ কহেন কব কেমন সাহসে।
রামের আজ্ঞায় তোমায় আনি বনবাসে ॥
মহাত্রাস পান সীতা শুনিয়া কাহিনী।
শ্রাবণের ধারাসম চক্ষে পড়ে পানি ॥
এতদূরে আসি তুমি বলিলে লক্ষ্মণ।
আনিলে কপট করি মোরে তপোবন ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম সংসারে প্রশংসা।
দেশে রেখে নাহি কেন করিলা জিজ্ঞাসা ॥
না দিবেন দেশমধ্যে মোরে যদি স্থান।
পরীক্ষা করিয়া কেন কৈলা অপমান ॥
যমুনায় ত্যজি প্রাণ তোমার সম্মুখে।
রঘুবংশ কলঙ্ক ঘুচুক সর্ব্বলোকে ॥
পাঁচমাস গর্ভ মোর দেখ বিদ্যমান।
আমি মৈলে মরিবেক রামের সন্তান ॥
আমা লাগি প্রভু লজ্জা পাইলা সভায়।
বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলা আমায় ॥
রাম হেন স্বামী হক জন্মজন্মান্তর।
আমি মৈলে কোটি নারী মিলিবে তাঁহার ॥
সীতার ক্রন্দন শুনি কাতর লক্ষ্মণ।
বাল্মীকির তপোবনে বসিলা দুজন ॥
লক্ষ্মণ বিদায় মাগে করি যোড়হাত।
কান্দিয়া বলেন সীতা 'কোথা রঘুনাথ' ॥

শ্রীরামচন্দ্রের সুবর্ণ-সীত নির্ম্মাণ

সীতাদেবী রাখিয়া লক্ষ্মণবীর নড়ে।
কাঁদিতে কাঁদিতে বীর নায়ে গিয়া চড়ে ॥

নৌকায় হইয়া পার চড়িলেন রথে ।
কোথা রাম বলি সীতা লাগিলা কান্দিতে ॥
কান্দিতে লাগিল সীতা হইয়া ফাঁফর ।
হেনকালে চতুর্দ্দিকে দেখে ভয়ঙ্কর ॥
চারিদিকে চান সীতা দেখে বনময় ।
শার্দ্দূল ভল্লুক দেখে পান বড় ভয় ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সীতা বনের ভিতর ।
শিষ্যসঙ্গে আইলা বাল্মীকি মুনিবর ॥
সীতার বনবাস পূর্ব্বে রচেছেন মুনি ।
আসিয়া সীতার স্থানে জিজ্ঞাসে আপনি ॥
জনকের কন্যা তুমি রামের গৃহিণী ।
দশরথের বহুয়ারী মেদিনীনন্দিনী ॥
লোক-অপবাদে রাম পাইয়া তরাস ।
বিনা অপরাধে তোমায় দিলা বনবাস ॥
ত্রিভুবনে সাধ্বী নাহি তোমার সমান ।
অযোধ্যাকাণ্ডেতে আছে তাহার প্রমাণ ॥
পরম-আদরে সীতা লয়ে যান মুনি ।
সীতারে রাখিল লয়ে যথায় ব্রাহ্মণী ॥
সীতার রূপেতে তপোবন আলো করে ।
মুনিপত্নী বলে লক্ষ্মী এল মোর ঘরে ॥
জানকীরে মুনিপত্নী দিলা আলিঙ্গন ।
সীতারে প্রশংসি বলে মধুরবচন ॥
শুভদিন হৈল, মাতা, এলে মোর ঘর ।
তোমা-দরশনে মোর হরিষ অন্তর ॥
সীতা বলে কর্ম্মদোষে আমার বর্জ্জন ।
তোমা-দরশনে মোর সফল জীবন ॥
মুনিপত্নী সহিত রহেন তপোবনে ।
কান্দিয়া লক্ষ্মণ চলে অযোধ্যা ভুবনে ॥
সুমন্ত্র বলেন শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
পূর্ব্বের কাহিনী মোর হইল স্মরণ ॥
বুড়া রাজার কথা আজ পড়িয়াছে মনে ।
রঘুবংশে সারথি আমি যবে অনরণ্যে ॥
বাল্মীকি-কবিতা মোর কিছু পড়ে মনে ।
বুড়া রাজার যজ্ঞকথা শুন সাবধানে ॥
সপ্তদ্বীপের যত মুনি এল সেই স্থানে ।
দশরথ রাজার যজ্ঞের নিমন্ত্রণে ॥
যজ্ঞশালে আসিবারে মুনিগণ-মেলা ।
সবে মেলি বর দিলা যেয়ে যজ্ঞশালা ॥
যজ্ঞফলে রাজা তব চারিপুত্র হবে ।
সুরাসুর-অমরাদি সকলে কাঁপিবে ॥
সর্ব্বগুণে ধরিবেক তোমার কুমার ।
এক অংশে চারিপুত্র বিষ্ণু-অবতার ॥
চারিপুত্রের পিতা তুমি শুন গুণধাম ।
শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ আর ভরত শ্রীরাম ॥
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম যাবে বন ।
শূন্যঘর পেয়ে সীতা হরিবে রাবণ ॥
বান্ধিয়া সাগর রাম সৈন্য করি পার ।
রাবণ বধিয়া সীতা করিবে উদ্ধার ॥
এগার হাজার বর্ষ প্রজার পালন ।
সাতহাজার বর্ষ পরে সীতার বর্জ্জন ॥
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে ।
লক্ষ্মণে বর্জ্জিবে রাম সে মুনির শাপে ॥
এত শুনি মহারাজ হেঁট কৈল মাথা ।
আমারে কহিলা ব্যক্ত না কর এ কথা ॥
আমারে নিষেধি রাজা গেল স্বর্গবাস ।
তোমার নিকটে আজ করিনু প্রকাশ ॥
সীতার লাগিয়ে তুমি করহ ক্রন্দন ।
তোমা হেন ভাই রাম করিবে বর্জ্জন ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই কহিনু লক্ষ্মণ ।
শুনিয়া লক্ষ্মণবীর বিরস বদন ॥
লক্ষ্মণ বলেন তুমি কহিলে বৃত্তান্ত ।
দেখিতে সীতার দুঃখ না পারি সুমন্ত্র ॥
আগে কেন রাম মোরে না কৈলা বর্জ্জন ।
এড়াতাম এই দুঃখ দেখিতে এখন ॥

আপনার দুঃখ আমি সহিবারে পারি।
সীতার যন্ত্রণা আর দেখিতে না পারি ॥
এই কথাবার্ত্তা তবে কয় দুইজন।
অযোধ্যায় রামকাছে গেলেন লক্ষ্মণ ॥
কান্দিতে কান্দিতে বীর নোয়াইল মাথা।
শ্রীরাম বলেন সীতা থুয়ে এলে কোথা ॥
আমার পাপিষ্ঠ মন চঞ্চল হৃদয়।
বর্জ্জিলাম সীতা নারী লোকের কথায় ॥
মোরে ছাড়ি সীতা নাহি থাকে একরাতি।
একেলা থাকিবে বনে কাহার সংহতি ॥
রাজ্যধন সিংহাসন বিফল আমার।
সীতার বিহনে মোর সব অন্ধকার ॥
কোন্ বনে রহিলেন সীতা সে রূপসী।
কি বলিবে শুনিলে জনক মহাঋষি ॥
কার মুখ চেয়ে সীতা রহে কার পাশ।
সিংঘব্যাঘ্র দেখি সীতার লাগিবে তরাস ॥
কহ কহ কহ ভাই শুনি আরবার।
কোন্ বনে থুয়ে এলে জানকী আমার ॥
লক্ষ্মণ বলেন তুমি করিলে বর্জ্জন।
আপনি বর্জ্জিয়া কেন করহ রোদন ॥
ক্রন্দন সম্বর, প্রভু, ক্ষমা দেহ মনে।
সীতা থুয়ে আইলাম বাল্মীকির বনে ॥
যদি রঘুনাথ মোরে কর আজ্ঞা দান।
রাত্রির ভিতরে সীতা আনি তব স্থান ॥
শ্রীরাম বলেন সীতা থুয়েছি বাহিরে।
বড় লজ্জা হবে পুনঃ আনিলে সীতারে ॥
সীতা না দেখিয়া ভাই, না পারি রহিতে।
কেমনে সীতার শোক পাসরিব চিতে ॥
আমার বচন শুন ভাই তিনজন।
রাত্রিতে সোনার সীতা করহ গঠন ॥
জানকী আনিলে নিন্দা করিবে যে লোক।
দেখিয়া সোণার সীতা পাসরিব শোক ॥
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
বিশ্বকর্ম্মা এলো তথা বুঝি তাঁর মন ॥
শতমণ সোণা লয়ে দিল তার স্থান।
স্বর্ণসীতা বিশ্বকর্ম্মা করিল নির্ম্মাণ ॥
যেমন সীতার রূপ কিছু নাহি নড়ে।
সবেমাত্র এই চিহ্ন বাক্য নাহি সরে ॥
সোণার সীতারে পরায় বস্ত্র আভরণ।
সুগন্ধি পদ্মের মালা সুগন্ধি চন্দন ॥
'সীতা সীতা' বলি রাম ডাকে নিরন্তর।
সীতা নহে রঘুনাথে কে দিবে উত্তর ॥
একদৃষ্টে চাহেন সোণার সীতামুখ।
উত্তর না পেয়ে রামের বড় হয় দুখ ॥
সাতহাজার বর্ষ যে সীতার সংহতি।
দেখিয়া সোনার সীতা বঞ্চে সাত রাতি ॥
সাত রাত্রি বঞ্চি রাম আইলা বাহির।
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে নীর ॥
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন তিনজনে।
বাহির-চৌতারে রাম বসিলা দেয়ানে ॥
পাত্রমিত্রবন্ধুবর্গ এল রামস্থানে।
শূন্যময় দেখে রাম সীতার বিহনে ॥
বিবাহ করিতে তাঁর নাহি লয় মন।
সম্মুখে সোণার সীতা রাখে সর্ব্বক্ষণ ॥
পাত্রমিত্রবন্ধুবর্গ বুঝায় সকলে।
বিবাহ করহ, রাম, সকলেতে বলে ॥
যথা যত রাজকন্যা আছে স্থানে স্থান।
শুনিয়া রামের গুণ করে অনুমান ॥
সীতা হেন নারী যার না লাগিল মনে।
সে জনার মনোনীত হইবে কেমনে ॥
কন্যাগণ এই যুক্তি করে নিরন্তর।
আর বিভা না করিবেন রাম রঘুবীর ॥
'সীতা সীতা' বলি রাম ছাড়িল নিশ্বাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ডে কবি কৃত্তিবাস ॥

কালিঞ্জর রাজার বিবরণ

লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু, উচিত এ নয়।
সাতদিন হৈল রাজকার্য্য নাহি হয় ।।
সাতদিন হইয়াছে সীতার বর্জ্জন।
সীতার শোকেতে কর্ম্মে কিছু নাহি মন ॥
রাজা হৈয়া রাজকর্ম্ম না করে জিজ্ঞাসা।
পরিণামে নরক ভিতরে হয় বাসা ।।
রাজ্যচর্চ্চা ছাড়িলেন পূর্ব্বে রাজা মৃগে।
সেই পাপে নরক ভুঞ্জিল চারিযুগে ।।
পুষ্করদেশের রাজা নাম মৃগেশ্বর।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাজা গুণের সাগর ॥
প্রভাসের তীরে রাজা করিল গমন।
একলক্ষ ধেনুদানে তুষিল ব্রাহ্মণ ॥
অগ্নিবেশ্যের ধেনু যে ছিল তার পালে।
মৃগরাজা দান কৈল ধেনুর মিশালে ॥
অগ্নিবেশ্য ব্রাহ্মণেরে জগতে বাখানি।
তপে জপে ব্রহ্মচর্য্যে দ্বিজ মহাজ্ঞানী ॥
ধেনুর শোকেতে দ্বিজ জরজর তনু।
নানাদেশে তত্ত্ব করি না পাইল ধেনু ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল প্রভাসের তীরে।
আপনার ধেনু দেখে পালের ভিতরে ॥
ধেনু দেখি ব্রাহ্মণের হরষিত মন।
'জীববৎসা' বলি মুনি ডাকিল তখন ॥
হাম্বা রবে এল ধেনু অগ্নিবেশ্যপাশে।
ধেনু লয়ে দ্বিজবর চলিল হরিষে ॥
যারে দান দিয়াছিল মৃগমহীপালে।
সেই দ্বিজ আইল ধাইয়া হেনকালে ॥
অগ্নিবেশ্য ধেনু লয়ে করিছে গমন।
গোচর বলিয়া তারে ধরিল ব্রাহ্মণ ॥
ধেনু লাগি বিসম্বাদ হৈল দুইজনে।
রাজদ্বারে মহাযুদ্ধ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে ॥
দ্বারী গিয়া ভূপতিরে কহিল সংবাদ।
ধেনু লাগি দুই দ্বিজে হতেছে বিবাদ ॥
লক্ষ ধেনুদান তুমি কৈলে যেই কালে।
অগ্নিবেশ্য-ধেনু এক ছিল সেই পালে ॥
এতেক শুনিয়া রাজা ভাবয়ে বিষাদ।
অবিচারে দান করে পড়িল প্রমাদ ॥
এতেক ভাবিয়া রাজা না দিল দর্শন।
রাজদ্বারে হুড়াহুড়ি বিপ্র দুইজন ॥
দুই বিপ্র কোন্দল করয়ে রাজদ্বারে।
দুইপ্রহর হৈল দেখা না পায় রাজারে ॥
ভূপে দেখা না পাইল দোঁহে হৈল তাপ।
ক্রোধভরে দুই বিপ্র ভূপে দিল শাপ ॥
পরধন দান হেতু লাগিল কোন্দল।
দেখা না পাইয়া বিপ্র ছাড়ে রাজস্থল ॥
দেখা না পাইয়া ভূপে বলে কটূত্তর।
কাঁকলাস হয়ে থাক নরকভিতর ॥
উভয়ে মিলিয়া ঘরে গেলেন ব্রাহ্মণ।
প্রমাদ পড়িল এত দিয়া পরধন ॥
ব্রহ্মশাপ মৃগরাজা ভুঞ্জে চিরকাল।
না করি রাজ্যের চর্চ্চা এতেক জঞ্জাল ॥
রাম বলে জানি শাস্ত্রে কহে মুনিঋষি।
অবিচারে ধর্ম্মকার্য্যে হয় পাপরাশি ॥
চিরদিন তোমরা করহ রাজ্যখণ্ড।
করেছ ভূপতি মোরে দিয়া ছত্রদণ্ড ॥
এত বলি শ্রীরাম বসিলা সভা করি।
রাজদ্বারে লক্ষ্মণ বসেন হয়ে দ্বারী ॥
এলেন বশিষ্ঠমুনি কুলপুরোহিত।
কশ্যপনারদ আদি হৈলা উপনীত ॥
পাত্রমিত্র লয়ে চর্চ্চা করেন ভরতে।
আছেন লক্ষ্মণ দ্বারে স্বর্ণছড়ি হাতে ॥
মুনিগণ কহিছেন শুনহ লক্ষ্মণ।
রঘুনাথ সঙ্গেতে করাহ দরশন ॥

প্রজা সব বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
রামের পালনে সুখী আছে প্রজাগণ ॥
রামহেন রাজা নাহি দেখি কোন যুগে।
পুত্রপৌত্রে লোক সব আছে নানাভোগে ॥
এত শুনি হরষিত লক্ষ্মণ ঠাকুর।
হেনকালে তথা এক আইল কুক্কুর ॥
রক্ত আঁখি কুক্কুরের সর্ব্বাঙ্গ ধবল।
পথশ্রান্তে উপবাসে হয়েছে বিকল ॥
তিনপদে চলে তার একপদ খঞ্জ।
দণ্ডের আঘাতে শিরে রক্ত পুঞ্জ পুঞ্জ ॥
তিনপদে চলিয়া আইল ধীরে ধীরে।
লক্ষ্মণে প্রণাম করি ভাসে অশ্রুনীরে ॥
জিজ্ঞাসেন সে কুক্কুরে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কি কারণে কুক্কুর হেথায় আগমন ॥
কুক্কুর কহিছে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কহিব আমার দুঃখ শ্রীরামসদন ॥
যদি আজ্ঞা দেন রাম ঘৃণা না করিয়া।
কহিব আমার দুঃখ সভামধ্যে গিয়া ॥
লক্ষ্মণ গেলেন তবে রামের নিকটে।
কুক্কুরের বৃত্তান্ত কহেন করপুটে ॥
দ্বারেতে কুক্কুর এক হৈল আগুসার।
সভাতে আসিতে চাহে কি আজ্ঞা তোমার ॥
কুক্কুরে আনিতে রাম কহেন সত্বর।
কুক্কুরে আনিল তবে রামের গোচর ॥
ভকতিভরে কুক্কুর নোঙাইয়া মাথা।
যোড়হাতে স্তব করে বলে নীতিকথা ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর ॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমিদিক্‌পাল।
তোমার সকল সৃষ্টি তুমি পরকাল ॥
তুমি বিষ্ণু-অবতার পতিতপাবন।
সার্থক কুক্কুর পেয়ে তোমা-দরশন ॥

রাম বলে কত স্তুতি কর বারে বারে।
কোন্‌কার্য্যে আসিয়াছ কহ না আমারে ॥
কান্দিয়া কুক্কুর বলে অশ্রুজলে ভাসি।
বিনা অপরাধে মোরে মেরেছে সন্ন্যাসী ॥
সন্ন্যাসীর দণ্ডাঘাতে হইয়া কাতর।
তিন উপবাসে আসি তোমার গোচর ॥
কোন্ অপরাধে মোরে দণ্ডে করে দণ্ড।
সন্ন্যাসীরে জিজ্ঞাসা করহ সভাখণ্ড ॥
রাম বলে, সভাখণ্ড, শুনিলে উত্তর।
সন্ন্যাসীরে শীঘ্র আন আমার গোচর ॥
ভালমন্দ বিচার করহ সর্ব্বজনে।
সন্ন্যাসী হইয়া জীবে হিংসে কি কারণে ॥
রামের আজ্ঞাতে দূত চলিল সত্বরে।
সঙ্গে যেয়ে কুক্কুর দেখাল সন্ন্যাসীরে ॥
হাতে কমণ্ডলু স্কন্ধে মৃগছাল তার।
সন্ন্যাসীরে দেখে দূত করে নমস্কার ॥
সন্ন্যাসীর লয়ে গেল যথায় লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ আনিয়া দিল রামের সদন ॥
সন্ন্যাসীরে রঘুনাথ করেন জিজ্ঞাসা।
স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া কেন কর জীবহিংসা ॥
অধর্ম্ম করিলে হয় নরকে নিবাস।
ক্রোধে অঙ্গ পরিপূর্ণ কিসের সন্ন্যাস ॥
পরনিন্দা পরহিংসা পরমপাতক।
সন্ন্যাসী হিংস্রক হলে বিষম নরক ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ যেবা করে ত্যাজ্য।
এমন সন্ন্যাসী হয় সংসারেতে পূজ্য ॥
সন্ন্যাসী হইয়া ক্রোধ কর অকস্মাৎ।
কি দোষে কুক্কুরে করিলে দণ্ডাঘাত ॥
যোড়হাতে কহে তবে সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
দোষাদোষ আমার শুনহ নারায়ণ ॥
সারাদিন সন্ধ্যাজপ করি গঙ্গাতীরে।
সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা-আশে যেতেম নগরে ॥

ক্ষুধানলে পুড়ে অঙ্গ মেগে ফিরি ভিক্ষে।
পথ যুড়ে শুয়ে আছে কুক্কুর সম্মুখে ॥
পথ ছাড় বলে ডাক দিই উচ্চৈঃস্বরে।
কপটে রহিল পথ না ছাড়িল মোরে ॥
একচক্ষে নিদ্রা যায় আর চক্ষে চায়।
ক্রোধে জ্বলি দণ্ডাঘাত করেছি মাথায় ॥
এই কহিলাম আমি সভার ভিতরে।
যে হয় উচিত দণ্ড করহ আমারে ॥
রাম বলে, সভাখণ্ড, করহ বিচার।
কাহার করিব দণ্ড অপরাধ কার ॥
যোড়হাত করি তবে সভাখণ্ড কয়।
আমাদের বুদ্ধিসাধ্য এইমত হয় ॥
কারো নহে রাজপথ রাজ-অধিকার।
উত্তম-অধম পথে চলে ত সংসার ॥
যদি শীঘ্র কাজ থাকে যাবে একপাশে।
সন্ন্যাসী হইল দোষী আপনার দোষে ॥
শ্রীরাম বলেন তবে শুন সভাখণ্ড।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সন্ন্যাসীর করিব কি দণ্ড ॥
যোড়হাতে রঘুনাথে কহে সভাখণ্ড।
গঙ্গাস্নান মানা করা সন্ন্যাসীর দণ্ড ॥
কুক্কুর উঠিয়া বলে সভার ভিতরে।
কদাচিৎ দণ্ড না করিহ সন্ন্যাসীরে ॥
আমার বচনে কিছু কর পুরস্কার।
কালিঞ্জরে সন্ন্যাসীরে দেহ রাজ্যভার ॥
কুক্কুরের কথা শুনি সভাজন হাসে।
সন্ন্যাসীরে রাজা করে কালিঞ্জর দেশে ॥
রাজ্য পেয়ে সন্ন্যাসী মাতঙ্গ পৃষ্ঠে চড়ে।
রাজদণ্ডে সন্ন্যাসীর ঐশ্বর্য্য সে বাড়ে ॥
আনন্দে সন্ন্যাসী যায় কালিঞ্জরদেশে।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখে সর্ব্বলোক হাসে ॥
পরিধানে কৌপীন মস্তকে ছত্রদণ্ড।
রঘুনাথে জিজ্ঞাসা করে সভাখণ্ড ॥
আনিলে সন্ন্যাসী ধরে দণ্ড করিবারে।
কি কারণে রাজপদ দিলে সন্ন্যাসীরে ॥
রাম বলে রাজ্য দিনু কুক্কুরবচনে।
ইহার যে বৃত্তান্ত কুক্কুর ভাল জানে ॥
ইহা শুনি সভাখণ্ড জিজ্ঞাসে কুক্কুরে।
কুক্কুর বিনয় করি কহিছে সত্বরে ॥
পূর্ব্বজন্মে কালিঞ্জরে আমি ছিনু রাজা।
নিত্য নিত্য করিতাম সদাশিব পূজা ॥
নীলবর্ণ শিবলিঙ্গ তথা অধিষ্ঠান।
রাজা বিনা অন্য জনে পূজিতে না পান ॥
বিশেষ প্রকারে পূজা করিয়া শঙ্করে।
প্রসাদ খাইতে হয় প্রত্যহ রাজারে ॥
রাজারে শিবের শাপ আছয়ে এমন।
মরিলে কুক্কুরযোনি না হয় খণ্ডন ॥
কালিঞ্জর দেশে শিব বড়ই নিষ্ঠুর।
রাজা ছিলাম এবে আমি হয়েছি কুক্কুর ॥
পাইয়া কুক্কুরদেহ এতেক দুর্গতি।
তোমা-দরশনে এবে হইবে নিষ্কৃতি ॥
সবে বলে সন্ন্যাসীর বাড়িল বিষয়।
বিষয় এ নহে, প্রভু, বড়ই সংশয় ॥
কালিঞ্জরে যেই জন হয়ত রাজন।
মরিলে কুক্কুর হবে না হয় খণ্ডন ॥
কুক্কুর এতেক বলি রামে নমস্কারে।
বারাণসীধামে পরে চলে ধীরে ধীরে ॥
প্রাণ ত্যজে সে কুক্কুর করি উপবাস।
রাম দরশনে লাভ হৈল স্বর্গবাস ॥

শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক লবণদৈত্য বধ

সভাসনে রঘুনাথ বসিলা দেয়ানে।
পাত্র মিত্র সভাজন আছে বিদ্যমানে ॥
উপনীত লক্ষ্মণ রামের বিদ্যমান।
প্রণিপাত করি কহে শ্রীরামের স্থান ॥

মহামুনি ভার্গব বৈসেন গঙ্গাতীরে।
তোমা-দরশনে মুনি আইলেন দ্বারে।।
রাম কহে ঝট আন দ্বারে কি কারণ।
বড় ভাগ্য আজি মম মুনি দরশন।।
শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে লক্ষ্মণ সত্বরে।
শিষ্যসহ মুনি আনে রামের গোচরে।।
নমস্কার করি রাম বন্দিলা চরণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিলা রাম বসিতে আসন।।
ভার্গব বলেন, রাম কর অবধান।
মহাদুঃখ নিবেদিতে আসি তব স্থান।।
পূর্বে রাজগণে দিনু যত যত ভার।
রাজগণ পালিল আমার অঙ্গীকার।।
ত্রিভুবন রাখিলে হে মারিয়া রাবণ।
রাবণ হইতে এক আছে ত দুর্জ্জন।।
সত্যযুগে ছিল মধু দৈত্যের প্রধান।
হিরণ্যকশিপু পুত্র বড় বলবান্।।
সদাশিব প্রিয়ভক্ত দৈত্য মহাবল।
শিবের বরেতে সে জিনেছে ভূমণ্ডল।।
জাঠা এক শিব তারে দিয়াছেন দান।
জাঠার তেজের কথা কি কব বাখান।।
মন্ত্র পড়ি মধুদৈত্য জাঠা যদি এড়ে।
জাঠামুখে ত্রিভুবন ভস্ম হয়ে উড়ে।।
হৈল মধুর পুত্র লবণ মহাবল।
জিনিল জাঠার তেজে পৃথিবীমণ্ডল।।
কুম্ভনসীগর্ভে জন্ম রাবণ-ভাগিনে।
তাহার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে।।
মহাদুষ্ট লবণ সে মধুরাতে ঘর।
জন্মাবধি মহাপাপ করে নিরন্তর।।
মধুদৈত্য মহাবীর হইলে পতন।
তাহারে সে জাঠাগাছ পাইল লবণ।।
লবণ জাঠার তেজে জিনে ত্রিভুবন।
লবণে মারিতে যুক্তি করহ এখন।।

জাঠাগাছ লইয়া সে যদি আসে রণে।
তাহারে রণেতে জিনে নাহি ত্রিভুবনে।।
লবণের সঙ্গে হবে দুর্জ্জয় সংগ্রাম।
তার কথা কহি কিছু শুনহ শ্রীরাম।।
মান্ধাতা নামেতে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
অযোধ্যাতে রাজ্য করে ত্রিভুবন শাসে।।
ইন্দ্রে জিনিবারে গেল অমরভুবন।
ভয়ে ইন্দ্র পলাইয়া হৈল অদর্শন।।
মান্ধাতার প্রতি তবে কহে দেবগণে।
অর্দ্ধরাজ্য ভোগ কর পুরন্দরসনে।।
ধনেতে অর্দ্ধেক লহ এ অমরাবতী।
ইন্দ্রের সহিত থাও করিয়া পিরীতি।।
মান্ধাতা বলেন চাহি করিবারে রণ।
ইন্দ্রে জিনি স্বর্গ লব শুনে দেবগণ।।
পুরন্দরে জিনি আমি রাখিব পৌরষ।
ত্রিভুবনে লোকে যেন ঘোষে এই যশ।।
দেবগণ লয়ে ইন্দ্ররাজা যুক্তি করে।
বিনাযুদ্ধে পাঠাইব যমের দুয়ারে।।
ইন্দ্র বলে শুনহ মান্ধাতা মহারাজ।
পৃথিবী জিনিতে নার বীরের সমাজ।।
পৃথিবী জিনিতে যেই রাজা নাহি পারে।
লজ্জা নাই আসিয়াছে স্বর্গ জিনিবারে।।
আছয়ে লবণদৈত্য সে বড় কর্কশ।
রাক্ষসীগর্ভেতে জন্ম জাতিতে রাক্ষস।।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য করে মধুরার দেশে।
তারে জিনে তবে স্বর্গ জিন আসি শেষে।।
ইন্দ্রের বচনে লাজ পাইয়া মান্ধাতা।
মনোদুঃখে ম্রিয়মাণ করে হেঁট মাথা।।
স্বর্গ ছাড়ি আইল লবণে জিনিবারে।
দূত পাঠাইল সে লবণে জানাবারে।।
ত্বরা করি গেল দূত লবণ গোচরে।
মান্ধাতারাজন আসে তোমা জিনিবারে।।

লবণ শুনিয়া এত ক্রোধিত হইল ।
লবণের ক্রোধ দেখি দূত চলি গেল ॥
দূতের বিলম্ব দেখি মান্ধাতাভূপতি ।
যুঝিবারে গেল বীর কটকসংহতি ॥
মান্ধাতার তেজ যেন সূর্য্যের কিরণ ।
মান্ধাতার তেজ দেখি রুষিল লবণ ॥
মান্ধাতার সেনাপতি যতেক যুঝার ।
লবণ উপরে করে বাণ অবতার ॥
জাঠা হাতে করিয়া লবণবীর রোষে ।
এড়িলেক জাঠাগাছ মান্ধাতা উদ্দেশে ॥
রথ-অশ্বকটক জাঠার তেজে পুড়ে ।
মান্ধাতা জাঠার তেজে ভস্ম হয়ে উড়ে ॥
পুনর্ব্বার জাঠা গেল লবণের হাতে ।
পড়িল মান্ধাতা যত রাজা ভয়ে চিন্তে ॥
পূর্ব্বপুরুষ তোমার সে মান্ধাতাভূপতি ॥
লবণ মান্ধাতা মারি রাখিল খেয়াতি ॥
কত শত রাজগণে করিল সংহার ।
লবণে মারিয়া, রাম, কর প্রতিকার ॥
শুনিয়া মুনির কথা ভাই তিনজন ।
যোড়হাতে দাণ্ডাইল রামের সদন ॥
যোড়হাতে কহেন ঠাকুর শত্রুঘন ।
তুমি ভাই লক্ষ্মণ করেছ বহু রণ ॥
আমারে করহ আজ্ঞা মারিতে লবণ ।
লবণ মারিলে যশ ঘোষে ত্রিভুবন ॥
শত্রুঘ্নের বচনে রামের হৈল হাস ।
লবণে মারিতে রাম দিলেন আশ্বাস ॥
শত্রুঘন চলিলেন মারিতে লবণ ।
কহেন ভার্গবমুনি শুন শত্রুঘন ॥
কুড়িহাজার মত্তহস্তী মেরে খায় দিনে ।
লবণের সঙ্গে যুদ্ধে থেকো সাবধানে ॥
এত বলি ভার্গব গেলেন নিজ স্থান ।
ভাইগণ লয়ে রাম করে অনুমান ॥

রাম বলে শত্রুঘনে করিলাম রাজা ।
লবণে মারিয়া পাল মথুরার প্রজা ॥
লবণে মারিয়া তুমি হয়ে অধিকারী ।
প্রজার পালন কর মথুরানগরী ॥
শত্রুঘ্ন বলেন, প্রভু, কর অবধান ।
জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের নহে এ বিধান ॥
শ্রীরাম বলেন শুন ভাই শত্রুঘন ।
তোমাতে আমাতে নহে ভেদ কদাচন ॥
চলিলেন শত্রুঘন মারিতে লবণ ।
রামে প্রদক্ষিণ করি বন্দিলা চরণ ॥
বিষ্ণু-অস্ত্র ছিল তার অস্ত্রের প্রধান ।
লবণে মারিতে শত্রুঘনে দিলা দান ॥
একলক্ষ রথ নড়ে একলক্ষ হাতী ।
একলক্ষ ঘোড়া নড়ে পবনের গতি ॥
লবণ মারিতে বীর করিল সাজনি ।
শত্রুঘ্নের নিজ বাদ্য সাত অক্ষৌহিণী ॥
লিখনে না যায় ঠাট কতেক অপার ।
শুনি বাদ্যের শব্দ লাগে চমৎকার ॥
হইল আষাঢ় গত শ্রাবণ প্রবেশে ।
গেলেন যমুনাপার বাল্মীকির দেশে ॥
শত্রুঘন বন্দিলেন মুনির চরণ ।
শত্রুঘনে দেখে মুনি হরষিত মন ॥
শত্রুঘন বলে, মুনি, করি নিবেদন ।
রামের আদেশে যাই বধিতে লবণ ॥
কটকসহিত আমি আইনু এদেশে ।
অদ্য রাত্রি তবাশ্রমে বঞ্চিব হরিষে ॥
এতেক শুনিয়া মুনি হরষিত মন ।
ব্রহ্মমন্ত্র বেদধ্বনি করিলা তখন ॥
শত্রুঘনে করাইলা উত্তম ভোজন ।
জানিলা লবণ আজি হইবে নিধন ॥
মুনি আর শত্রুঘনে দোঁহে কয় কথা ।
হেনকালে দুইপুত্র প্রসবিলা সীতা ॥

শিষ্যগণ কহে আসি মুনির সাক্ষাতে ।
দুইপুত্র যমজ প্রসব কৈল সীতে ।।
মুনি বলে গোপনেতে রাখ শিষ্যগণ ।
এই কথা যেন নাহি শুনে শত্রুঘন ।।
মতান্তরে আছে ইহা শুন সর্ব্বজন ।
যমুনার তীরে মুনি করেন তর্পণ ।।
মুনিকে সংবাদ দেয় শিষ্য একজন ।
প্রসব করিলা সীতা যমজ নন্দন ।।
আনন্দিত হয়ে মুনি কহিলেন শিষ্যে ।
শিশুকে মাখাতে বল লব আর কুশে ।।
শুনিয়া মুনির কথা কহিল সীতায় ।
হরিষ হইয়া সীতা পুত্রেরে মাখায় ।।
স্নান করি মুনিবর আসিলেন ঘরে ।
হাসি কহে তব পুত্রে দেখাও আমারে ।।
লব আর কুশ নাম মুনিবর রাখে ।
লব মেখে লব হৈল কুশে কুশ রাখে ।।
দিনে দিনে বাড়ে দুই শিশু মহারথা ।
এখন কহিব যে লবণ বধ কথা ।।
এতেক বলিয়া মুনি আনন্দ হৃদয় ।
শত্রুঘন-মুনি দোঁহে কথাবার্ত্তা কয় ।।
কথোপকথনে দোঁহে বঞ্চিলা রজনী ।
প্রভাতে উঠিয়া যায় করিয়া সাজনি ।।
মুনিরে প্রনমি চলে শত্রুঘন বীর ।
ভার্গবের বাটী গেল যমুনার তীর ।।
মুনি প্রণমিয়া করে যুক্তি সমুচিত ।
মুনি বলে সুমন্ত্রণা করিব বিহিত ।।
লবণ নামেতে দৈত্য সংগ্রামে দুর্জ্জয় ।
কিরূপে মারিব তারে শত্রুঘন কয় ।।
মুনি বলে অতিশয় দুষ্ট সে লবণ ।
কহি হিত-উপদেশ শুন শত্রুঘন ।।
রজনীপ্রভাতে যাবে মৃগের উদ্দেশে ।
আপনা পাসরে বেটো ভক্ষণের আশে ।।
জাঠাগাছ থুয়ে যায় শিবপূজা ঘরে ।
ফিরে আসে নিবাসে দিবস দুপ্রহরে ।।
হিত-উপদেশ বলি শুনহ সত্বর ।
মৃগয়ার ছলে বেড়ি রহ তার ঘর ।।
কোনমতে জাঠাগাছ না পায় রাক্ষস ।
লবণ মারিতে তবে করহ সাহস ।।
জাঠা বন্দী করিতে না পার শত্রুঘন ।
না হবে তোমার শক্তি মারিতে লবণ ।।
শত্রুঘন পাইয়া এতেক উপদেশ ।
লবণে মারিতে যায় মথুরার দেশ ।।
প্রভাতে লবণ গেল করিতে আহার ।
শত্রুঘন সসৈন্যে যমুনা হৈল পার ।।
জাঠাগাছ ঘর গিয়া কটকেতে বেড়ে ।
মৃগভার স্কন্ধেতে লবণ আসে গড়ে ।।
সৈন্যেতে সকল পথ রহিল আগুলে ।
কুপিয়া লবণবীর মৃগভার ফেলে ।।
মধুদৈত্যপুত্র সেই মথুরাতে থানা ।
বিক্রমে নাহিক অন্ত রাবণ ভাগিনা ।।
লবণ বলে মিছা যুড়িস ধনুর্ব্বাণ ।
তোর মত কত বেটার লয়েছি পরাণ ।।
কহিছেন শত্রুঘন লবণ বচনে ।
কাটিব মস্তক তোর এই ধনুর্ব্বাণে ।।
মামা তোর বীর ছিল সেই অহঙ্কার ।
আমার ভ্রাতার হাতে তাহার সংহার ।।
সেই রামের ভাই আমি তোর তত্ত্বে ভুলি ।
তোর মাথা কাটিয়া রামেরে দিব ডালি ।।
খাইয়া মানুষ-গরু পূর্ণ হৈল কাল ।
তোরে মেরে মথুরার ঘুচাব জঞ্জাল ।।
লবণ বলিছে ক্রোধে শোন্ শত্রুঘন ।
তোরে মারি ঘুচাইব মায়ের ক্রন্দন ।।
মামারে মারিল তোর জ্যেষ্ঠসহোদর ।
মায়ের ক্রন্দন শুনি জ্বলি নিরন্তর ।।

সেই তাপে আজ তোর করি সর্ব্বনাশ।
মরিতে মানুষবেটা এলি মোর পাশ ।।
তোর বংশে যত রাজা তৃণহেন বাসি।
মান্ধাতারে পোড়ায়ে করেছি ভস্মরাশি ।।
শত্রুঘন কহেন এসেছি সেই কোপে।
তোর মাথা কাটিব রাখিবে কার বাপে ।।
মারিয়াছ সূর্য্যবংশে মান্ধাতা ভূপতি।
তার শোধে পাঠাইব যমের বসতি ।।
রামের কনিষ্ঠ আমি বীর অবতার।
তোরে মেরে শোধিব বংশের যত ধার ।।
শত্রুঘ্নের বচনেতে রুষিল লবণ।
মানুষ বেটার কথা সব কতক্ষণ ।।
হাতে হাত চাপি করে দন্ত কড়মড়ি।
শীঘ্রগতি চলিল আনিতে জাঠাবাড়ি ।।
লবণের মন বুঝি শত্রুঘন হাসে।
মনে কি করিস, বেটা, ফিরে যাবি বাসে ।।
শুনিয়া লবণবীর সিংহ যেন গর্জ্জে।
গর্জ্জন করিয়া আসে যুঝিবার সাজে ।।
গাছপাথর মারে লবণ সঘনে উপাড়ি।
শত্রুঘ্নের মাথে মারে দুহাতিয়া বাড়ি ।।
সেই ঘায়ে শত্রুঘন হৈল অচেতন।
ভয়ঙ্কর শব্দে লবণে করয়ে গর্জ্জন ।।
শত্রুঘন পড়ে সৈন্য করে হাহাকার।
ঘরে যায় লবণ লইয়া মৃগভার ।।
উঠিল যে শত্রুঘন সমরে দুর্জ্জয়।
ধনুক পাতিয়া যুঝে নাহি করে ভয় ।।
বিষ্ণুবাণ শত্রুঘন যুড়িল ধনুকে।
স্থাবর জঙ্গম মেরু দিক্‌পাল কাঁপে ।।
উল্কাপাত হয় যেন সেই বিষ্ণুবাণে।
প্রলয় হইল দেখি ভাবে দেবগণে ।।
আচম্বিতে সৃষ্টিনাশ হয় কি কারণ।
শুনিয়া প্রলয়শব্দ কাঁপে দেবগণ ।।
কোন যুগে এমত যে শব্দ নাহি শুনি।
হইল প্রলয় কি নিশ্চয় নাহি জানি ।।
ব্রহ্মা বলে, দেবগণ, না করিহ ডর।
লবণ বধিতে গর্জ্জে শত্রুঘ্নের শর ।।
সৃজিলেন বাণ বিষ্ণু আপনার হাতে।
মৈল মধুকৈটভাদি সেই বাণাঘাতে ।।
বাণের উপরে বিষ্ণু হন অধিষ্ঠান।
সেই বাণাঘাতে কারো নাহি রহে প্রাণ ।।
বিষ্ণুবাণ উপরেতে ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে।
সে বাণ নাহিক ব্যর্থ হয় কোনকালে ।।
বিষ্ণুবাণ শত্রুঘন এড়িল লবণে।
শূন্যমার্গে থাকিয়া দেখেন দেবগণে ।।
সিংহনাদ করি ডাকে বীর শত্রুঘন।
কোথা রলি ওরে বেটা দে রে আসি রণ ।।
বাণের গর্জ্জন শুনি লবণের ডর।
কহিতেছে শত্রুঘনে ত্রাসিত অন্তর ।।
ক্ষণেক ক্ষমহ মোরে খাই ভক্ষ্য-পানি।
বাহুড়িয়া আমি যুদ্ধ করিব এখনি ।।
মনে ভাবে জাঠা আছে দেবপূজাঘরে।
লইব সবার প্রাণ জাঠার প্রহারে ।।
তাহার মনের কথা বুঝি শত্রুঘন।
কহিতে লাগিল বীর করিয়া তর্জ্জন ।।
করিবি ভোজন তুই আমি উপবাসী।
উপবাসে দোঁহে যুদ্ধ আমি ভালবাসি ।।
এখন ভোজন আর উচিত না হয়।
ভোজন করিবি বেটা গিয়া যমালয় ।।
কুপিল লবণবীর দুর্জ্জয় প্রতাপ।
আহার করিতে নাহি দিলি মহাপাপ ।।
রঘুবংশে জন্ম তোর সর্ব্বলোকে জানে।
রঘুকুল উজ্জ্বল করিলি এতদিনে ।।
শত্রুঘ্নেরে মারিবারে আইল লবণ।
সন্ধান পুরিয়া বাণ এড়ে শত্রুঘন ।।

মহাশব্দে যায় বাণ জ্বলন্ত আগুনি ।
লবণের বুকে বিন্ধি সান্ধায় মেদিনী ॥
বিষ্ণুবাণ বুকে ঠেকি পড়িল লবণ ।
দেবতার জাঠাগাছ গেল ততক্ষণ ॥
শক্তিমাণ জাঠাগাছ গেল অন্তরীক্ষে ।
পড়িল লবণবীর সর্ব্বলোকে দেখে ॥
জয় জয় শব্দ করে যত দেবগণ ।
শত্রুঘ্ন উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে বিদ্যাধরী ।
আনন্দে হইল মগ্ন যত সুরপুরী ॥
শত্রুঘ্নেরে ডাকি ব্রহ্মা কহিলা তখন ।
বর মাগ মহাবীর, যাহা লয় মন ॥
নিজ বাহুবলে বীর লবণে মারিলে ।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালের শংকা নিবারিলে ॥
যে বর মাগিবে তুমি দেবতার স্থানে ।
সে বর তোমারে দিবে সর্ব্বদেবগণে ॥
কহিছেন রামানুজ যুড়ি দুই পাণি ।
মথুরাতে বসতি হউক পদ্মযোনি ॥
'তথাস্তু' বলিয়া বর দিল ততক্ষণ ।
বর দিয়া স্বর্গে গেল যত দেবগণ ॥
বসতি করাতে বীর করি সম্বিধান ।
করিল মথুরাপুরী অদ্ভুতনির্মাণ ॥
বাড়ীঘর নির্ম্মাইল আর সরোবর ।
মৎস্য আদি নির্ম্মাইল নানাজলচর ॥
বন-উপবন ভাঙ্গি করিল বসতি ।
বসাইল প্রজাগণ নর নানাজাতি ॥
বৃক্ষোপরে পক্ষী সব করে মধুধ্বনি ।
মুনিমন হরে হেরে ময়ূর নাচনি ॥
রাজবাটী নির্ম্মাইল দেখিতে সুন্দর ।
শত্রুঘ্ন রহিলেন তাহার ভিতর ॥
নগরের মধ্যে যত সাধুলোক বৈসে ।
অন্য দেশ হৈতে লোক মথুরায় আসে ॥
পদ্মকোটি ঘর কৈল সুবর্ণে গঠন ।
ক্ষত্রবৈশ্যশূদ্র আসি বসিল ব্রাহ্মণ ॥
দ্বাদশ বছর থাকি মথুরানগরে ।
প্রজারে পালেন সদা হরিষ-অন্তরে ॥
মথুরানগরী সব আনিয়া শাসনে ।
অযোধ্যায় চলিলেন রামসম্ভাষণে ॥
কটক সহিত গেলা বাল্মীকির দেশ ।
সৈন্যসহ তপোবনে করিলা প্রবেশ ॥
শত্রুঘ্নে দেখিয়া মুনি হরষিত মন ।
শত্রুঘন কৈল তাঁর চরণবন্দন ॥
মুনি বলে, মহাবীর, তুমি শত্রুঘন ।
লবণ মারিয়া রক্ষা কৈলা ত্রিভুবন ॥
অনেক কষ্টেতে রাম বধিল রাবণে ।
লবণে মারিলে তুমি দিনেকের রণে ॥
মনুষ্য খাইয়া বেটা দেশ কৈল বন ।
লবণে মারিয়া কৈলে নগর পত্তন ॥
আলিঙ্গন দিলা মুনি পরম-আদরে ।
রাখিলা সকল সৈন্য অতিথি-আচারে ॥
সুগন্ধি কোমল অন্ন পায়স পিষ্টক ।
নানা-উপহারে ভুঞ্জে সকল কটক ॥
সোনার পালঙ্কে বীর করিল শয়ন ।
মুনির বাটীতে শুনে গীত রামায়ণ ॥
বীণার স্বরেতে নাদ হৈল আচম্বিত ।
মধুস্বরে গান হয় রামায়ণ গীত ॥
দেশ ছাড়ি সীতা আর শ্রীরামলক্ষ্মণ ।
গাছের বাকল পরি প্রবেশিলা বন ॥
শ্রীরাম যাইতে বনে কান্দে সর্ব্বলোক ।
দশরথ মরিলেন পেয়ে পুত্রশোক ॥
রাজার মরণে যত রাজরাণীগণ ।
যেমতে করিলা তার শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ॥
রাম বনে ভরত সে মাতুলের পাড়া ।
চারি পুত্র সত্ত্বে রাজা হৈল বাসি মড়া ॥

চৌদ্দবর্ষ রহে রাম পঞ্চবটীবনে ।
সীতা হরি লইলেক লঙ্কার রাবণে ।।
সবংশে রাবণে রাম করিল সংহার ।
বহুযুদ্ধে করিলেন সীতার উদ্ধার ।।
সুমধুর স্বরে গীত করিলা যখন ।
সর্ব্বলোক মুগ্ধ হল শুনি রামায়ণ ।।
দুইশিশু গীত গায় বাজাইয়া বীণা ।
সর্বলোকে শুনে যেন অমৃতের কণা ।।
শত্রুঘন চক্ষের জল নারেন রাখিতে ।
দুইচক্ষে বারিধারা পোছেন দুহাতে ।।
শ্রীরামের দুঃখ শুনে শত্রুঘ্ন বিকল ।
মোহ সম্বরিতে নারে চক্ষে পড়ে জল ।।
পাত্রমিত্র বলে সব শুন মহামুনি ।
এমন অমৃতগান কভু নাহি শুনি ।।
চারিপ্রহর রজনী মধুরগীত শুনে ।
সর্ব্বলোক বঞ্চিলাম নিশিজাগরণে ।।
শত্রুঘন বলেন, মুনি, করি নিবেদন ।
কোথাকার দুইশিশু গায় রামায়ণ ।।
শুনিলাম রামায়ণ মধুর সঙ্গীত ।
কহ মুনি এই গীত কাহার রচিত ।।
মুনি বলেন জিজ্ঞাসিলে বার্ত্তা শত্রুঘন ।
দুইশিশু গান করে শিষ্য দুইজন ।।
রচিয়াছি রামায়ণ আমি সপ্তকাণ্ড ।
শুনে লোক মোক্ষ পায় অমৃতের ভাণ্ড ।।
কহিতে এ কথাবার্ত্তা প্রভাতা রজনী ।
প্রভাতে চলিলা বীর বন্দি মহামুনি ।।
শত্রুঘ্ন সসৈন্যে যমুনা হৈলা পার ।
শত্রুঘ্নের সঙ্গে বাদ্য বাজিছে অপার ।।
তিনদিনে গেল বীর অযোধ্যা নগর ।
যোড়হাতে রহিলেন রামের গোচর ।।
শত্রুঘ্ন কৈল রামের চরণ বন্দন ।
তোমার প্রসাদে, প্রভু, মারিনু লবণ ।।
মারিনু লবণে যুদ্ধ করিয়া বিশাল ।
মথুরাতে বসাইনু প্রজা চালেচাল ।।
বারবর্ষ না দেখিয়া তোমার চরণ ।
ধরিতে না পারি প্রাণ হৈল উচাটন ।।
তব অদর্শনে প্রভু জীবনে কি কার্য্য ।
কি করিবে সুখভোগ মথুরার রাজ্য ।।
শত্রুঘ্নে শ্রীরাম তবে দিলা আলিঙ্গন ।
রাম বলে, ভাই, তব মধুরবচন ।।
সবার কনিষ্ঠভাই গুণের সাগর ।
তোমারে দেখিলে দুঃখ পাসরি বিস্তর ।।
পঞ্চদিন চারিভাই বঞ্চিব হরিষে ।
পঞ্চদিন পরে যেও মথুরার দেশে ।।
শ্রীরামলক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘন ।
চারিভাই একত্রে করিল সম্ভাষণ ।।
চারিভাই পঞ্চদিন একত্রে রহিলা ।
শত্রুঘ্নেরে মথুরায় বিদায় করিলা ।।
মথুরায় হইলেন শত্রুঘন রাজা ।
অযোধ্যায় শ্রীরাম পালেন সব প্রজা ।।
শ্রীরামের রাজ্যে লোক সর্ব্বসুখে বৈসে।
উত্তরাকাণ্ডে গাইল কবি কৃত্তিবাসে ।।

শ্রীরামকর্ত্তৃক শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদে অকালমৃত বিপ্রপুত্রের জীবনলাভ

অযোধ্যায় রাজা রাম ধর্ম্মেতে তৎপর ।
অকালমরণ নাই রাজ্যের ভিতর ।।
অকস্মাৎ এক বিপ্র আইল কান্দিয়া ।
মৃত এক শিশুপুত্র কোলেতে করিয়া ।।
পঞ্চবৎসরের মৃতপুত্র তার কোলে ।
শ্রীরামের দ্বারে আসি কাঁদে উচ্চরোলে ।।
ধর্ম্মের সংসার মোর পাপ নাহি করি ।
অকস্মাৎ পুত্রশোকে কেন পুড়ে মরি ।।

না করেন রাজ্যচর্চ্চা রাম রঘুবর ।
ব্রহ্মশাপ দিব আজি রামের উপর ॥
কি পাপে মরিল পুত্র কিছুই না জানি ।
পুত্রকোলে করি কান্দে ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী ॥
বৃথা গর্ভে ধরি পুত্র পঞ্চবর্ষ পুষি ।
অকালে মরিল পুত্র রামরাজ্যে বসি ॥
পিতামাতা রাখি পুত্র ছাড়ি গেল কোথা ।
কোন দোষে মৈল পুত্র প্রাণে দিয়া ব্যথা ॥
অধর্ম্মীর রাজ্যে হয় দুর্ভিক্ষ মড়ক ।
কর্ম্মদোষে সেই রাজা ভুঞ্জয়ে নরক ॥
অকালেতে মরে পুত্র শ্রীরামের রাজ্যে ।
নহে অন্য দেশে যাব এই রাজ্য ত্যজে ॥
এত বলি স্ত্রীপুরুষে ভাসে অশ্রুনীরে ।
লক্ষ্মণ সত্বরে যান রামের গোচরে ॥
অকস্মাৎ প্রমাদ পড়িল রঘুমণি ।
মৃতপুত্র লয়ে আইল ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী ॥
বয়সেতে বৃদ্ধ দোঁহে পুত্র নাহি আর ।
ক্রন্দনে ব্যাকুল তারা করে রাজদ্বার ॥
দ্বিজ বলে পাপ নাহি আমার শরীরে ।
তবে অকালেতে মোর পুত্র কেন মরে ॥
এত বলি স্ত্রীপুরুষে করয়ে রোদন ।
শ্রীরাম শুনিয়া হইল বিরসবদন ॥
ত্রাস পান রঘুনাথ শুনিয়া বচন ।
অকালে দ্বিজের পুত্র মরে কি কারণ ॥
পাত্রমিত্র সভাসদ করে হাহাকার ।
রামের অজ্ঞাতে সব হৈল আগুসার ॥
আইল বশিষ্ঠ মুনি কুলপুরোহিত ।
কশ্যপনারদ-আদি হৈল উপনীত ॥
পাত্রমিত্র লয়ে রাম বসিলা দেয়ানে ।
ব্রাহ্মণের কথা রাম কহে সভাস্থানে ॥
তোমা সবে লয়ে আমি করি রাজকাজ ।
অকালে ব্রাহ্মণপুত্র মরে পাই লাজ ॥
শুনিয়া রামের কথা সকলে নীরব ।
শ্রীরামের পানে চাহি কহেন নারদ ॥
মুনি বলে, রঘুনাথ, শাস্ত্রের বিচার ।
সত্যযুগে তপস্যায় দ্বিজ-অধিকার ॥
ত্রেতাযুগে তপস্যায় ক্ষত্র-অধিকার ।
দ্বাপরেতে বৈশ্য-তপ শাস্ত্রের বিচার ॥
কলিযুগে তপস্যা করিবে শূদ্র জাতি ।
তপস্যার নীতি এই শুন রঘুপতি ॥
অকালে অনধিকারে শূদ্র তপ করে ।
সেই রাজ্যে অকালেতে দ্বিজপুত্র মরে ॥
কলিকালে শূদ্র আর পতিহীনা নারী ।
তপস্যা করিলে সৃষ্টি নাশিবারে পারি ॥
অকালে করিলে তপ ঘটায় উৎপাত ।
অকালে মরণরীতি শুন রঘুনাথ ॥
না মরে তোমার পাপে দ্বিজের কুমার ।
তপস্যা করিছে কোথা শূদ্র দুরাচার ॥
এই হেতু মিথ্যা দোষী করিয়া তোমাকে ।
ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী দ্বারে কান্দে পুত্রশোকে ॥
নারদের বচন রামের লয় মনে ।
ডাক দিয়া সভামধ্যে আনেন লক্ষ্মণে ॥
পাত্রমিত্র লয়ে, ভাই, বৈসহ বিচারে ।
প্রিয়বাক্যে ব্রাহ্মণেরে রাখহ দুয়ারে ॥
যাবৎ না আসি আমি করিয়া বিচার ।
তাবৎ রাখিহ দ্বিজে না ছাড়িহ দ্বার ॥
নারায়ণতৈলে ফেলি রাখ দ্বিজসুতে ।
দেহ তার নষ্ট যেন না হয় কোনমতে ॥
এত বলি কৈল রাম রথে আরোহণ ।
পশ্চিমদিকেতে রাম করিল গমন ॥
পশ্চিমের যত দেশ করিয়া বিচার ।
উত্তরদিকেতে রাম কৈলা আগুসার ॥
উত্তরের যত দেশ করি অন্বেষণ ।
পূর্ব্বদিকে রঘুনাথ করেন গমন ॥

পূর্ব্বদিক বিচারিয়া গেলেন দক্ষিণে।
এক শূদ্র তপ করে মহাঘোর বনে ।।
করয়ে কঠোর তপ বড়ই দুষ্কর ।
অধোমুখে উর্দ্ধপদে আছে নিরন্তর ।।
বিপরীত অগ্নিকুণ্ড জ্বলিছে সম্মুখে ।
গ্রাসিছে বহ্নির ধূম সূর্য্যের আলোকে ।।
দেখিয়া কঠোর তপ শ্রীরামের ত্রাস ।
'ধন্য ধন্য' বলি রাম যান তার পাশ ।।
জিজ্ঞাসা করেন তারে কমললোচন ।
কোন্ জাতি তপ কর কোন্ প্রয়োজন ।।
তপস্বী বলেন আমি হই শূদ্রজাতি ।
শম্বুক আমার নাম শুন মহামতি ।।
করিব কঠোর তপ দুর্লভ সংসারে ।
তপস্যার ফলে যাব বৈকুণ্ঠ নগরে ।।
তপস্বীর বাক্যে কোপে কাঁপে রামতুণ্ড ।
খড়্গ হাতে কাটিলেক তপস্বীর মুণ্ড।।
'সাধু সাধু' শব্দ করে যত দেবগণ ।
রামের উপরে করে পুষ্প বরিষণ ।।
ব্রহ্মা বলিলেন, রাম, কৈলে বড় কাজ ।
শূদ্রে হয়ে তপ করে পাই বড় লাজ ।।
রামে তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা কহেন তখন ।
মনোনীত বর মাগি লহ যে এখন ।।
শ্রীরাম বলেন যদি দিবে বরদান ।
তব বরে জীয়ে যেন ব্রাহ্মণসন্তান ।।
ব্রহ্মা বলে এ বর না চাহ রঘুমণি ।
শূদ্র কাটা গেল দ্বিজ বাঁচিল আপনি ।।
আপনা বিস্মৃত তুমি দেব নারায়ণ ।
মারিয়া বাঁচাতে পার এ তিনভুবন ।।
দুষ্টে সৃষ্টি নাশ কর নিমেষে সৃজন ।
তোমার আশ্চর্য্য মায়া বুঝে কোন্ জন।।
এত বলি বিরিঞ্চি করেন অন্তর্দ্ধান ।
শুনিয়া শ্রীরাম অতি হরষিত প্রাণ ।।
এখানে বাঁচিয়া উঠে দ্বিজের কুমার ।
দেখি সভাসদ্‌লোকে লাগে চমৎকার ।।
ভরতলক্ষ্মণে কহি দ্বিজ গেল ঘর ।
রঘুনাথে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিস্তর ।।
হইল রামের হাতে তপস্বী বিনাশ ।
স্বর্ণবিমানেতে চড়ি গেল স্বর্গবাস ।।
ব্রহ্মার বচন শুনি শ্রীরামের হাস ।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ।।

গৃধিনী ও পেচকের কলহ

অযোধ্যাতে রঘুনাথ যান শীঘ্রগতি ।
পাত্রমিত্র রাজ্যখণ্ড রামের সংহতি ।।
মহামুনি অগস্ত্যের বাটী দক্ষিণেতে ।
শ্রীরাম বলেন সবে চল সেই পথে ।।
অগস্ত্যের বাটী রাম যান দিব্যরথে ।
পক্ষীর কোন্দল রাম শুনিলেন পথে ।।
গৃধিনীপেচকে দ্বন্দ্ব বাসার লাগিয়া ।
আসিয়াছে বহু পক্ষী দুই পক্ষ হৈয়া ।।
অনেক পক্ষীর ঘর বনের ভিতর ।
নানাজাতি পক্ষী সব আছে একত্তর ।।
সারসসারসী ডাকে কাক কাদাখোঁচা ।
গৃধিনী কোকিল চিল আর কালপেঁচা।।
সারীশুক কাকাতুয়া চড়া মৎসরঙ্ক ।
খঞ্জনখঞ্জনী ফিঙ্গে ধকড়িয়া কঙ্ক ।।
বাউই পাউই শিখী পক্ষী হরিতাল ।
পায়রা প্রবাজ আর শিকরা সঞ্চাল ।।
বকাবকী বাদুড়বাদুড়ী নুরি টিয়া ।
ঝাঁকে ঝাঁকে চামচিকে কাষ্ঠঠোকরিয়া ।।
জলেস্থলে আছিল যেখানে যত পক্ষ ।
করিতেছে মহাদ্বন্দ্ব হৈয়া দুই পক্ষ ।।
গৃধিনী কহিছে পেঁচা, ছাড় মোর বাসা।
পরঘরে রহিবে কেমনে কর আশা ।।

পেঁচা বলে কোথা হৈতে আইলি গৃধিনী।
এতকাল বাসা মোর তোরে নাহি চিনি ॥
দুজনে কোন্দল করে আর মারামারি।
শ্রীরামে দেখিয়া সবে কহে ধীরি ধীরি ॥
গৃধিনী বলিছে রাম, বর অবধান।
বিচারে পণ্ডিত নাহি তোমার সমান ॥
যুদ্ধেতে জিনিতে তুমি পার সুরপতি।
শশধর জিনি তব শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি ॥
দিবাকর যিনি তেজ বিশাল তোমার।
সাগর জিনিয়া বুদ্ধি গভীর অপার ॥
পবন জিনিয়া তব ত্বরিত গমন।
অমৃত জিনিয়া তব মধুর বচন ॥
পৃথিবী পালিতে তুমি দয়ালশরীর।
গুণের সাগর তুমি রণে মহাবীর ॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালে তোমারে করে পূজা।
ত্রিভুবনমধ্যে, রাম, তুমি মহারাজা ॥
রজোগুণ ধর তুমি সৃষ্টির কারণ।
সত্ত্বগুণে সবাকার করহ পালন ॥
সংসার নাশিতে তুমি তমগুণ ধর।
আত্মনিবেদন করি তোমার গোচর ॥
সৃজিলাম বাসা আমি অনেক শ্রমেতে।
সেই বাসা কাড়ি লয় পেচক বলেতে ॥
পেঁচা বলে, রাম, তুমি বিষ্ণু-অবতার।
রজোগুণে সৃষ্টি কৈলে সকল সংসার ॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবারাতি।
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি পরম শীতল।
বিপক্ষ নাশিতে তুমি জ্বলন্ত অনল ॥
আদ্য-অন্ত-মধ্য তুমি নির্দ্ধনের ধন।
সেবক বৎসল তুমি দেব নারায়ণ ॥
অন্ধের নয়ন তুমি দুর্ব্বলের বল।
অপরাধী হই যদি দেহ প্রতিফল ॥

সভা কৈল রঘুনাথ বসি বৃক্ষতলে।
পাত্রমিত্রসভাসদ্ বসিল সকলে ॥
বশিষ্ঠনারদ আদি এল মুনিগণ।
সুমন্ত্র কশ্যপমুনি এল দুইজন ॥
শ্রীরাম কহেন কথা সভাসদ্ শুনে।
হেনকালে দেবগণ আইসে সেখানে ॥
গৃধিনীরে কন রাম সভার ভিতর।
কতকাল হৈতে তোর এই বাসঘর ॥
গৃধিনী কহিছে শুন বচন আমার।
মহাপ্রলয়েতে যবে সব নিরাকার ॥
বিষ্ণুনাভিপদ্মমূলে ব্রহ্মার উৎপত্তি।
দেবদানব সৃজিলা বিধি নানাজাতি ॥
তখন অবধি বাসা এ ডালে আমার।
কোন্ লাজে পেঁচা বেটা করে অধিকার ॥
ঈষৎ হাসেন রাম গৃধিনী বচনে।
পেঁচারে জিজ্ঞাসে রাম বিচার বিধানে ॥
পেঁচা বলে নিবেদন শুন রঘুবর।
বৃক্ষের উৎপত্তি হৈল ধরণী উপর ॥
তার পরে উৎপত্তি হৈল যত ডাল।
এইরূপে বনমধ্যে যায় কত কাল ॥
উড়িতে অশক্ত হৈনু হৈল বৃদ্ধদশা।
তার পরে এই ডালে করিলাম বাসা ॥
রাম বলে, সভাখণ্ড, করহ বিচার।
মিথ্যা দ্বন্দ্ব করে কেন এই বাসা কার ॥
সভাতে বসিয়া যেবা সত্য নাহি কয়।
কোটিকল্প বর্ষ সে নরকমাঝে রয় ॥
এক এক বৎসরে বন্ধন না খসে।
তিন কুল নষ্ট হয় মিথ্যাসাক্ষী দোষে ॥
শ্রীরামের বচনেতে কহে সভাখণ্ড।
গৃধিনীর উপরে উচিত রাজদণ্ড ॥
চারিবেদ সর্ব্বশাস্ত্র তোমার গোচর।
সাক্ষাতে শুনিলে, প্রভু, গৃধিনী-উত্তর ॥

প্রলয় হইল যবে সৃষ্টির সংহারে।
স্থাবরজঙ্গম কিছু না ছিল সংসারে ॥
ত্রিভুবন শূন্য যবে একা নিরঞ্জন।
সেই নিরঞ্জন হৈলা সৃষ্টির কারণ ॥
জলেতে পৃথিবী ছিল করিয়া উদ্ধার।
পৃথিবী সৃজিয়া কৈলা জীবের সঞ্চার ॥
বিষ্ণুনাভিপদ্মে হৈল ব্রহ্মার উৎপত্তি।
দেবাদি নরাদি সৃষ্টি কৈলা নানাজাতি ॥
আগে জীব সৃজিলেন বৃক্ষ হৈল পিছে।
কিরূপে গৃধিনী আসিবাসাকৈলগাছে ॥
গৃধিনী অন্যায় বলে সভার ভিতর।
রাজদণ্ড অর্শে, প্রভু, গৃধিনী উপর ॥
সভামধ্যে মিথ্যা কহে নাহি ধর্ম্মভয়।
গৃধিনীর প্রাণদণ্ড উপযুক্ত হয় ॥
দেবগণ কহেন রামে করি নিবেদন।
স্বাভাবিক গৃধিণী যে নহে এই জন ॥
রয়েছে গৃধিনীপক্ষী হয়ে ব্রহ্মশাপে।
শাপমুক্ত কর পক্ষী না মারিহ কোপে ॥
শ্রীরাম বলেন কহ এরা কোন্ জন।
ব্রহ্মশাপ ভোগ করে কিসের কারণ ॥
দেবগণ কহে এই ছিল যে রাজন্।
প্রত্যহ করাত লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
দৈবে এক বিপ্র চুল পাইল অন্নেতে।
নৃপতিরে শাপ দ্বিজ দিলেক ক্রোধেতে ॥
ব্রাহ্মণেরে মাংস দিয়া নষ্ট কৈলে ব্রত।
গৃধিনী হইয়া বণ খাও মাংস রক্ত ॥
শাপ শুনি ভূপতির বিরস বদন।
দ্বিজের চরণে ধরি করিলা ক্রন্দন ॥
শাপবিমোচন, প্রভু, করহ এখন।
কত দিনে হবে মোর শাপবিমোচন ॥
তবে তুষ্ট হয়ে বিপ্র কহিতে লাগিল।
'শাপে মুক্ত হবে' বলি আশ্বাস করিল ॥
রঘুবংশে জন্মিবেন বিষ্ণু যেই কালে।
শাপে মুক্ত হবে তুমি তাঁরে পরশিলে ॥
ব্রহ্মশাপে পক্ষিযোনি হইল ভূপতি।
গৃধিনীবৃত্তান্ত এই শুন রঘুপতি ॥
বহু দুঃখ পায় রাজা এতেক দুর্গতি।
তুমি পরশিলে হয় তাহার সদ্গতি ॥
দেবতার বাক্য শুনি রামরঘুমণি।
গৃধিনীর দেহ স্পর্শ করেন তখনি ॥
পক্ষিদেহ পরিহরি নিজ দেহ ধরি।
বিমানেতে ভূপতি চলিল স্বর্গপুরী ॥
দিব্যরথে চড়ি রাজা গেল স্বর্গবাস।
উত্তরাকাণ্ড গাইল কবি কৃত্তিবাস ॥

মৃতাহারী দৈত্যরাজের কথা

শ্রীরামেরে সম্ভাষিয়া যত দেবগণ।
সকলে চলিয়া গেল অমরভুবন ॥
সৈন্যসহ রামচন্দ্র যান ততক্ষণ।
অগস্ত্যের বাটী গিয়া দিলা দরশন ॥
অগস্ত্য-চরণ রাম করেন বন্দন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিলা মুনি বসিতে আসন ॥
যেই অলঙ্কার বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
রত্ন-অলঙ্কার সেই রামে দিলা দান ॥
রাম বলেন শুন মুনি না হয় বিধান।
ক্ষত্র হয়ে নাহি লয় ব্রাহ্মণের দান ॥
অগস্ত্য বলেন, রাম, শুন মোর বাণী।
অবধান কর কহি ইহার কাহিনী ॥
সত্যযুগে বিধি এই ব্রাহ্মণের পূজা।
ব্রাহ্মণের পূজা করে যত ক্ষত্ররাজা ॥
স্বর্গে ইন্দ্ররাজ করে দেবের পালন।
পৃথিবীতে ক্ষত্ররাজা পালেন ব্রাহ্মণ ॥
লোকপালস্থানে ক্ষত্র নামে ক্ষেত্ররাজা।
লয়ে গেল যত্ন করে ব্রাহ্মণের পূজা' ॥

দেবরাজ বাঞ্ছয়ে ক্ষত্রিয়ে দিতে দান।
লোকপালমধ্যে, রামি, তুমি সে প্রধান ॥
ক্ষত্রকুলে জন্ম তব বিষ্ণু-অবতার।
তোমারে করিতে দান উচিত আমার ॥
তোমার শরীর যোগ্য এই অলঙ্কার।
অলঙ্কার দিয়া মুনি কৈলা পুরস্কার ॥
শ্রীরাম বলেন মুনি, জিজ্ঞাসি কারণ।
কোথায় পাইলে তুমি এই আভরণ ॥
হেন অলঙ্কার নাহি সংসারভিতরে।
কোথা পেলে এই রত্ন বলহ আমারে ॥
অগস্ত্য বলেন তবে শুন রঘুবর।
সত্যযুগে তপ করি বনের ভিতর ॥
একেশ্বর তপ করি হরিষ-অন্তর।
অঘোর কাননে একা থাকি নিরন্তর ॥
সে বনের গুণ কত কহিতে না পারি।
চারিক্রোশ পথ যুড়ি আছে এক পুরী ॥
পুরীখান দেখি তথা অতিমনোহর।
অনাহারে তপ আমি করি নিরন্তর ॥
মনোহর সরোবর বনের ভিতরে।
নিত্য নিত্য স্নান করি সেই সরোবরে ॥
একদিন প্রত্যুষেতে করি গাত্রোত্থান।
সরোবরতীরে যাই করিবারে স্নান ॥
আশ্চর্য্য দেখিনু অতি গিয়া সেই ঘাটে।
শব এক পড়ে আছে সরোবর তটে ॥
মড়া হয়ে ক্ষয় নাহি অতি মনোহর।
বিষ্ণু-অধিষ্ঠান যেন পরম সুন্দর ॥
চন্দ্রের-কিরণপ্রায় সূর্য্যহেন জ্যোতি।
অতিমনোহর মড়া সুন্দরমুরতি ॥
হেন জন নাহি তথা জিজ্ঞাসি কারণ।
মড়ারূপ দেখিয়া বিস্ময় হৈল মন ॥
সেই মড়ারূপ আমি করি নিরীক্ষণ।
হেনকালে অমর আইল একজন ॥

সুবর্ণের রথখান বহে রাজহংসে।
সাতশত দেবকন্যা পুরুষের পাশে ॥
কেহ নাচে কেহ গায় বাজে কত বাঁশী।
আইলেন অবনীতে অমরানিবাসী ॥
সেই সরোবরজলে অঙ্গ পাখালিল।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া অঙ্গশোভা কৈল ॥
সেই মড়া লয়ে তিনি করিয়া ভক্ষণ।
হরষিতে গিয়া রথে কৈলা আরোহণ ॥
রথে আরোহণ করি স্বর্গবাসে যায়।
হেনকালে যোড়হাতে জিজ্ঞাসিনু তায় ॥
দেবরথে চড়ি আছ দেব-অবতার।
দেবতা হইয়া মড়া করিলে আহার ॥
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ দেখি শুনি।
কহিতে লাগিল মোরে করি যোড়পাণি ॥
স্বর্গরাজপুত্র আমি দৈত্য নাম ধরি।
পিতাবিদ্যমানে আমি স্বর্গে রাজ্য করি ॥
স্বর্গবাসে গেল পিতা কতদিন পরে।
রাজ্যভার দিনু আমি কনিষ্ঠ সোদরে ॥
নিরাহারে তপ আমি করিনু বিস্তর।
স্বর্গপ্রাপ্তি হৈল মোর ত্যজি কলেবর ॥
ক্ষুধাতৃষ্ণা হৈলে আমি সহিতে না পারি
জিজ্ঞাসিনু বিরিঞ্চিরে করযোড় করি ॥
স্বর্গপুরে আইলাম তপস্যার ফলে।
ক্ষুধানলে সতত আমার অঙ্গ জ্বলে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন ভুঞ্জ আপনার ফল।
ক্ষুধার্ত্তেরে নাহি তুমি দিলে অন্নজল ॥
যাহা দেয় তাহা পায় বেদের লিখন।
আপনি ভাবিয়া, রাজা, বুঝহ এখন ॥
আপনা করিলে তুষ্ট ভোজনের আশে।
নিজ অঙ্গ খাও তুমি মনের হরিষে ॥
না পচিবে না গলিবে মধুর সুস্বাদ।
সে শরীর খাইলে ঘুচিবে অবসাদ ॥

ব্রহ্মার মুখেতে শুনি এতেক বচন ।
এতেক দুর্গতি মোর খণ্ডন-কারণ ।।
কাতরে কহিনু ধরি ব্রহ্মার চরণে ।
এই দুঃখ অবসান হবে কতদিনে ।।
ব্রহ্মা বলিলেন কথা শুনহ রাজন ।
যেমতে হইবে তব পাপ বিমোচন ।।
তপ করিতে যাবে অগস্ত্যমুনিবর ।
নিদাঘেতে করিবেন তপ একেশ্বর ।।
তোমার সহিত তাঁর হবে দরশন ।
তাঁরে দান দিলে তব পাপবিমোচন ।।
বহু তপ করিয়াছ না করিলে দান ।
অগস্ত্যেরে দান দিলে হবে পরিত্রাণ ।।
সে অবধি মড়ার শরীর খাই আমি ।
এ হেন পাপেতে যদি রক্ষা কর তুমি ।।
চারিযুগ মড়া খাই বিধির বচনে ।
আজি শুভদিন মম তব দরশনে ।।
তোমা বিনা আমার নাহিক অন্য গতি ।
তুমি ত্রাণ করিলে আমার অব্যাহতি ।।
কৃপা কর, মুনিবর, করি পরিহার ।
তুমি দান নিলে হয় আমার উদ্ধার ।।
স্তুতিবশে দান আমি করিনু গ্রহণ ।
অঙ্গ হৈতে খসাইয়া দিল আভরণ ।।
তার দান লইলাম এই সে কারণ ।
মৃতদেহ নষ্ট তার হইল তখন ।।
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি ।
তোমারে এ দান দিলে আমার মুকতি ।।
মোরে দান দিয়া রাজা পায় পরিত্রাণ ।
মম পরিত্রাণ হয় তুমি নিলে দান ।।
উপনীত হৈল সন্ধ্যা বেলা-অবসানে ।
দুইজনে করিলেন সন্ধ্যা সেইস্থানে ।।
মিষ্টান্নভোজন মুনি করাইলা রামে ।
সেই দিন বঞ্চে রাম মুনির আশ্রমে ।।
রজনীপ্রভাতে রাম মাগিয়া মেলানি ।
মুনিরে প্রণমি কহে সুমধুর বাণী ।।
তোমা দরশনে মোর সফল জীবন ।
আর বার দেখি যেন তোমার চরণ ।।
মুনি বলে, রাম, তব মধুরবচন ।
তোমার বচনে তুষ্ট যত দেবগণ ।।
অনাথের নাথ তুমি ত্রিদশের পতি ।
তোমা-দরশনে বড় পাইলাম প্রীতি ।।
মুনির চরণে নরম নমস্কার করি ।
উপনীত হৈল গিয়া অযোধ্যানগরী ।।
শুনিয়া রামের গুণ সিদ্ধ অভিলাষ ।
উত্তরাকাণ্ড গাইল কবি কৃত্তিবাস ।।

শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সংকল্প

সভা করি বসিলেন কমললোচন ।
ভরতশত্রুঘ্ন আসি বন্দিলা চরণ ।।
রাম বলে ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন ।
একমনে শুন সবে আমার বচন ।।
ব্রহ্মবধ করিয়া করেছি মহাপাপ ।
তেকারণে পাই আমি বড় মনস্তাপ ।।
রাজসূয়যজ্ঞ আমি করিব এখন ।
তাহার উদ্যোগ কর ভাই তিনজন ।।
এত শুনি তিনভাই করে হাহাকার ।
রাজসূয় যজ্ঞে হয় সবংশে সংহার ।।
পূর্বে কৈল রাজসূয় রাজা শশধর ।
গৃহপক্ষী পুড়ি লোক মরিল বিস্তর ।।
রাজসূয়যজ্ঞ কৈল দেবতা বরুণ ।
মরিল মকরমৎস্য পুড়ি তেকারণ ।।
রাজসূয়যজ্ঞ কৈল দেব পুরন্দর ।
সুরাসুরযুদ্ধ তাহে হইল বিস্তর ।।
সগরনৃপতি পূর্বে বংশেতে তোমার ।
পৃথিবীর রাজা ছিল গুণে বশ যার ।।

রাজসূয়যজ্ঞ কৈল সেই মহাশয় ।
বংশ মজাইল শেষে আপনা সংশয় ।।
ভরতের কথা রামে লাগে চমৎকার ।
বিনয়ে রামের প্রতি কহে আর বার ।।
হরিশ্চন্দ্র নামে রাজা তব পূর্ব্ববংশে ।
রাজসূয়যজ্ঞ করি দুঃখ পেল শেষে ।।
হরিশ্চন্দ্ররাজা দান করিয়া পৃথিবী ।
পুত্র-আদি বিক্রয় করিল মহাদেবী ।।
রাজ্য ছাড়ি হরিশ্চন্দ্র যায় বারাণসী ।
দক্ষিণা চাহিল তারে বিশ্বামিত্রঋষি ।।
দণ্ডের আঘাতে মুনি করিল তাড়না ।
স্ত্রীপুত্র বেচিয়া রাজা দিলেন দক্ষিণা ।।
এত দুঃখ তবু না পাইল স্বর্গবাস ।
রাজসূয়যজ্ঞে রাজার এত সর্ব্বনাশ ।।
অন্তরীক্ষে ফিরে রাজা কর্ম্মের দোষেতে ।
স্থান না পাইল স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে ।।
হেন রাজসূয়যজ্ঞে কেন কর মন ।
রাজসূয়যজ্ঞ কৈলে সবংশে মরণ ।।
অনাথের নাথ তুমি ত্রিজগৎপতি ।
রাজসূয়যজ্ঞ কৈলে ঘটিবে দুর্গতি ।।
রাজসূয় না হইল ভরত-কারণ ।
ভরতের বাক্যে রাম করে অন্য মন ।।
ভরতের বাক্য যদি হৈল অবসান ।
লক্ষ্মণ কহেন তবে রামবিদ্যমান ।।
যোড়হাতে কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
অশ্বমেধযজ্ঞ কর কমল লোচন ।।
পূর্ব্বে ব্রহ্মবধ কৈল দেবপুরন্দরে ।
ব্রহ্মহত্যা এড়াইল অশ্বমেধ করে ।।
বৃত্রাসুর অসুর সে বিপ্রের নন্দন ।
আপনার বাহুবলে জিনে ত্রিভুবন ।।
বৃত্রাসুর প্রতাপেতে কাঁপে আখণ্ডল ।
ঠেকয়ে তাহার মাথা আকাশমণ্ডল ।।
ধার্ম্মিক যে বৃত্রাসুর ধর্ম্মে রাজ্যপালে ।
বিনা বৃষ্টি বরিষণে নানাশস্য ফলে ।।
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল তপস্যা-কারণ ।
অসুরের তপস্যাতে কাঁপে দেবগণ ।।
দেবগণ লয়ে গেল বিষ্ণুর গোচর ।
বৃত্রাসুর তপকথা কহে পুরন্দর ।।
ধার্ম্মিক সে বৃত্রাসুর বলে মহাবল ।
তার সম রাজা নাই অবণীমণ্ডল ।।
বহু তপ করে সে পুণ্যের নাহি সংখ্যা ।
যাহা চাবে তাহা পাবে কারো নাহিরক্ষা ।।
বিষ্ণুর চরণে সব করেন স্তবন ।
বৃত্রাসুরে মারি রক্ষা কর দেবগণ ।।
বিষ্ণু কহে বৃত্রাসুর বড়ই চতুর ।
আমার সেবাতে মান বেড়েছে প্রচুর ।।
স্বহস্তে মারিতে কভু যুক্তি নাই হয় ।
প্রকারে বধিব তারে ঘুচাইব ভয় ।।
তিন অংশ হইব অসুরে মারিবারে ।
এক অংশে রব গিয়া পাতালভিতরে ।।
আর এক অংশে আমি রব মর্ত্ত্যপুরে ।
আর এক-অংশে রব তোমার শরীরে ।।
তোমার শরীরে আমি হইনু দোসর ।
বৃত্রাসুরে মারিবারে চলহ সত্বর ।।
যুদ্ধেতে চলিল ইন্দ্র বিষ্ণুর বচনে ।
প্রবেশ করিল গিয়া বৃত্রাসুর রণে ।।
বৃত্রাসুরে দেখি দেবে লাগে চমৎকার ।
ইন্দ্রেরে বলিল হব সহায় তোমার ।।
বিষ্ণুতেজে বৃত্র-অরি বহু শক্তি ধরে ।
বজ্র হানিলেক বৃত্রাসুরের উপরে ।।
বজ্র-অস্ত্র আঘাতেতে বৃত্রাসুর মরে ।
ব্রহ্মবধ প্রবেশিল ইন্দ্রের শরীরে ।।
ব্রহ্মহত্যাভয়ে ইন্দ্র ত্রাসিত অন্তরে ।
বৃত্রাসুরে মারি ইন্দ্রে মহাপাপ ঘেরে ।।

পাপে পূর্ণ ইন্দ্র ভাবেন বিষাদে।
বৃত্রাসুরে মারি আমি পড়িনু প্রমাদে॥
সকল দেবতা গেলা বিষ্ণুর সদন।
ব্রহ্মহত্যাপাপে ইন্দ্রে কর পরিত্রাণ॥
বৃত্রাসুরে বধ ইন্দ্র কৈল তব তেজে।
ব্রহ্মহত্যাপাপে রক্ষা কর দেবরাজে॥
বিষ্ণু বলিলেন অশ্বমেধ আর পূজা।
শাস্ত্রবিধানে করুক ইন্দ্র দেবরাজা॥
ব্রহ্মবধপাপে ইন্দ্র হৈল অচেতন।
তপ জপ যজ্ঞ হোম ছাড়ে ত্রিভুবন॥
নদী স্রোত ছাড়ে আর যোগী ছাড়ে যোগ।
রাজ্যচর্চ্চা ছাড়ে রাজা ছাড়ে উপভোগ॥
ব্রহ্মবধপাপে ইন্দ্র হইল অজ্ঞান।
ইন্দ্র অচেতন যজ্ঞ করে দেবগণ॥
আরম্ভিলা অশ্বমেধযজ্ঞ দেবরাজা।
নানাভোগ দিয়া সবে করে বিষ্ণুপূজা॥
অশ্বমেধযজ্ঞ যদি হৈল অবসান।
ব্রহ্মবধপাপ নাহি থাকে সেইস্থান॥
এক-অংশ ব্রহ্মবধ জলোপরি ভাসে।
আর অংশ ব্রহ্মবধ বৃক্ষোপরি বৈসে॥
আর অংশ ব্রহ্মবধ প্রসবযন্ত্রণা।
অগ্নিরূপে পাতালে সান্ধায় এক-আনা॥
চারিভাগ ব্রহ্মবধ রহে চারিস্থান।
ব্রহ্মবধপাপে ইন্দ্র পাইলেন ত্রাণ॥
ব্রহ্মহত্যাপাপনাশে অশ্বমেধতেজে।
রাজসূয়যজ্ঞ কৈলে সবংশেতে মজে॥
সংসারের কর্ত্তা তুমি পালিছ সংসার।
রাজসূয়যজ্ঞ কৈলে সকল সংহার॥
রাজসূয়যজ্ঞে ছিল শ্রীরামের মন।
অশ্বমেধযজ্ঞে মতি দিল সর্ব্বজন॥
রাম বলেন রাজসূয়যজ্ঞে ছিল মন।
তোমা সবাকার বোলে করিনু বর্জ্জন॥
ভাল যুক্তি সভামধ্যে কহিল লক্ষ্মণ।
অশ্বমেধ করিতে হইল মোর মন॥
রাম বলেন অশ্বমেধ করিলাম সার।
অশ্বমেধযজ্ঞসম ফল নাহি আর॥
এত যদি কহিলেন কমল লোচন।
শুনিয়া হরিষ হৈল ভরত লক্ষ্মণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের অমৃতবচন।
গাইল উত্তরাকাণ্ডে গীত রামায়ণ॥

শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ

রাম যজ্ঞ করিবেন ব্রহ্মা হরষিত।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মা আনিলা ত্বরিত॥
ব্রহ্মা বলেন, বিশ্বকর্ম্মা, কর সম্বিধান।
শ্রীরামের যজ্ঞস্থান করহ নির্ম্মাণ॥
চলিলেন বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মার বচনে।
ভরতলক্ষ্মণ দোঁহে আছেন যেখানে॥
সেইখানে বিশ্বকর্ম্মা করিল গমন।
বিশ্বকর্ম্মে দেখি হৃষ্ট হৈল দুইজন॥
নানারত্ন আনি দিল বিশায়ের স্থান।
যজ্ঞশালা বিশ্বকর্ম্মা করেন গঠন॥
ভরতলক্ষ্মণ-ঠাট দুই অক্ষৌহিণী।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন বহিয়া যে আনি॥
ধাতুপ্রবালাদি রত্ন শুনে যেই দেশে।
সর্ব্বধন বহি আনে চক্ষুর নিমিষে॥
দিল মণিমাণিক্যাদি প্রবাল বিস্তর।
বিশ্বকর্ম্মা যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মায় সত্বর॥
কুণ্ড চারিযোজন সে আড়ে পরিসর।
যোজন চারেক হয় উভে দীর্ঘতর॥
করিল যোজন ছয় কুণ্ডের মেখলা।
দ্বাদশ যোজন ঘর বান্ধে যজ্ঞশালা॥
দধি দুগ্ধ ঘৃতের করিল সরোবর।
তিল যব ধান্য মুগে তিনকোটি ঘর॥

সোণার প্রাচীর ঘর স্বর্গ-আওয়ারী।
স্বর্ণনাট্যশালা বান্ধে স্তম্ভ সারি সারি ॥
ইন্দ্র-আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
যজ্ঞঘর দেখিতে করিবে আগমন ॥
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর রাজা।
ব্রহ্মা-আদি করিয়া যতেক আছে প্রজা ॥
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর মুনি।
তা সবার ঘর করে মুকুতা গাঁথনি ॥
আশী যোজনের পথ করে আয়তন।
তাহাতে বিচিত্র কুণ্ড করিল গঠন ॥
একমাসে পুরীখান করিয়া নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মা সে চলিয়া গেলা নিজ স্থান ॥
ইন্দ্রযমবরুণ যজ্ঞের হৈল হোতা।
হইল যজ্ঞের অগ্নি আপনি বিধাতা ॥
বড় বড় যত মুনি আছেন ভুবনে।
একে একে সব মুনি আইল সে স্থানে ॥
জমদগ্নি আইল ভার্গব পরাশর।
আইল সে সাবর্ণ কশ্যপ মুনিবর ॥
ভরদ্বাজ হস্তদীর্ঘ আইল শীঘ্রগতি।
আইল দুর্ব্বাসামুনি বড় ক্রোধমতি ॥
আইল আস্তিকমুনি গৌতম ব্রাহ্মণ।
মৎস্যকর্ণ আইল ঋষি সঙ্গোপন ॥
পর্ব্বত হইতে এল দক্ষমহামুনি।
ত্রৈশিক কুশধ্বজ সে এল মহাজ্ঞানী ॥
বিষ্ণুপদমুনি এল ঔর্ব্ব ও চ্যবন।
সনাতন সনক আইল দুইজন।
করিল শাণ্ডিল্য গর্গমুনি আগুসার।
আইল কপিলমুনি বিষ্ণু-অবতার ॥
জৈমিনি দধীচিমুনি এল শরভঙ্গ।
চিত্রাবিক কৌশিক সে আইল মাতঙ্গ ॥
আইল দেবর্ষি যত পরম-আনন্দ।
বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গ আর শতানন্দ ॥
বিশ্রবা আইল আরো সেই জহ্নুমুনি।
পৃথিবীর মুনি এল অকথ্য কাহিনী ॥
যত মুনি আইলেন নাম নাহি জানি।
আইলেন আদিকবি বাল্মীকি আপনি ॥
মুনিগণ সকলে করিল বেদধ্বনি।
যজ্ঞ করিবারে রাম বৈসেন আপনি ॥
সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্ম করে এই জ্ঞানে।
স্বর্ণসীতা আনিলা সে শাস্ত্রের বিধানে ॥
সর্ব্বত্র হইল সে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
পাত্রাপাত্র আইল সে যজ্ঞে সর্ব্বজন ॥
সুগ্রীব-অঙ্গদ-আদি শাখামৃগগণ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণনন্দন ॥
শরভ কুমুদ আর মন্ত্রী জাম্বুবান।
নল নীল আইলেন বীর হনুমান ॥
সাগরের পার গেল এই নিমন্ত্রণ।
তিনকোটি জ্ঞাতিসহ এল বিভীষণ ॥
দেশে দেশে চলিল যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
নিমন্ত্রণ পাইয়া আইল রাজগণ ॥
মিথিলা হইতে এল জনকরাজর্ষি।
মহারাজ শাল্ব এল রাঢ়দেশবাসী ॥
নেপালের রাজা এল দুর্জ্জয় দুর্দ্ধর।
রাজা গিরিরাজ্যের আইল ধুরন্ধর ॥
অঙ্গের অধিপ এল লোমপাদ নাম।
বেহারের রাজা এল নাদগিরিধাম ॥
বিজয়নগর কাঞ্চী কলিঙ্গ কর্ণাট।
চৌদিকের রাজা এল সঙ্গে কত ঠাট ॥
রাজগণ থাকে সদা শ্রীরামের কাছে।
আরো কত নৃপগণ এল যত আছে ॥
হেলঙ্গ তৈলঙ্গ দেশ কলিঙ্গ গান্ধার।
আটাশ কোটি এল পশ্চিমের সার ॥
সিংহল সিন্ধান্ত দেশে মনু নামেপুরী।
আইল সাতাশ লক্ষ অযোধ্যানগরী ॥

যতেক ভূপতি সে উত্তরদেশে বৈসে।
আইলা সত্তরি লক্ষ শ্রীরামের পাশে ॥
যত যত রাজা আছে ভারতভিতর।
রাজচক্রবর্ত্তী রাম সবার উপর ॥
আইল অনেক রাজা রামের নিকটে।
রামের আজ্ঞায় তারা দাসবৎ খাটে ॥
পৃথিবীতে রাজা আছে অযুত অযুত।
শ্রীরামের দ্বারে আসি হইল মজুত ॥
অবধূত সন্ন্যাসী আইল দেশান্তরী।
গন্ধর্ব্বকিন্নর এল স্বর্গবিদ্যাধরী ॥
পৃথিবীতে যত ছিল দুঃখিত ব্রাহ্মণ।
যজ্ঞের দক্ষিণা নিতে কৈল আগমন ॥
স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল।
দেবলোক নরলোক হইল মিশাল ॥
ত্রিভুবনে যত লোক আইল অপার।
শত্রুঘ্ন মথুরা হৈতে হৈল আগুসার ॥
বশিষ্ঠ বিশিষ্ট আর সুমন্ত্র সারথি।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য করিল সঙ্গতি ॥
যব ধান গোধুম যে পাতপতণ্ডুল।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু আনিল বহুল ॥
সূর্য্য যেন বসিল সভায় সব ঋষি।
পর্ব্বতপ্রমাণ চাহে তিল রাশি রাশি ॥
তিনকোটিবৃন্দ চাহে শ্রীফলের কাঠ।
আইল সকল দ্রব্য যথা যজ্ঞবাট ॥
বংশের প্রধানপাত্র সুমন্ত্র সারথি।
ইঙ্গিতে সকল দ্রব্য আনে শীঘ্রগতি ॥
যখন ভরত যেই দ্রব্য আজ্ঞা করে।
সেই দ্রব্য শত্রুঘন যোগায় সত্বরে ॥
শত্রুঘ্নের কটক যে দুই-অক্ষৌহিণী।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য বহিল আপনি ॥
যে রাক্ষস দেখিলে পলায় মুনিগণ।
সে রাক্ষসে মুনির যে পাখালে চরণ ॥
নৃত্যগীতমঙ্গল যে নানাবাদ্য শুনি।
অখিল ভুবনে হয় রামজয়ধ্বনি ॥
বহু যজ্ঞ করিল ভূপতি কোটি কোটি।
কাহারো না হইল এমত পরিপাটী ॥

শত্রুঘ্নের দিগ্বিজয়

তুরঙ্গ নগর হৈতে আইল তুরঙ্গ।
তুরঙ্গ সোয়ার কত শত তার সঙ্গ ॥
শ্যামবর্ণ অশ্ব শ্বেতবর্ণ চারিখুর।
নানা অলঙ্কার শোভে সুহার কেয়ূর ॥
লেজ শোভা করে যেন ধবল চামর।
কপালে চামর তার অতি শোভাকর ॥
সর্ব্বগায় খানি খানি সুবর্ণ অদ্ভুত।
জলদমণ্ডলে যেন খেলিছে বিদ্যুৎ ॥
স্বর্ণবর্ণ কর্ণ তার ধরে নানাজ্যোতি।
দুইচক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি ॥
গলে লোমাবলী যেন মুকুতার ঝারা।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন আকাশের তারা ॥
জয়পত্র সে ঘোড়ার কপালে লিখন।
দিলেন শত্রুঘ্নবীরে ঘোড়ার রক্ষণ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন শত্রুঘ্নভাই।
যজ্ঞপূর্ণকালে যেন এই ঘোড়া পাই ॥
দুই অক্ষৌহিণী ঠাটে যান শত্রুঘন।
রঙ্গেতে সঙ্গেতে চলে শতশত জন ॥
বসিলেন যজ্ঞস্থানে রাম মুনিবেশে।
ছাড়িয়া দিলেন ঘোড়া ভ্রমে দেশে দেশে ॥
পূর্ব্বদেশে গেল ঘোড়া বহুদূর পথ।
নদনদী এড়াইল উঠিল পর্ব্বত ॥
ঘোড়ার পশ্চাতে যান বীরশত্রুঘন।
পর্ব্বত উপরে করে স্বেচ্ছায় গমন ॥
সেই পর্ব্বতের নাম বিরূপাক্ষ গিরি।
মহাবল সে রাজা পর্ব্বতনামধারী ॥

রাজপুরে অগ্নিগড় জ্বলে চারিভিতে।
ঘোড়া গড় লঙ্ঘি চলে আনন্দ সহিতে ॥
গড়ের ভিতরে ঘোড়া করিল প্রবেশ।
হেনকালে শত্রুঘ্ন গেলেন সেই দেশ ॥
সকল কটকে ঘোড়া চারিদিকে ঘেরে।
শত্রুঘ্ন কটক লয়ে রহিল বাহিরে ॥
শত্রুঘ্নের কটক যে দুই অক্ষৌহিণী।
নিভাইল সে সকল গড়ের আগুনি।
গড়মধ্যে প্রবেশ করেন শত্রুঘন।
শত্রুঘ্নের সহিত রাজার বাজে রণ ॥
রাম সম শত্রুঘন বীর-অবতার।
শত্রুঘ্নবাণে রাজা মানে চমৎকার ॥
মহাবল শত্রুঘ্ন বানের জানে সন্ধি।
হাতে গলে সে রাজারে করিলেন বন্দী ॥
বান্ধিয়া পাঠায় তারে বীর শত্রুঘন।
রাম দরশনে তার বন্ধনমোচন ॥
পূর্ব্বদিক জয় করি এল শত্রুঘন।
উত্তরদিকেতে ঘোড়া করিল গমন ॥
উত্তরদিকেতে গেল ঘোড়া বায়ুগতি।
শত্রুঘ্ন কটক লয়ে তাহার সংহতি ॥
দিগদিগন্তরে ঘোড়া যায় দেশে দেশে।
ছমাসের পথ যায় চক্ষুর নিমিষে ॥
জয়পত্র ঘোড়ার সে কপালে লিখন।
ঘোড়া দেখি প্রাণ উড়ে যত রাজগণ ॥
মিলিল সকল রাজা আসিয়া তথাই।
পরাজয় মানিলেক শত্রুঘ্নের ঠাঁই ॥
ঘোড়া গেল হিমালয় পর্ব্বতের পার।
সেইদেশী রাজা যেই বিক্রমে বিশাল ॥
ঘোড়া দেখি রাজার ধরিতে গেল সাধ।
রাজাসহ শত্রুঘ্নের লাগিল বিবাদ ॥
কেহ কারে নাহি পারে তুল্য দুইজন।
দোঁহাকার বাণ গিয়া ছাইল গগন ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে শত্রুঘন।
সে বাণ ফুটিয়া রাজা হয় অচেতন ॥
না পারে কহিতে কথা অত্যন্ত কাতর।
তারে বান্ধি পাঠাইল অযোধ্যা নগর ॥
দর্শন দিলেন তারে কমললোচন।
তাহাতে হইল তার বন্ধনমোচন ॥
সে ঘোটক আটক না হয় কোন কোটে।
পশ্চিম দিকেতে অশ্ব তারা যেন ছোটে ॥
এক দিকে ঘোটক না যায় দুইবার।
পশ্চিম দিকেতে গেল সিন্ধুনদ পার ॥
শত্রুঘ্ন ফাঁফর হৈল ঘোড়া নাহি দেখে।
সিন্ধুনদ পারে গেল সকল কটকে ॥
বিকৃত-আকার তারা হাতে চেরা বাঁশ।
হস্তীঘোড়া মারি খায় যত রক্তমাস ॥
পিশাচভোজন করে পিশাচ-আচার।
জীবজন্তু মারি করে তাহারা আহার ॥
সকল ব্যাধেতে ঘোড়া বেড়ে চারিভিতে।
কুপিল শত্রুঘ্নবীর ধনুর্ব্বাণ হাতে ॥
মহাবল শত্রুঘন বীর-অবতার।
একবাণে সব ব্যাধ করিল সংহার ॥
তিনদিকে শত্রুঘন করি এল জয়।
ঘোড়া লয়ে শত্রুঘন যজ্ঞ কাছে যায় ॥

লবকুশের যজ্ঞাশ্ববন্ধন

ত্রৈলোক্যবিজয় যজ্ঞ বড় পরিপাটী।
আতপতণ্ডুলে হোম করে কোটি কোটি ॥
লক্ষ লক্ষ শুভ্র বস্ত্র ব্রাহ্মণের হাতে।
ইন্দ্র যম বরুণ সে যজ্ঞ চারিভিতে ॥
প্রায় যজ্ঞ সমাপন হয় এইক্ষণে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ ঘোড়া গেল সে দক্ষিণে ॥
তুরগ পবনবেগে করিল প্রয়াণ।
উপস্থিত হইল বাল্মীকি মুনি স্থান ॥

যে দিন যা হবে তাহা মুনি সব জানে।
লবকুশ দুইভায়ে ডাক দিয়া আনে ॥
মুনি বলে, লবকুশ, শুনহ বিশেষ।
তপস্যা করিতে যাই চিত্রকূট দেশ ॥
তপোবন রক্ষা কর ভাই দুইজন।
তথায় বিলম্ব মম হবে বহুদিন ॥
কারো সঙ্গে না করিহ বাদবিসম্বাদ।
মুনি সব জানে যত পড়িবে প্রমাদ ॥
প্রণাম করিল দুই ভাই করপুটে।
শিষ্যগণসহ মুনি গেল চিত্রকূটে ॥
বারশত শিষ্যসহ গেল মুনিবরে।
দুইভাই খেলাখেলি বেড়া দণ্ড করে ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে দুইভাই খেলা খেলে।
মৃগপক্ষী সব বিন্ধে বসি বৃক্ষতলে ॥
সন্ধান পূরিয়া দুইভাই এড়ে বাণ।
দেশদেশান্তরে বাণ ভ্রমে স্থানে স্থান ॥
নদনদী বিন্ধে আর বিন্ধে যে পর্ব্বত।
একদিনে যায় বাণ ছয় দিনের পথ ॥
ষট্‌চক্রবাণ যে বেড়ায় দেশে দেশে।
লক্ষ লক্ষ মৃগ মারি পুনঃ তূণেআসে ॥
এমন বাণের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে।
কেবা শিখাইল বাণ কোথা হৈতে জানে ॥
দুইভাই বৃক্ষতলে নানা খেলা খেলে।
হেনকালে অশ্ব এল সে গাছের তলে ॥
ঘোড়া দেখি হরষিত হৈল দুইজন।
হেমপত্র তার ভালে দেখিল লিখন ॥
রাজা দশরথের জনম সূর্য্যবংশে।
তিনি সত্য পালিয়া গেলেন স্বর্গবাসে ॥
তাঁর পুত্র রঘুনাথ ভুবন ভিতরে।
অযোধ্যায় রাজ্য করে চারি সহোদরে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন।
অশ্বমেধ শ্রীরাম করেন আরম্ভন ॥
সে অশ্বমেধের অশ্ব রাখে শত্রুঘন।
দুই-অক্ষৌহিণী ঠাট তাহার ভিড়ন ॥
জয়পত্র দেখি দুইভাই কোপে জ্বলে।
সাহস করিয়া ঘোড়া বান্ধে বৃক্ষমূলে ॥
দুই অক্ষৌহিণী ঘোড়া নাপারে রাখিতে।
হেন ঘোড়া দুইভাই বান্ধে ভালমতে ॥
ঘোড়া বান্ধি মার কাছে গেল দুইজন।
মিষ্ট-অন্ন-আদি দোঁহে করিল ভোজন ॥

লবকুশের সহিত যুদ্ধে শত্রুঘ্নের পতন

শ্রীরাম বলেন ঘোড়া আন শত্রুঘন।
যজ্ঞসাঙ্গ হৈল পূর্ণা দিব ত এখন ॥
সৌমিত্রির আগে দূত কহে বারেবার।
মহারাজ ঘোড়া বন্দী হইল তোমার ॥
শুনিয়া সৌমিত্রি বীর করেন বিষাদ।
বিধির নির্ব্বন্ধ কিবা পড়িল প্রমাদ ॥
বিষম দক্ষিণদিক বড়ই সংকট।
কোন্ বীর হবে গিয়া তাহার নিকট ॥
অনেক শক্তিতে আমি মারিনু লবণ।
না জানি কাহার সনে পুনঃ হয় রণ ॥
এতেক চিন্তিয়া তবে বীর শত্রুঘন।
ঘোড়ার উদ্দেশ হেতু করিল গমন ॥
ঘোড়া লয়ে দুইভাই খেলে বারে বার।
লবকুশে দেখি তাঁর লাগে চমৎকার ॥
লবকুশ খেলা খেলে দেখি শত্রুঘন।
জিজ্ঞাসা করয়ে ঘোড়া বান্ধে কোন্ জন ॥
কোন্ বেটা করিয়াছে মরণের সাধ।
সবংশে মরিতে করে রাম সঙ্গে বাদ ॥
শত্রুঘ্নের কথা শুনি দুইভাই হাসে।
কি নাম ধরহ তুমি থাক কোন্ দেশে ॥
শত্রুঘ্ন বলেন মম জন্ম সূর্য্যবংশে।
চারিভাই থাকি মোরা অযোধ্যাপ্রদেশে ॥

দাশরথি আমরা যে ভাই চারিজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘন ॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিলোক বিজয়ী।
রামের বিক্রমকথা শুন তবে কই ॥
রামের বাণেতে মরে লংকার রাবণ।
মরিল আমার বাণে দুর্জ্জয় লবণ ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই আমার যে রণেতে পণ্ডিত।
তাঁর বাণে অতিকায় মরে ইন্দ্রজিৎ ॥
যে সব মরিল বীর ত্রিভুবন জিনে।
আর কোন্ বীর যুঝে মো সবার সনে ॥
এতেক বড়াই করে বীর শত্রুঘন।
রুষিয়া সে লব কুশ করিছে তর্জ্জন ॥
চারিভাই তোমরা আমরা দুইভাই।
আজি ঘোড়া লয়ে যাও মোরা তাই চাই ॥
মরিবারে কেন এলে মোদের নিকটে।
কেমনে লইবে ঘোড়া পড়িলে সংকটে ॥
খুড়া ভাইপোতে গালি কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিনজনে ॥
নানা-অস্ত্র দুইভাই ফেলে চারিভিতে।
শত্রুঘ্ন কাতর অতি না পারে সহিতে ॥
শত্রুঘন বলে, সৈন্য, কোন্ কর্ম্ম কর।
সকল কটক বেড়ি দুই শিশু মার ॥
দুই-অক্ষৌহিণী ছিল শত্রুঘ্নের ঠাট।
লবকুশে বেড়িয়া করিল বন্ধ বাট ॥
লব কুশ বলে, বীর, না হও বিমুখ।
সকল কটকে মারি দেখহ কৌতুক ॥
শত্রুঘ্ন বলেন দেখি তোমরা বালক।
বালকের সনে যুদ্ধ হাসিবেক লোক ॥
কটক থাকিতে কেন যুঝিব আপনি।
আমার সহিত ঠাট দুই-অক্ষৌহিণী ॥
কটকের ঠাঁই যদি জয়ী হও রণে।
তবে সে যুদ্ধের যোগ্য হও মম সনে ॥
শত্রুঘ্নের কথা শুনি দুইভাই ভাবে।
আগে মারি কটক তোমারে মারি শেষে ॥
কুশ বলে, লব তুমি এইখানে থাক।
কটক সংহারি আমি তুমি মাত্র দেখ ॥
লবের আগেতে কুশ পাতিল ধনুক।
ভ্রাতার সমরে লব দেখিছে কৌতুক ॥
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম।
বেড়াপাক বাণে কুশ পুরিল সন্ধান ॥
পৃথিবীতে ফিরে বাণ কুমারের চাক।
সকল কটক বেড়ি মারে বেড়াপাক ॥
বেড়াপাক বাণে কারো নাহিক নিস্তার।
বেড়াপাকবাণে সব করিল সংহার ॥
পড়িল সকল ঠাট নাহি একজন।
সবেমাত্র একাকী রহিল শত্রুঘন ॥
ঠাঁই ঠাঁই কটক পড়িল গাদি গাদি।
সংগ্রামের স্থানে বহে শোণিতের নদী ॥
ডাক দিয়া বলে কুশ শুন শত্রুঘন।
কোথা গেল সৈন্য তব নাহি একজন ॥
লবের কনিষ্ঠ আমি রণে নাহি টুটি।
লব ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটি ॥
কুশের বচন শুনি বলেন শত্রুঘন।
পলাইয়া যাব কি তোমারে দিব রণ ॥
পলাইয়া গেলে পরে থাকিবে অখ্যাতি।
যদি যুদ্ধ করি তবে নাহি অব্যাহতি ॥
কুশ বলে দৃঢ় কর যুক্তি শত্রুঘন।
সেই যুক্তি কর যেই লয় তব মন ॥
শত্রুঘ্ন বলেন, কুশ, কিছু মিথ্যা নয়।
যত কিছু বল তুমি সব সত্য হয় ॥
তোমার সহিত যুদ্ধে অবশ্য সংহার।
বুঝিতে না পারি তুমি কোন্ অবতার ॥
তোমার সংগ্রামে কুশ, কার বাপে তরি।
একবার যুদ্ধ করি মারি কিম্বা মরি ॥

কুশ বলে, শত্রুঘ্ন, মরণ দৃঢ় কর।
এই আমি বাণ এড়ি যাও যমঘর ॥
লব বলে, কুশ শুন আমার বচন।
তুমি সৈন্য মার আমি মারি শত্রুঘন ॥
কুশ বাণ যুড়িল লবেরে করি পাছে।
সন্ধান পূরিয়া গেল সৌমিত্রির কাছে ॥
কুশ বলে সৌমিত্রি হে এই বাণ ফেলি।
এ বাণ সহিতে পার তবে বীর বলি ॥
সৌমিত্রি বলেন আগে আমি বাণ মারি।
সহিতে পারিলে তোমা বীর জ্ঞান করি ॥
তিনলক্ষ বাণ বীর শত্রুঘন এড়ে।
আকাশ গমনে বাণ উখড়িয়া পড়ে ॥
দুইজনে বাণবৃষ্টি করে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জরজর ॥
উভয়ের বাণ গিয়া গগনেতে উঠে।
উভদে বরিষে বাণ উভয়েতে কাটে ॥
নানা অস্ত্র দুইজন করে অবতার।
চারিদিকে পড়ে বাণ অগ্নির সঞ্চার ॥
সৌমিত্রি এড়েন তবে মহাপাশ বাণ।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কুশ করে খান খান ॥
এড়িল সকল বাণ সৌমিত্রি নিপুণ।
ফুরাইল সব বাণ শূন্য হৈল তূণ ॥
বিষ্ণু অস্ত্র শত্রুঘ্ন বীরের মনে পড়ে।
তূণ হৈতে তাহা লৈয়া ধনুকেতে যোড়ে ॥
নিরখিয়া কুশবীর চিন্তে মনে মন।
মহাবিষ্ণুবাণ যুড়ে ধনুকে তখন ॥
বাণ দেখি শত্রুঘ্নে লাগে চমৎকার।
মহাবিষ্ণু বাণে বিষ্ণু বাণের সংহার ॥
কুশ বলে, শত্রুঘন, আর বাণ আছে।
ফুরাল তোমার অস্ত্র আমি এড়ি পিছে ॥
কুশেরে ডাকিয়া বলে বীর শত্রুঘন।
তোমায় আমায় এই হইল যে রণ ॥
কারো পরাজয় নহে উভয়ে সোসর।
রণে ক্ষমা দিয়া যাহ দুইজনে ঘর ॥
সৌমিত্রির কথা শুনি কুশবীর হাসে।
অবশ্য মারিব তোমা না যাইবে দেশে ॥
মহাপাশ বাণ কুশ যুড়িল ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে ॥
সকল পৃথিবী হৈল অন্ধকারময়।
নিরখিয়া শত্রুঘ্নের লাগিল সংশয় ॥
অন্ধকারে যুঝিতে না পারে শত্রুঘন।
যুঝিতে না পারে হয় মৃত্যু দরশন ॥
একদৃষ্টে রহিল সে ধনুর্ব্বাণ হাতে।
শত্রুঘ্নে মারিতে বাণ চলিল ত্বরিতে ॥
মহাপাশবাণ তবে যায় নানা ছন্দে।
হাতে গলে শত্রুঘনে অবশেষে বান্ধে ॥
গলায় লাগিল ফাঁস মৃত্যু দরশন।
মহাপাশবাণাঘাতে পড়ে শত্রুঘন ॥
শত্রুঘ্ন পড়িয়া রহে রণের ভিতর।
মহানন্দে দুইভাই চলিলেক ঘর ॥
কহিতে লাগিল গিয়া মায়ের গোচর।
দুইভাই খেলিলাম এই দুই প্রহর ॥
যত যত ভূপতি আইসে তপোবনে।
কৌতুকে খেলাই মাতা, তা সবার সনে ॥
দুইশিশু লয়ে সীতা করাইল স্নান।
অগুরুচন্দনে অঙ্গ করিলা সুঘ্রাণ ॥
মিষ্ট-অন্ন করাইল দোঁহারে ভোজন।
বিচিত্রপালঙ্কে দোঁহে করিল শয়ন ॥
দুইশিশু লয়ে সীতা রহিল সন্তোষে।
শত্রুঘ্নের বার্ত্তা লয়ে দূত গেল দেশে ॥
এত সৈন্যমাঝে এড়াইল সাতজন।
দেশেতে গমন করে করিয়া ক্রন্দন ॥

লবকুশের সহিত যুদ্ধে ভরত ও লক্ষ্মণের পতন

পাত্রমিত্রসহ রাম আছে যজ্ঞস্থানে।
হেনকালে সাতজন গেল সেইখানে ॥
সাতজন বার্ত্তা কহে গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে।
দুইশিশু যুদ্ধ করে বাল্মীকির দেশে ॥
লবকুশ নামে যে যমজ দুই ভাই।
ত্রিভুবন পরাজিত সে দোঁহার ঠাঁই ॥
বলিবারে ভয় বাসি, প্রভু, বিবরণ।
সৈন্যসহ যুদ্ধেতে পড়িল শত্রুঘন ॥
শুনিয়া শ্রীরাম অতি ভাবিত হইয়া।
জিজ্ঞাসা করেন তারে প্রমাদ ভাবিয়া ॥
কহ দূত কার সঙ্গে ঘটিল এ রণ।
কি আশ্চর্য্য শত্রুঘ্নের সমরে পতন ॥
দূত কহে মহারাজ দুই মুনিসুত।
যুদ্ধ করে সমরে সাক্ষাৎ যমদূত ॥
তারা যদি যুদ্ধ করে তোমার সহিতে।
জিনিতে নারিবে প্রভু হেন লয় চিতে ॥
ঘোড়া বন্দী করিল তাহারা দুইজন।
এতেক প্রমাদ পড়ে ঘোড়ার কারণ ॥
সে কথা শুনিয়া রাম করেন চিন্তন।
প্রমাদ পড়িল দৈবে না যায় খণ্ডন ॥
সূর্য্যবংশে জন্মিল যতেক মহারাজ।
সমরে পড়িয়া কেহ না পাইল লাজ ॥
অনরণ্যমহারাজে মারিল রাবণে।
সে রাবণ সবংশে পড়িল মোর রণে ॥
দুর্জ্জয় লবণ ছিল রাবণ ভাগিনে।
দেবদৈত্য আদি যত কাঁপে সর্ব্বজনে ॥
রাবণ হইতে কত বড় সে লবণ।
তাহারে মারিল মোর ভাই শত্রুঘন ॥
রামেরে প্রবোধ দেন ভরত লক্ষ্মণ।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই যুদ্ধেতে মরণ ॥
বিলাপ সম্বর প্রভু, না কর বিষাদ।
কারো দোষ নাহি দৈবে পাড়িল প্রমাদ ॥
পতিব্রতা সীতা তুমি বর্জ্জিলে যখন।
জেনেছি তখনি হবে বিধি বিড়ম্বন ॥
দেবতা জানেন যে সীতার নাহি পাপ।
বিনা দোষে বর্জ্জিলে যে তাই পাই তাপ ॥
আজি যদি শ্রীরাম তোমার আজ্ঞা পাই।
শিশু ধরিবারে মোরা যাই দুইভাই ॥
এতেক বলিল যদি ভরত লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম দিলেন আজ্ঞা উভয়ে তখন ॥
যাও ভাই কল্যাণ করুন ত্রিলোচন।
সাবধানে দুইভাই কর গিয়া রণ।
শত্রুঘ্ন ভ্রাতার শোক সান্ধাইল বুকে।
পাছে পাই আর শোক মরি সেই দুখে ॥
দুইভাই কর যুদ্ধ যদি যুদ্ধ ঘটে।
দুই শিশু ধরি আন আমার নিকটে ॥
বিদায় হইয়া যান ভরত লক্ষ্মণ।
চারি অক্ষৌহিণী সৈন্য হইল সাজন ॥
মুখ্যসেনাপতি গিয়া চড়িলেক রথে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত চলে তার সাথে ॥
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদ্গর।
খান্ডা আর ডাঙ্গস দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥
দুর্জ্জয় নামেতে হস্তী আরোহে ভরত।
লক্ষ্মণের ধনুর্ব্বাণ পূর্ণ মহারথ ॥
হস্তী ঘোড়া রথ সব চলিল অশেষ।
বাল্মীকির তপোবনে করিল প্রবেশ ॥
কটকসমেত পড়ি আছে শত্রুঘন।
সেইখানে গেলেন শ্রীভরত লক্ষ্মণ ॥
শৃগাল কুক্কুর আর শকুনী গৃধিনী।
কটকের মাংস নিয়া করে টানাটানি ॥

ভরতলক্ষ্মণ দোঁহে করে অনুমান।
মহাযুদ্ধে আসিয়া হইনু অধিষ্ঠান ॥
রণস্থলে দেখিলেন ভরত লক্ষ্মণ।
হাতেধনু পড়িয়া আছেন শত্রুঘন ॥
সৌমিত্রিরে দুইভাই কোলে করি কাঁদে।
প্রাণ হারাইলে, ভাই, শিশুর বিরোধে ॥
যমুনার কূলে ভাই মারিলে লবণ।
এখানে আসিয়া ভাই হারালে জীবন ॥
রণস্থলে কান্দিছেন ভরত লক্ষ্মণ।
পাত্রমিত্র কহে দোঁহে প্রবোধবচন ॥
শোক করিবার বেলা নহে ত এখন।
সমরে আসিয়া শোক কর কি কারণ ॥
সেই দুইশিশু মার পূরিয়া সন্ধান।
যুদ্ধস্থলে আসি শোক নহে ত বিধান ॥
এতেক বচন শুনি ভরতলক্ষ্মণ।
ক্রন্দন সম্বরি দোঁহে স্থির করে মন ॥
যুদ্ধার্থে কটক রহে পূরিয়া সন্ধান।
লক্ষ্মণভরত দোঁহে হৈল আগুয়ান ॥
চারিদিকে রামসেনা রহে সাবধানে।
কটকের মহারোল সীতাদেবী শুনে ॥
সীতা বলিলেন লবকুশ রে কেমন।
কি প্রমাদ পড়িয়াছ ভাই দুইজন ॥
কার সনে করিয়াছ বাদ বিসম্বাদ।
লবকুশ না জানি কি পাড়িলি প্রমাদ ॥
শুনিয়া মায়ের কথা দুইভাই হাসে।
মায়েরে প্রবোধ দেয় অশেষ বিশেষে ॥
লবকুশ বলে মাতা না জান কারণ।
মৃগয়া করিতে রাজা আসে তপোবন ॥
যত যত রাজা আছে চন্দ্রসূর্য্যকূলে।
মৃগয়া করিতে সবে আসে এই স্থলে ॥
অবশ্য রাজার সহ আইসে সামন্ত।
রাজার সৈন্যের রোলে তুমি কেন চিন্ত ॥
আমা দুইভাই মুনি থুয়ে গেল দেশে।
কোন্ রাজা আসিয়াছে না জানি বিশেষে ॥
মুনির আজ্ঞায় মোরা রাখি তপোবন।
নাহি জানি আসিয়াছে কোন্ মহাজন্ ॥
আশ্রম হইলে নষ্ট মুনি দিবে দোষ।
বড় ভয় মানি মা করিলে মুনি রোষ ॥
প্রবোধিয়া মায়েরে তখন বাক্ছলে।
শীঘ্রগতি দুইভাই যুঝিবারে চলে ॥
তূণপূর্ণ বাণ নিল ধনু নিল হাতে।
মহাহ্লাদে দুইভাই যায় সমরেতে ॥
দুইভাই গেল যথা ভরত লক্ষ্মণ।
তৃণজ্ঞান করে সব দেখি সেনাগণ ॥
লবকুশে দেখি সেনা কম্পিত-অন্তর।
গরুড়ে দেখিয়া যেন ভুজঙ্গের ডর ॥
মনোহর দুইভাই দূর্ব্বাদলশ্যাম।
সকল কটক বলে এল দুই রাম ॥
রাম যদি আসিতেন এখানে এখন।
তিন রাম একস্থানে হইত মিলন ॥
সেই তেজ সেই বল সেই ধনুর্ব্বাণ।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান ॥
এক রামে জিনিতে না পারে ত্রিভুবন।
দুই রাম ইহারা জিনিবে কোন্ জন ॥
ভরত লক্ষ্মণ কহে মানিয়া বিস্ময়।
কে তোমরা দুইভাই দেহ পরিচয় ॥
হাসিয়া উত্তর করে দুই সহোদর।
জাতি কুলে মোদের কি করিবে বিচার ॥
বারশত শিষ্য পড়ে বাল্মীকির ঠাঁই।
তাঁর শিষ্য আমরা যমক দুইভাই ॥
সব শিষ্য লয়ে মুনি গেল পরবাসে।
আমাদের দুইভায়ে থুয়ে গেল দেশে ॥
দশরথ ভূপতির পুত্র শত্রুঘন।
দেখ সৈন্যসহ তার সমরে পতন ॥

দুই ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে।
কোন্ কার্য্যে আসিয়াছ মোদের নিকটে॥
কটক লইয়া কেন এলে তপোবন।
পরিচয় দেহ এলে কিসের কারণ॥
তাহা শুনি শ্রীভরত লক্ষ্মণের হাস।
মুখেতে তর্জ্জন মাত্র অন্তরে তরাস॥
চারিভাই আমরা সবার জ্যেষ্ঠ রাম।
তিনের কনিষ্ঠভাই শত্রুঘন নাম॥
মধ্যম আমরা দুই ভরতলক্ষ্মণ।
শত্রুঘনে মারিয়া কি রাখিবে জীবন॥
এত যদি চারিজনে হৈল গালাগালি।
চারি জনে যুদ্ধ বাজে চারি মহাবলী॥
কুশে আর ভরতে বাজিল মহারণ।
মহাযুদ্ধ করে লব সহিত লক্ষ্মণ॥
ভরত লক্ষ্মণ সহ চার অক্ষৌহিণী।
ভরত ডাকিয়া সৈন্যে বলেন আপনি॥
শিশুজ্ঞানে তোমরা না হও অন্যমন।
দুই ভাগ হয়ে যুদ্ধ কর সেনাগণ॥
দুই অক্ষৌহিণী যুঝে ভরতের কাছে।
আর দুই অক্ষৌহিণী লক্ষ্মণের পিছে॥
মধ্যে দুইশিশু যে কটক চারিভিতে।
হস্তিস্কন্ধে ভরতলক্ষ্মণ মহারথে॥
লবের বাণের শিক্ষা বড় চমৎকার।
ধূমবাণ এড়ে দশদিক্ অন্ধকার॥
জগৎ হইল সব অন্ধকারময়।
পলায় সকল ঠাট গণিয়া সংশয়॥
তিমির হইল হেন চক্ষে নাহি দেখে।
পর্ব্বতগুহার মধ্যে কেহ গিয়া ঢোকে॥
পলাইয়া যেতে যেতে কারো পা পিছলে।
ঝম্প দিয়া পড়ে কেহ নদনদী জলে॥
কেহ কারে নাহি দেখে কেবা কোথা যায়।
লক্ষ্মণে এড়িয়া যত কটক পলায়॥
পলাইল সব ঠাট নাহিক দোসর।
সবেমাত্র লক্ষ্মণ রহেন একেশ্বর॥
এমন বাণের শিক্ষা নাহি কোন স্থানে।
কেবা শিখাইল কোথা হইতে বা জানে॥
রাবণের কুমার সে বীর ইন্দ্রজিৎ।
ত্রিভুবন যার বাণে হইল কম্পিত॥
তাহারে মারিতে আমি না করিনু ভয়।
হইল শিশুর যুদ্ধে জীবনসংশয়॥
যে হউক সে হউক আজি রণ করি।
না করি প্রাণের ভয় মারি কিম্বা মরি॥
সাহসে করিয়া ভর যুঝেন লক্ষ্মণ।
ধনুকে ব্রহ্মাগ্নি বাণ যুড়েন ততক্ষণ॥
জ্বলিয়া ব্রহ্মাগ্নিবাণ উঠিল আকাশে।
অন্ধকার দূর হৈল পৃথিবী প্রকাশে॥
অন্ধকার দূর হৈল ঠাট দূরে দেখে।
সকল কটক এল লক্ষ্মণ সম্মুখে॥
লক্ষ্মণের বাণশিক্ষা বড় চমৎকার।
পলাইল যত সৈন্য এল আরবার॥
লক্ষ্মণের বাণ দেখি লব পায় ত্রাস।
তার ত্রাস দেখিয়া লক্ষ্মণ পান আশ॥
লব বলে, লক্ষ্মণ, কি কর অহঙ্কার।
মোর ঠাঞি পড়িলে নিস্তার নাহি আর॥
আছয়ে অক্ষয়বাণ তূণের ভিতর।
ওর নাহি এড়ি বাণ শতেক বছর॥
তোমার কটক আছে এই ত ভরসা।
জল হেন শুষিব যে না রাখিব আশা॥
সংহারিব সকল সে তব বিদ্যমানে।
অবশেষে তোমারে যে মারিব পরাণে॥
এতেক বলিয়া লব যোড়ে ধনুর্ব্বাণ।
সকল সামন্ত কাটি করে খান খান॥
ষট্‌চক্র বাণ লব যুড়িল ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে॥

মহাশব্দে যায় বাণ তারা যেন ছুটে ।
একবাণে লক্ষ্মণের সব সৈন্য কাটে ।।
ষট্‌চক্রবাণেতে এড়ায় যেই সব ।
যে সকল সৈন্য নাহি মারিলেন লব ।।
রক্তময় হইল সকল যুদ্ধস্থল ।
ভাদ্রমাসে গঙ্গা যেন করে টলমল ।।
ডাকিয়া বলেন লব শুন হে লক্ষ্মণ ।
কোথা গেল সৈন্য তব নাহি একজন ।।
মারিলে যে ইন্দ্রজিৎ রাবণকুমারে ।
তোমারে মারিয়া যশ রাখিব সংসারে ।।
তোমারে মারিলে পরে মোর যশ রহে ।
বলিয়া লক্ষ্মণজিৎ সর্ব্বলোকে কহে ।
লক্ষ্মণ বলেন লব এ কি অহঙ্কার ।
মোর সনে যুদ্ধে তব নাহিক নিস্তার ।।
কুপিয়া লক্ষ্মণ বীর এড়ে ব্রহ্মজাল ।
সংসার করিল আলো অগ্নির উথাল ।।
লব বীর বিষণ্ণ ভাবিছে মনে মন ।
ধনুকে বরুণ বাণ যুড়িল তখন ।।
সন্ধান পুরিয়া লব সে বাণ এড়িল ।
সমুদ্রতরঙ্গ যেন গগনে লাগিল ।।
ব্রহ্মজাল ব্যর্থ গেল চিন্তিত লক্ষ্মণ ।
কি হবে আমার বুঝি সংশয় জীবন ।।
লক্ষ্মণের যত শিক্ষা যত অস্ত্র জানে ।
সন্ধান পুরিয়া বাণ এড়ে ততক্ষণে ।।
সকল পৃথিবী হৈল বাণে অন্ধকার ।
লক্ষ্মণের বাণ দেখি লাগে চমৎকার ।।
চিন্তিত হইয়া লব ভাবে মনে মন ।
অক্ষয় অজিতবাণ যুড়িল্ল তখন ।।
সন্ধান পুরিয়া এড়ে তারা যেন ছুটে ।
সেই বাণে লক্ষ্মণের মহাবাণ কাটে ।।
এই বাণ ব্যর্থ গেল চিন্তিত লক্ষ্মণ ।
মনে ভাবে শিশু নহে সাক্ষাৎ এ যম ।।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ লক্ষ্মণ যে এড়ে ।
কতদূরে গিয়া বাণ উখড়িয়া পড়ে ।।
দেখিয়া ত লক্ষ্মণের লাগে চমৎকার ।
ফুরাইল সব বাণ তূণে নাহি আর ।।
ফুরাইল অস্ত্র সব তূণে নাহি বাণ ।
দেখিয়া উদ্বিগ্ন বড় হইল লক্ষ্মণ ।।
বলেন লক্ষ্মণ পরে লব বিদ্যমান ।
এতদূরে মোর যুদ্ধ হইল অবসান ।।
সর্ব্বশাস্ত্র জান তুমি বিচারে পণ্ডিত ।
বুঝিয়া করহ কার্য যে হয় উচিত ।।
শুনিয়া তাহার কথা লব বীর ভাষে ।
অবশ্য মারিব তোমা না যাইবে দেশে ।।
এক বাণ এড়ি আমি না ভাবিও মন্দ ।
যে হোক তা হোক তব থাকে যেন নির্ব্বন্ধ ।।
এই বাণে যদি তুমি পাও পরিত্রাণ ।
লক্ষ্মণ তোমার তবে না লইব প্রাণ ।।
করিনু প্রতিজ্ঞা এই শুনহ বচন ।
এই বাণ ব্যর্থ গেলে না করিব রণ ।।
পাশুপত বাণ সে লবের মনে পড়ে ।
তূণ হৈতে বাণ নিয়া ধনুকেতে যোড়ে ॥
বাসুকি তক্ষক যেন বাণের গর্জ্জন ।
পাশুপত বাণে বিন্ধে পড়িল লক্ষ্মণ ।।
লক্ষ্মণে জিনিয়া যায় ভায়ের উদ্দেশে ।
হেথা যুদ্ধ বাজিল ভরতে আর কুশে ॥
কুশের সহিত লব নাহি করে দেখা ।
লুকাইয়া দেখে সে কুশের অস্ত্রশিক্ষা ॥
শত্রুঘ্নে মারিয়া কুশের বাড়িয়াছে আশ ।
ভরতের সনে যুঝে নাহি পায় ত্রাস ॥
একা ভাই যদ্যপি জিনিতে নারে রণ ।
নির্ম্মূল করিব যে না রহে একজন ॥
এতেক ভাবিয়া লব লুকাইয়া থাকে ।
ভরতের সহিত কুশের যুদ্ধ দেখে ।।

ভরতের সনে ঠাট কটক বিস্তর।
চারিভিতে যুদ্ধ করে কুশ একেশ্বর॥
বেড়াপাক নামেতে কুশের এক বাণ।
সেই বাণে কুশ বীর পূরিল সন্ধান॥
বেড়াপাক বাণ সে প্রবেশে পাকে পাক।
হাত-পা কাটে কারো কারো কাটে নাক॥
একঠাঁই মুণ্ড পড়ে স্কন্ধ আর ঠাঁই।
ভরতের ঠাট পড়ে লেখাজোখা নাই॥
একবাণে অরিসৈন্য করিল সংহার।
পর্ব্বত প্রমাণ ঠাট পড়িল অপার॥
রক্তনদী বহিল যে সংগ্রামের স্থানে।
এত সৈন্য পড়ে শুধু বাঁচে সাতজনে॥
উচ্চৈঃস্বর করি তারা ভরতেরে ডাকে।
পলাইয়া যায় কেহ ফিরে ফিরে দেখে॥
ভাবে তারা পরিত্রাণ পাইবে কেমনে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে ভঙ্গ দিতে রণে॥
ভরত বলেন কুশ, ক্ষান্ত কর রণ।
দেশে পলাইয়া যাই এই অষ্টজন॥
কুশ বলে ভরত না বল এ বচন।
কেমনে যাইবে দেশে এই অষ্টজন॥
সাতজন যাক দেশে রামের গোচর।
বার্ত্তা পেয়ে রাম যেন আসেন সত্বর॥
শুনহ ভরতবীর আমার উত্তর।
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলা কাতর॥
মনে ভাব পলাইয়া পাবে অব্যাহতি।
যত কাল জীবে তব থাকিবে অখ্যাতি॥
থাকিবে অপযশ লে পলাইয়া গেলে।
অনন্ত পৌরুষ থাকে যুঝিয়া মরিলে॥
ভরত বলেন কুশ ইহা মিথ্যা নয়।

শ্রীরামের তেজ বল তাঁরি ধনুর্ব্বাণ।
হারিলে তোমার ঠাঁই নাহি অপমান॥
কুশ বলে রাম বলি কত গর্ব্ব কর।
রাম কি করিবে যদি আজি তুমি মর॥
তুমি আজি পড়িবে যে আমার সংগ্রামে।
অতঃপর আসিয়া কি করিবেন রামে॥
মোদের সমরে যদি জয়ী হন রাম।
তবে ব্যর্থ ধরি মোরা লবকুশ নাম॥
তোমারে ছাড়িয়া দিলে লব পাছে হাসে।
বলিবেন ভরতে কি না মারিলে ত্রাসে॥
কোন্ কালে ভাই মোর মারিল লক্ষ্মণ।
তোমারে মারিতে যে বিলম্ব এতক্ষণ॥
একবাণ বিনা না এড়িব আর বাণ।
একবাণে ভরত লইব তব প্রাণ॥
ভরত বলেন তব বুদ্ধি ভাল নয়।
শ্রীরামের রূপ দেখি তেঁই বাসি ভয়॥
কুশ বলে রাম হেন কোটি যদি আসে।
বাহুড়িয়া একজন নাহি যাবে দেশে॥
ভরত বলেন কুশ দিলে গালাগালি।
শ্রীরামের নিন্দা কর সহিতে না পারি॥
শিশু হয়ে কুশ তব এতেক বড়াই।
আছুক রামের কার্য্য জিন মোর ঠাঁই॥
'লব লব' বলিয়া যে কর অহঙ্কার।
লক্ষ্মণের সমরেতে তাঁর বাঁচা ভার॥
লক্ষ্মণের বাণে কারো নাহিক নিস্তার।
অবশ্য লক্ষ্মণ প্রাণ লয়েছে তাহার॥
লক্ষ্মণের বাণে লব যদ্যপি বাঁচিত।
আসিয়া তোমারে সে অবশ্য দেখা দিত॥
ভরতের কথা শুনি কুশবীর কয়।
কোন্ কালে লক্ষ্মণের হইয়াছে ক্ষয়॥
লক্ষ্মণ লবের বাণে পাইলে নিস্তার।
না হবে ভরত তবে তোমার সংহার॥
এত যদি দুইজনে হৈল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী।

তিরাশীকোটি বাণ সে এড়িল ভরত।
দশদিক জলস্থল ঢাকিল পর্ব্বত ।।
ভরতের বাণেতে হইল অন্ধকার।
দেখিয়া কুশের মনে লাগে চমৎকার ।।
কুশ বীর বাণ এড়ে ভরত সম্মুখে।
ভরতের যত বাণ কাটে একে একে ।।
সব বাণ ব্যর্থ গেল ভরত চিন্তিত।
ভরত গন্ধর্ব্ব অস্ত্র এড়িল ত্বরিত ।।
তিনকোটি গন্ধর্ব্ব জন্মিল একবাণে।
কুশ সহ যুদ্ধ করে অতি সাবধানে ।।
গন্ধর্ব্বের বিক্রমে কুশের লাগে ডর।
এড়িল অজয়জিৎ বাণ সে সত্বর ।।
গন্ধর্ব্ব কুশের বাণে হইল সংহার।
দেখি ভরতের মনে লাগে চমৎকার ।।
কুশ বলে ভরত আর কত বাণ এড়।
এই আমি বাণ মারি যমঘরে নড় ॥
যুড়িল ঐষীক বাণ কুশ যে ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে ।।
মহাশব্দ করি বাণ উঠিল আকাশে।
দেখিয়া ভরত ব্যস্ত হইলেন ত্রাসে ।।
ভরত কাতর হয়ে উর্দ্ধপানে চায়।
বায়ুবেগে পড়ে বাণ ভরতের গায় ।।
ফুটিয়া ঐষীকবাণ পড়িল ভরত।
পৃথিবীতে শতধারে বহে রক্তস্রোত ।।
ভরত কটকসহ পড়িলেন রণে।
ধেয়ে গেল লব তবে কুশবিদ্যমানে ।।
রক্তে রাঙ্গা দুই ভাই করে কোলাকুলি।
জলে গিয়া যুদ্ধরক্ত ফেলিল পাখালি ॥
সংগ্রামের বেশ থুয়ে বৃক্ষের কোটরে।
শূন্যহস্তে গেল দোঁহে মায়ের গোচরে ॥
জানকী বলেন রে বিলম্ব কি কারণ।
কোন্ কার্য্যে লবকুশ ব্যাজ এতক্ষণ ॥
লবকুশ বলে মাতা না জানি বিশেষ।
মৃগয়া করিয়া রাজা গেল নিজ দেশ ॥
এতেক প্রমাদ সীতা কিছু নাহি জানি।
মিথ্যা কহি মায়েরে প্রতারে দুইজনে ॥
কোন চিন্তা নাহি মাগো তোমার প্রসাদে।
তপোবন রাখি মোরা মুনি-আশীর্ব্বাদে ॥
মিষ্ট অন্ন পান দোঁহে করিল ভোজন।
সুগন্ধি চন্দন মাল্য পরিল তখন ॥
পরম হরিষে ঘরে রহে দুই ভাই।
সাত জন পলাইয়া গেল রাম ঠাঁই ॥

লবকুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধায়োজন

মুনিগণ মধ্যে রাম বৈসে যজ্ঞস্থানে।
হেনকালে সাতজন গেল সেইখানে ॥
সাতজনে দেখিয়া যে রাম চিন্তাবান্।
জিজ্ঞাসেন ভরত ও লক্ষ্মণ কল্যাণ ॥
কৃতাঞ্জলি সাতজন করে নিবেদন।
কি কহিব রঘুনাথ দৈবের ঘটন ॥
প্রমাদ পড়িল প্রভু ভয়ে নাহি কহি।
সাতজন আইলাম আর কেহ নাহি ॥
চারি অক্ষৌহিণী পড়ে ভরত লক্ষ্মণ।
সবেমাত্র এড়াইয়া এনু সাতজন ॥
দুই শিশু নর নহে বিষ্ণু অবতার।
তোমার যতেক সেনা করিল সংহার ॥
আপনি যদ্যপি রাম যুঝ তার সনে।
জিনিতে নারিবে প্রভু হেন লয় মনে ॥
ত্রৈলোক্যের নাথ তুমি জগৎ পূজিত।
জিনিতে নারিবে রণে কহিনু নিশ্চিত ॥
শুনিয়া মূর্চ্ছিত রাম কমল লোচন।
চৈতন্য পাইয়া রাম করেন ক্রন্দন ॥
কোথা কারে গেলে ভাই ভরত লক্ষ্মণ।
আমারে এড়িয়া কোথা গেলা তিনজন ॥

পূর্ব্বেতে আমার প্রতি আছিলা সদয়।
রণস্থলে গিয়া, ভাই, হইলা নির্দ্দয় ॥
শ্রীরামের সর্ব্ব অঙ্গ তিতে নেত্রনীরে।
ভাগীরথী বহে যেন হিমালয়োপরে ॥
তিনভায়ে স্মরণ করিয়া বহুতর।
বিলাপেন হায় হায় করি রঘুবর ॥
আমা লাগি লক্ষ্মণ যে রাজ্য পরি হরি।
বনবাসে গেলা সঙ্গে বৃক্ষছাল পরি ॥
চতুর্দ্দশবর্ষ কত দুঃখ পেলে বনে।
ইন্দ্রজিৎ পড়িল তোমার তীক্ষ্মবাণে ॥
লক্ষ্মণের তুল্য ভাই নাহি ত্রিভুবনে।
হেন ভাই পড়ে মোর ছাবালের রণে ॥
ভরতের যত গুণ কহিতে না পারি।
আমি বনে গেলে হয়েছিল ব্রহ্মচারী ॥
চৌদ্দবর্ষ দুঃখ পেয়ে পরিল বাকল।
রাজভোগ এড়িয়া খাইল বৃক্ষফল ॥
শিশুর বিরোধে ভাই গেলা রসাতল।
এতেক ভাবিয়া রাম হলেন বিকল ॥
ভাই মোর শত্রুঘন প্রাণের সোসর।
তব তুল্য বীব নাহি পৃথিবী ভিতর ॥
বহু দিন যুদ্ধে আমি মারিনু রাবণ।
একদিনের যুদ্ধে তুমি মারিলে লবণ ॥
হেন ভাই পড়িল যে শিশুর সংগ্রামে।
যে থাকে কপালে তাহা ঘটে ক্রমে ক্রমে ॥
নেত্র নীরে শ্রীরামের তিতিল বসন।
সুগ্রীব প্রভৃতি কহে প্রবোধ বচন।
আপনি, শ্রীরাম, তুমি বিচারে পণ্ডিত।
তোমার ক্রন্দন কভু নহে ত উচিত ॥
ক্রন্দন সম্বর রাম স্থির কর মীত।
দুই শিশু ধরি গিয়া চল শীঘ্রগতি ॥
শ্রীরাম বলেন যাই ভায়ের উদ্দেশে।
তিন ভাই গেল যদি আমি আছি কিসে ॥
দুই শিশু মারি যবে শুধি ভ্রাতৃধার।
অযোধ্যায় ফিরি তবে আমি পুনর্ব্বার ॥
শুনিয়া রামের কথা সুগ্রীব রাজন্।
শ্রীরামের প্রতি কহে প্রবোধ বচন ॥
রাক্ষস বানর আর যত আছে সেনা।
সাজন করিয়া মারি শিশু দুই জনা ॥
সুমন্ত্রের প্রতি রাম করেন জ্ঞাপন।
বাছিয়া সাজাও রথ অপূর্ব্ব দর্শন ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা সুমন্ত্র সারথি।
কনকে রচিত রথ আনে শীঘ্রগতি ॥
চড়েন পুষ্পক রথে শ্রীরাম প্রবীণ।
শুভযাত্রা কবি রাম চলেন দক্ষিণ ॥
চলিল ছাপ্পান্ন কোটি মুখ্য সেনাপতি।
তিন কোটি চলে তাহে মদমত্ত হাতী ॥
চলিল তিরাশী কোটি শ্রেষ্ঠ তাজী ঘোড়া।
অক্ষৌহিণী সত্তরি চলিল ভূমি যোড়া ॥
তিন কোটি মহারথী চলিল প্রধান।
সর্ব্বক্ষণ থাকে তারা রাম বিদ্যমান ॥
মহারথী চলিল যতেক রাজধানী।
পাত্রমিত্র সব চলে করিয়া সাজনি ॥
শ্রীরামের সেনা ঠাট কটক অপার।
দেখিলে যমের লাগে চিত্তে চমৎকার ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ চলে লয়ে কপিগণ।
গবাক্ষ শরভ গয় সে গন্ধমাদন ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে বানর সম্পাতি।
চলিল ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি ॥
আশী কোটি বীরে চলে পবননন্দন।
তিন কোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ ॥
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস বানর।
আরো কত সেনা যায় যুড়ি চরাচর ॥
বিজয় সুমন্ত্র নড়ে কশ্যপ পিঙ্গল।
শত্রুজিৎ মহাবল চলিল সকল ॥

রুদ্রমুখ চলে আর সুরক্তলোচন।
রক্তবর্ণ মহাকায় ঘোর দরশন ॥
রথের উপরে রাম চড়েন সত্বর।
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস বানর ॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
শ্রীরামের বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিণী ॥
কৃত্তিবাস কবি কহে অমৃত কাহিনী।
দুই বালকের তরে এতেক সাজনি ॥

লবকুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধ

কটক হইল পার নদনদী নীরে।
জল শুকাইল কটকের পদ ভরে ॥
নদী শুকাইয়া মাটি হৈল গুঁড়া গুঁড়া।
গগন মণ্ডলে লাগে কটকের ধুলা ॥
সমরে গেলেন রাম কমল লোচন।
পড়িয়াছে ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন ॥
আর পড়িয়াছে ঠাঁই ছয় অক্ষৌহিণী।
দেখিয়া উদ্বিগ্ন বড় হন রঘুমণি ॥
লব কুশ দুই ভাই করে অনুমান।
এই বুঝি সৈন্য লয়ে আইলেন রাম ॥
সংগ্রামে পণ্ডিত অতি বিখ্যাত শ্রীরাম।
ইহাকে যুঝিতে পারি তবে থাকে নাম ॥
এই যুক্তি দুই ভাই করে কাণাকাণি।
হেনকালে আইলেন সীতাঠাকুরাণী ॥
জানকী বলেন কিবা কর দুই ভাই।
কটকের মহারোল শুনিতে যে পাই ॥
কার সনে করিয়াছ বাদ বিসম্বাদ।
কোন্ দিনে লবকুশ পাড়িবা প্রমাদ ॥
উভয়ে করেন সীতাদেবী সাবধান।
শত শত আশীর্ব্বাদ করেন কল্যাণ ॥
অভাগীর পুত্র তোরা নির্ধনের ধন।
অন্ধের নয়ন তোরা মায়ের জীবন ॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তোসবার যুদ্ধে কারো নাহি অব্যাহতি ॥
তোসবার সনে যে আসিয়া করে রণ।
বাহুড়িয়া দেশেতে না যাবে একজন ॥
অব্যর্থ সীতার বাক্য নহে অন্যমত।
যা বলেন যাহারে সে ফলিবে নিশ্চিত ॥
এতেক বলিয়া সীতা চলিলেন ঘর।
চরণ বন্দিয়া চলে দুই সহোদর ॥
রামের সহিত যুদ্ধ করে এই মন।
সেইমত করিলেন বেশ দুইজন ॥
তূণপূর্ণ বাণ নিল ধনু নিল হাতে।
যুঝিবারে দুইভাই চলে আনন্দেতে ॥
যেখানে শ্রীরাম তথা গেল দুইজন।
তিন রাম এক ঠাঁই দেখে সর্ব্বজন ॥
এক বল এক রূপ একই সুঠাম।
একই বিক্রম সবে দেখে তিন রাম ॥
রাক্ষস বানর আদি যত সেনাপতি।
অনুমান করে তারা বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥
পঞ্চমাস গর্ভবতী জানকী যখন।
সেকালে তাঁহারে রাম করেন বর্জ্জন ॥
লক্ষ্মণ আনিয়া তাঁরে রাখে এই বনে।
ইহারা সীতার পুত্র হেন লয় মনে ॥
সেই গর্ভে হইল যমজ সহোদর।
ত্রিভুবন জয়ী দুই বীর ধনুর্দ্ধর ॥
এই কথা রঘুনাথ করি অনুমান।
নতুবা ইহারা কেন তোমার সমান ॥
এ দুয়ের যুদ্ধে, রাম, না দেখি নিস্তার।
প্রাণ লয়ে দেশপ্রতি কর আগুসার ॥
এই যুক্তি শ্রীরামেরে বলে সেনাপতি।
হেনকালে নিবেদয়ে সুমন্ত্র সারথি ॥
পঞ্চমাস যখন জানকী গর্ভবতী।
হেনকালে তাঁহারে বর্জ্জিলা রঘুপতি ॥

থুইয়া তাঁহারে মোরা এই বনবাসে ।
আমি ও লক্ষ্মণ দোঁহে ফিরিলাম দেশে ॥
অতএব রঘুনাথ এই সেই বন ।
এ দুই সীতার পুত্র হেন লয় মন ।।
যমজ সোদর দুই বুঝি এ প্রকার ।
পরিচয় লহ প্রভু তোমার কুমার ।।
সুমন্ত্রের কথা শুনি রামের বিস্ময় ।
উভয়ের কাছে গিয়া দেন পরিচয় ॥
রাজা দশরথের তনয় আমি রাম ।
তোমরা আমারি মত ধর রূপ শ্যাম ॥
তেজ ধর আমারি আমারি ধনুর্ব্বাণ ।
আকৃতি-প্রকৃতি দেখি আমারি সমান ॥
পরাক্রম আমারি না হয় অন্য জ্ঞান ।
অতএব কহি আমি বলহ বিধান ॥
তেঁই সে কারণে আমি পরিচয় চাই ।
পরিচয় দেহ কে তোমরা দুই ভাই ।।
পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন ।
এমন হইলে আমি না করিব রণ ।।
না জানিয়া মারিব কি আপন তনয় ।
যাবৎ না লই প্রাণ দেহ পরিচয় ।।
শুনিয়া সে কথা দোঁহে করে কাণাকাণি ।
কেমনে বলিব নাম বাপে নাহি চিনি ।।
আজি গিয়া জিজ্ঞাসিব জননীর ঠাঁই ।
কার পুত্র আমরা যমজ দুইভাই ।।
দুইভাই যুক্তি করে কেহ নাহি শুনে ।
ডাকিয়া রামেরে বলে তর্জ্জনে গর্জ্জনে ।।
এতদিনে অবোধের সনে দরশন ।
পরিচয় দিলে হবে কোন্ প্রয়োজন ।।
পুত্র হয়ে পিতৃসনে কেবা করে রণ ।
আপনার পুত্র বলি ভাব মনে মন ॥
আমা দোঁহে দেখিয়া যে কাঁপিলে অন্তরে ।
পরিচয় তেকারণে চাহ বারে বারে ।।
তোমারে কহিব যে শুন অবোধ শ্রীরাম ।
বড় ভয় পাও তুমি করিতে সংগ্রাম ॥
দুইভাই চতুর না জানে পিতৃনাম ।
ভাণ্ডাইল ছল করি বুঝিল শ্রীরাম ।।
পরিচয় নহিল হইল গালাগালি ।
সর্ব্বসৈন্য বেড়ে লবকুশ মহাবলী ।।
শ্রীরাম বলেন নাহি দিল পরিচয় ।
সাবধানে যুঝ সৈন্য না করিহ ভয় ।।
আমার ছাপ্পান্নকোটি মুখ্যসেনাপতি ।
তিনকোটি আমার যে মদমত্ত হাতী ।।
আছয়ে তিরাশীকোটি শ্রেষ্ঠজাতি ঘোড়া ।
অক্ষৌহিণী সত্তরি কটকে পৃথ্বীজোড়া ।।
সুগ্রীব ও অঙ্গদের আছে কোটি সেনা ॥
যার যুদ্ধে দেবদৈত্য কাঁপে সর্ব্বজনা ॥
ভল্লুক অসংখ্য আছে রাক্ষসবানর ।
আমার অনেক ঠাট কটক বিস্তর ।।
এতেক কটক পড়ে যদি আজি রণে ।
তবে অপযশ মোর ঘুষিবে ভুবনে ॥
বাছিয়া বাছিয়া বীর দেহ চারিভিতে ।
বেড়ো যেন দুইশিশু নারে পলাইতে ॥
মন্ত্রিগণসহ রাম করেন মন্ত্রণা ।
বাছিয়া কটক দিল চারিভিতে থানা ॥
হস্তীঘোড়া চালাইল প্রথমত রণে ।
বিপক্ষ মরুক ঘোড়াহাতীর চাপনে ।।
পাইয়া রামের আজ্ঞা কটকের ত্বরা ।
চালায় প্রথম রণে হাতী আর ঘোড়া ॥
রাহুত মাহুত ধায় শিশু ধরিবারে ।
দুইভাই দুইভিতে ধনুর্ব্বাণ যোড়ে ॥
লব বলে কুশভাই যুক্তি কর সার ।
রামসৈন্য কাটিয়া করিব চুরমার ।।
দুইভাই কুপিয়া ধনুকে বাণ যোড়ে ।
হস্তীঘোড়া কাটিয়া গগনে বাণ উড়ে ।।

লব এড়িলেক বাণ নামেতে আহুতি ।
একবাণে কাটিয়া পাড়িল কোটি হাতী ।।
কুশবাণ এড়িল নামেতে অশ্বকলা ।
কাটিল তিরাশীকোটি তুরঙ্গের গলা ॥
চারিভিতে সৈন্য যুঝে লবকুশমাঝে ।
নানা-অস্ত্র লইয়া সে দুইভাই যুঝে ।।
সৈন্য দেখি দুইভাই ভাবিত অন্তর ।
কেমনে মারিব ঠাট কটক বিস্তর ।।
এত সৈন্য লইয়া যুঝিতে এল রাম ।
ইহাকে মারিতে পারি তবে রহে নাম ।।
সতীপুত্র হই যদি থাকে মুনিবর ।
এখনি মারিয়া পাঠাইব যমঘর ।।
মুনির আশিসে হয় সর্ব্বত্র কল্যাণ ।
সন্ধান পূরিয়া লবকুশে এড়ে বাণ ।।
ষট্চক্র বাণ লব পূরিল সন্ধান ।
ত্রিভুবন যুঝে যদি নাহি ধরে টান ॥
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম ।
বেড়াপাক বাণে কুশ পূরিল সন্ধান ॥
হেন বাণ দুইভাই যুড়িল ধনুকে ।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে উঠে অন্তরীক্ষে ॥
সিংহের গর্জ্জনে বাণ তারা যেন ছুটে
সত্তরি অক্ষৌহিণী সেনা দুইভাই কাটে ॥
সমরে আসিয়াছিল ভল্লুক বানর ।
হাতে করি কেহ গাছ কেহ বা পাথর ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ যুঝে বীর হনুমান ।
কোটি কোটি সেনাপতি যুঝেসাবধান ।।
রাক্ষস ভল্লুক কপি রূপে ভয়ংকর ।
নানা অস্ত্র এড়ে তারা পাদপ পাথর ।।
রাক্ষস বানর আর যতেক ভল্লুক ।
নিরখিয়া কুশলব করিছে কৌতুক ।।
লব বলে কুশভাই শুনহ বচন ।।
দেখ দেখ কটকের বিকট বদন ।।

হেন সব মুখ কভু নাহি দেখি আর ।
দেখিতে শরীর যেন পর্ব্বত আকার ॥
বানর ভল্লুক বীর যুঝিছে বিস্তর ।
নানা অস্ত্র এড়ে তারা পাদপ পাথর ॥
রাক্ষসেরা বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান ।
লবকুশে দেখিয়া না হয় আগুয়ান ॥
লব বলে কুশভাই কার মুখ চাই ।
বিকট কটক মারি পাড়ি দুই ভাই ।।
সেই দিকে দুই ভাই পূরিল সন্ধান ।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ ॥
বাণে বিন্ধ রাক্ষস বানর যত পড়ে ।
যেমন কদলী বৃক্ষ পড়ে মহাঝড়ে ॥
লব বলে কুশের কি শিক্ষা চমৎকার ।
রাক্ষস বানর আদি পড়িল অপার ॥
পরে যুদ্ধে আইলেন সুগ্রীব বানর ।
দ্বাদশ যোজন আনে পর্ব্বত সত্বর ॥
ক্রোধভরে পর্ব্বত উপাড়ে দুই হাতে ।
ইচ্ছা করে মারে লব কুশের শিরেতে ॥
বাণে কাটি লব কুশ করে খান খান ।
আর বাণে সুগ্রীবের লইল পরাণ ॥
তবে ত অঙ্গদ বীর আইল সত্বরে ।
ধরিবারে চাহে দোঁহে আপনার জোরে ॥
এতেক ভাবিয়া বীর লাফ দিয়া যায় ।
লব কুশ বাণ এড়ে পড়ে তার গায় ॥
পড়িল অঙ্গদবীর সেইবাণ খেয়ে ।
হনুমান আইলেন হাতে গদা লয়ে ॥
পর্ব্বত এড়িল লবকুশের উদ্দেশে ।
বাণে কাটি লব কুশ উড়ায় আকাশে ।
কুশ বাণ মারে তবে হনুর উপরে ।
মূর্চ্ছিত হইয়া হনু পড়িল সমরে ॥
দেখিয়া হনুরদশা অপর বানর ।
ত্রাসে পলাইয়া যায় হইয়া কাতর ॥

বেড়াপাক বাণ কুশ পূরিল সন্ধান।
বেড়াপাকে সবাকার লইল পরাণ ॥
রাক্ষস ভল্লুক আর পড়ে কপিগণ।
এড়াইল সে সবার মধ্যে তিনজন ॥
অমর বলিয়া বাঁচে সেই তিন বীর।
দুই কটকের রক্ত বহে যেন নীর ॥
রক্তেতে ভাসিয়া নদী হইল পাথার।
দেখিয়া রামের মনে লাগে চমৎকার ॥
আছিল ছাপ্পান্ন কোটি শ্রীরামের সেনা।
হস্তী ঘোড়া ঠাট তার নাহি একজনা ॥
শ্রীরামের সেনাপতি বীর মহামতি।
গিয়াছিল রণস্থলে সৈন্যের সংহতি ॥
শ্রীরামের আগে কহে করি যোড়হাত।
প্রাণ লয়ে দেশেতে চলহ রঘুনাথ ॥
যদি, রঘুনাথ, দেশে করহ গমন।
তবে ত সবার রক্ষা নতুবা মরণ ॥
শিশু নহে দুইজন সাক্ষাৎ যে যম।
ত্রিভুবনে বীর নাহি এ দোঁহার সম ॥
শ্রীরাম বলেন আমি এনু সৈন্য সাথে।
সব সৈন্য মজাইয়া যাইব কি মতে ॥
মজাইয়া সর্ব্বস্ব কেমনে যাব ঘর।
সাবধানে যুঝ সৈন্য না করিহ ডর ॥
সেনাপতি সকলে রামের আজ্ঞা পায়।
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি যুঝিবারে যায় ॥
একবারে সব সৈন্য পূরিল সন্ধান।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ ॥
কোটি কোটি চোখ বাণ সেনাপতি এড়ে।
লবকুশে নিরখিয়া আগু নাহি সরে ॥
সেনাপতি সকলে লাগে চমৎকার।
পলাইয়া সব সৈন্য হৈল ছত্রাকার।
সেনাপতি ভঙ্গ দিল লবকুশ হাসে।
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে লবকুশে ॥
যুদ্ধে ভঙ্গ দিল তব যত সেনাপতি।
হেন ঠাট কেন, রাম, আনহ সংহতি ॥
পাইয়া শ্রীরাম লজ্জা করেন উত্তর।
যায় যাক ঠাট আমি আছি একেশ্বর ॥
আমি আছি একাকী তোমরা দুইজন।
একবাণে পাঠাইব যমের সদন ॥
তিনজনে এত যদি বচসা হইল।
সে সকল সেনাপতি আবার আইল ॥
চারিদিক ছেয়ে লব কুশেরে বেড়িলে।
নিরখিয়া লব কুশ অগ্নিহেন জ্বলে ॥
সেনাপতি সকলে ধনুকে যোড়ে বাণ।
লবকুশে দেখিয়া নাহয় আগুয়ান ॥
সেনাপতিগণের যতেক অস্ত্র ছিল।
ফুরাইল সব বাণ তূণ শূন্য হৈল ॥
সেনাপতিগণে রণে করিল বিরথী।
বলে লব কুশ সেনাসকলের প্রতি ॥
তোমা সবাকার যুদ্ধ হৈল অবসান।
মোরা দুইভাই পূরি এখন সন্ধান ॥
এড়িলেক বাণ গোটা তারা যেন ছুটে।
সেনাপতি ছাপ্পান্ন কোটি মাথা কাটে ॥
বাসুকি তক্ষক যেন বাণের গর্জ্জন।
পড়িল সকল সৈন্য নাহি একজন ॥
পড়িল সকল সৈন্য নাহিক দোসর।
সবেমাত্র শ্রীরাম আছেন একেশ্বর ॥
চিন্তা করয়ে শ্রীরাম হইয়া উদাস।
ডাক দিয়া লব কুশ করে উপহাস ॥
সর্ব্বলোকে বলেতোমা ধার্ম্মিক শ্রীরাম।
অলক্ষিতে তুমি যত করিলা সংগ্রাম ॥
দুইজনের প্রতি যদি তিনজন রোষে।
ধর্ম্মনাশ হয় মরে আপনার দোষে ॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটকের নাহি সংখ্যা।
সতীপুত্র আমরা যে তেঁই পাই রক্ষা ॥

কহেন শ্রীরাম কিছু হইয়া লজ্জিত।
তোমরা যে কিছু বল নহে অনুচিত ॥
পৃথিবীমণ্ডলে আমি রাজচক্রবর্ত্তী।
না জানি কতেক ঠাট আইল সংহতি ॥
আমারে জিনিতে কে পারে ত্রিভুবনে।
পুত্র বিনা আমাকে নাহিক কেহ জিনে ॥
আমার পুত্রের স্থানে আছে পরাজয়।
পিতাকে জিনিতে পুত্র পারে শাস্ত্রে কয় ॥
আমার আকৃতি দেখি তোমরা দুজন।
মম পুত্র হও যদি না করিহ রণ ॥
পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন।
লব কুশ বলিয়া তোমরা দুইজন ॥
রাবণ দুর্জ্জয় বীর ছিল লঙ্কাদেশে।
আমার সহিত রণে মরিল সবংশে ॥
শুনিয়া রামের কথা দুইভাই হাসে।
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে অবশেষে ॥
শুনহ তোমারে বলি অবোধ শ্রীরাম।
বড় ভয় পেলে তুমি করিতে সংগ্রাম ॥
পুত্র পুত্র বলিয়া চাহিছ পরিচয়।
হেন বুঝি সমর করিতে ভয় হয় ॥
কোথা শুনিয়াছ তুমি পিতাপুত্রে রণ।
আপনার পুত্র বলি ভাব মনে মন ॥
রণেতে পণ্ডিত তুমি নিজে মহারাজ।
বারে বারে পুত্র বল নাহি বাস লাজ ॥
রাবণে মারিয়া কত আপনা বাখান।
পড়িলে বীরের হাতে ভালমতে জান ॥
অধিক কি কব রাম শুনহ উত্তর।
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলা কাতর ॥
আমরা মুনির পুত্র সেইমত বল।
তুমি ত ধরণীপতি কেন কর ছল ॥
শ্রীরাম বলেন শুন বলি লব কুশ।
বালকের সহ যুদ্ধে কি হবে পৌরুষ ॥
তোমা দোঁহে দেখি যেন আমার আকৃতি।
পরিচয় না দিলে তোমরা অল্পমতি ॥
কটক পড়িল আমি না যাইব দেশে।
অবশ্য করিব রণ যেবা হয় শেষে ॥
আমার সহিত যুদ্ধে কারো নাহি রক্ষা।
এখনি দেখাই যত অস্ত্রের পরীক্ষা ॥
পিতাপুত্রে গালাগালি কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিনজনে ॥
মহাক্রোধে রঘুনাথ পুরেন সন্ধান।
দুইশিশু উপরে এড়েন মহাবাণ ॥
নানা-অস্ত্র এড়েন শ্রীরাম কোপান্বিত।
মহাব্যস্ত লব কুশ পলায় ত্বরিত ॥
দুইভাই পলাইল রাম পান আশ।
তাঁহার বাণেতে গিয়া ছাইল আকাশ ॥
অন্ধকার সংসার হইল সেই বাণে।
আগু হৈয়া যুঝিতে না পারে দুইজনে ॥
এইমত দুইভাই গেল পলাইয়া।
বিলাপ করেন রাম রথেতে বসিয়া ॥

শ্রীরামের বিলাপ

হরি হরি ক্ষুণ্ণ মন দেখিয়া অদ্ভুত রণ
ভূমিতে বসিয়া রঘুনাথ।
ভ্রাতৃমৃত্যু সৈন্যধ্বংস পরাভূত রঘুবংশ
শোকানলে হয় অশ্রুপাত ॥
দেব যদি হয় বাম সিদ্ধ নহে কোন কাম
যজ্ঞ হৈল সংহার কারণ।
তখনি জানিল মন জিনিতে নারিব রণ
যখনি পড়িল শত্রুঘন ॥
সুদিন কুদিন দুই বিধাতার সৃষ্টি এই
এবে সেই বীর হনুমান।
যে গন্ধমাদন আনে কুম্ভকর্ণে জিনে রণে
লোটায় শিশুর খেয়ে বাণ ॥

সুগ্রীব প্রভৃতি বলে সহায় সাগর জলে
মহাযুদ্ধ কৈল লঙ্কাপুরে ।
হেন জনে শিশু মারে অঙ্গদ দেবেন্দ্রমরে
এত করাইল দৈব মোরে ॥
কত ব্রহ্মবধ কৈনু যজ্ঞমধ্যে ভস্ম দিনু
পাতক করিনু কত আর ।
কত বড় নাম ছিল দণ্ডমধ্যে ভস্ম হৈল
পরাভব হইল আমার ॥
যে বংশে সগর রাজা রঘুবীর মহাতেজা
ভগীরথ বেণ মহাশয় ।
হেন বংশে জনমিয়া না করি বংশের ক্রিয়া
জিনে মোরে মুনির তনয় ॥
মরিল যে তিনভাই মিত্রবর্গ কেহ নাই
যে সবারে আনিলাম রণে ।
মরিল যাহার পতি অনাথা হইল সতী
অকীর্ত্তি রহিল এ ভুবনে ॥
বিধাতা নির্দ্দয় হয়ে এত বড় বাড়াইয়ে
সর্ব্বনাশ করিলেক শেষে ।
হায় হায় কি হইল বংশে কেহ না থাকিল
পৃথিবী পূরিল অপযশে ॥
মাতৃগণ আছে ঘরে প্রাণ দিবে অনাহারে
শত্রুগণে নাশিবেক পুরী ।
অযোধ্যা কিষ্কিন্ধ্যা লঙ্কা হইল জীবনশঙ্কা
পতিহীন হৈল সর্ব্বনারী ॥
সূর্য্যবিনা দিবা নহে জল বিনা মৎস্য দহে
অরাজক পুরীর সংহার ।
এই সে থাকিল দুঃখ না দেখি বন্ধুর মুখ
কোথায় রহিল পরিবার ॥
বিদরিয়া যায় বুক না দেখি সীতার মুখ
মজিল যে অযোধ্যার রাজ্য ।
চারিভাই একমাসে মরিলাম একদেশে
প্রতিকূল বিধির এ কার্য্য ॥
দুই শিশু যমসম নর বলি করি ভ্রম
কুম্ভকর্ণ কিম্বা দশানন ।
জাতিস্মর দুইজন করিতে আইল রণ
পূর্ব্ববৈর করিতে সাধন ॥
কিম্বা সে দূষণ খর হইয়া আইল নর
পূর্ব্ববৈরী করিতে সংহার ।
মারিল সকলজনে সুগ্রীব শ্রীবিভীষণে
যত সব সুহৃদ আমার ॥
সুহৃদ আছিল যারা সবে গতপ্রাণ তারা
আর কারে করিব সহায় ।
আজি শিশুদ্বয়ে মারি অথবা আপনি মরি
তবে ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষা পায় ॥
আজি দুইশিশু মারি সে রক্তে তর্পণ করি
তবে আমি রঘুবংশ হই ।
যুঝিব শিশুর সনে এই দাঁড়াইনু রণে
নাহি দেখি গতি ইহা বই ॥
এতেক ভাবিয়া মনে শ্রীরাম চলেন রণে
জীবনেতে হইয়া হতাশ ।
রামায়ণ সুধাভাণ্ড তাহার উত্তরাকাণ্ড
গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

লব কুশের সহিত যুদ্ধে শ্রীরামের পরাজয়

কুশ বলে লব তুমি মোর জ্যেষ্ঠভাই ।
হারিয়া কি পলাইব মোরা রাম ঠাঁই ॥
একেবারে দুই ভাই করিব সংগ্রাম ।
চল ঝাট মারি গিয়া আমরা শ্রীরাম ॥
কুশ হৈতে অস্ত্র শিক্ষা লব ভাল ধরে ।
এড়িয়া চিকুরবাণ দিক আলো করে ॥
লবের বাণেতে ব্যর্থ শ্রীরামের বাণ ।
আকাশেতে জ্বলে অগ্নি পর্ব্বত সমান ॥

লবের বাণেতে সব অন্ধকার ঘুচে ।
সন্ধান পূরিয়া গেল শ্রীরামের কাছে ।।
একেবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান ।
বাণের প্রতাপ দেখি পাছু হন রাম ।।
ক্ষণে রাম আগু হন ক্ষণে দুই ভাই ।
বাণের ঠনঠনি শব্দ লেখাজোখা নাই ।।
হইল রামের বাণে ক্লান্ত দুই জন ।
শঙ্কান্বিত লব কুশ ভাবে মনে মন ।।
যে অস্ত্র যোড়েন রাম করিয়া শৃঙ্খলা ।
লব কুশের গলে সে হয় পুষ্পমালা ।।
লব কুশ দুই ভাই যে যে অস্ত্র ফেলে ।
রামের চরণ বন্দি প্রবেশ পাতালে ।
এইরূপে পিতাপুত্রে বাজিল সমর ।
স্বর্গেতে কৌতুক দেখে যতেক অমর ।।
কেহ কারে নাহি পারে সমান উভয় ।
পিতার সদৃশ পুত্র কেহ ছোট নয় ।।
দুই দিকে দুই ভাই রাম একেশ্বর ।
বাণে বিদ্ধ হয়ে রাম হইলা কাতর ।।
নানা অস্ত্র দুই ভাই এড়ে দুই ভিতে ।
কোন্ দিক রাখিবেন শ্রীরাম চিন্তিত ।।
চাহিতে লবের পানে কুশ এড়ে বাণ
লব বিন্ধে যদ্যপি কুশের পানে চান ।।
একেবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান ।।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়ে শ্রীরাম ।।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ যেই আছে ব্রহ্মশাপ ।
সমরে পুত্রের হাতে হারিবেন বাপ ।।
লব এড়িলেক বাণ নামে অস্ত্রকলা ।
ধনুর্ব্বাণসহিত রামের বান্ধে গলা ।।
কুশ বাণ এড়িল অক্ষয়জিৎ নাম ।
বুকেতে বাজিয়া ভূমে পড়িলেন রাম ।।
ছটফট করে রাম প্রাণমাত্র আছে ।
শীঘ্র গেল দুইভাই শ্রীরামের কাছে ।।
নড়িতে নারেন রাম বাণে অচেতন ।
লবকুশ কাড়ি লয় গায়ের আভরণ ।।
কানের কুণ্ডল নিল মাথার টোপর ।
নিল হার কেয়ূর হাতের ধনুঃশর ।।
সংগ্রামের বেশ কাড়ি লয় দুইভাই ।
অস্ত্র শস্ত্র ধনুর্ব্বাণ কিছু ছাড়ে নাই ।।
হনুমান জাম্ববান উভয় অমর ।
দুইজন নাহি মরে শত মন্বন্তর ।।
উঠিবার শক্তি নাই বাণে অচেতন ।
সেই পথ দিয়া লব কুশের গমন ।।
যাইতে দেখিল পথে বানর ভল্লুক ।
মুখ দেখি উভয়ের বাড়িল কৌতুক ।।
সাঙ্গি বান্ধি উভয়কে লইলেক স্কন্ধে ।
রণজয়ী দুইভাই চলিল আনন্দে ।।

সীতার নিকট লবকুশের যুদ্ধবার্ত্তাকথন
সীতার বিলাপ ও প্রাণত্যাগের সংকল্প

সত্বর দিবসে দুইভাই গেল ঘর ।
কান্দিয়া জানকীদেবী অত্যন্ত কাতর ।।
হনুমান জাম্ববান দুর্জ্জয় শরীর ।
দ্বারে না সান্ধায় তেঁই থুইল বাহির ।।
একদৃষ্টে জানকী চাহেন করি ধ্যান ।
হেনকালে দুইভাই গেল সেইস্থান ।।
দেখিয়া জানকী হইলেন উতরোলী ।
দুইভাই লইল মায়ের পদধূলি ।।
দুইভাই বসিল মায়ের বিদ্যমান ।
যুদ্ধ কথা কহিতে লাগিল তাঁর স্থান ।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যে ভরত শত্রুঘ্ন ।
এ সবার সহিত করিনু বহু রণ ।।
বহু অক্ষৌহিণী সেনা ভাই চারিজন ।
বাহুড়িয়া দেশেতে না করিল গমন ।।

এসেছিল যত সেনা কেহ তার নাই ।
কহি সে অপূর্ব্ব কথা শুন মাতা তাই॥
দুর্জ্জয় দুইটা জন্তু এনেছি বান্ধিয়া ।
দ্বারে না আইসে মাগো দেখহ আসিয়া ॥
ধনুর্ব্বাণ আনিয়াছি রথের সাজন ।
এই দেখ এনেছি রামের আভরণ ॥
দেখিয়া জানকী দেবী চিনিয়া তখন ।
শিরে করি করাঘাত করয়ে রোদন ॥
হায় হায় কি করিলি ওরে লবকুশ ।
পিতৃহত্যা করিয়া কি রাখিলি পৌরুষ॥
কোন্‌খানে মারিলি সে কমললোচনে ।
ঝট চল পড়ি গিয়া প্রভুর চরণে ॥
কেমনে দেখিব গিয়া শ্রীরামলক্ষ্মণ ।
কেমনে দেখিব সে ভরতশত্রুঘ্ন ॥
কোন্‌খানে হয়েছিল সমর প্রসঙ্গ ।
শৃগালকুক্কুর পাছে স্পর্শে প্রভু-অঙ্গ ॥
ধাইয়া যায় সীতাদেবী কেশ নাহি বান্ধে।
তাঁর পিছে শিরে হাত দুইভাই কান্দে ॥
সীতা আসি বাহিরে দেখেন বিদ্যমান ।
হস্তপদ বান্ধা হনুমান জাম্বুবান ॥
মৃতপ্রায় অচেতন বহে মাত্র শ্বাস ।
দেখিয়া সীতার মনে হইল হুতাশ ॥
জানকী বলেন, লব, কি করিলি কর্ম্ম ।
তোরা বিদ্যা শিখিয়া না শিখিলি জাতিধর্ম্ম ॥
তোমা হতে জ্যেষ্ঠপুত্র হয় হনুমান ।
এই হনুমান মোর দিলা প্রাণদান ॥
বানর হইয়া গেল সাগরের পার ।
হনুমান-পুত্র মোরে করেছে উদ্ধার ।
ইহারে করিলি বধ অবোধ বালক ।
শুনিলে এ সব কথা কি কহিবে লোক ॥
পিতা পিতৃব্যের তোরা বধিলি জীবন ।
বিষপান করি প্রাণ ত্যজিব এখন ॥

এখনি মরিব আমি প্রভুর সাক্ষাতে ।
কলঙ্ক না লুকাইবে ঘুষিবে জগতে ॥
কোথায় মারিলি তাঁরে ঝট চল দেখি ।
এতক্ষণ প্রাণ আর কার তরে রাখি ॥
অশ্রুজলে জানকীর তিতিল বসন ।
লব কুশ প্রতি কত করেন ভর্ৎসন ॥
শীঘ্র লবকুশ, এই ঘুচাও বন্ধন ।
হনুমান জাম্বুবানে করহ মোচন ॥
পাইয়া মায়ের আজ্ঞা ভাই দুইজন ।
খসাইল উভয়ের সে দৃঢ়বন্ধন ॥
উঠিয়া বসিল জাম্বুমান-হনুমান ।
কহিলেন সীতাদেবী আসি বিদ্যমান ॥
এক সত্য, হনুমান, করিহ পালন ।
কারো ঠাই না কহিও এ সব বচন ॥
তোমার রামের পুত্র এই দুইভাই ।
না চিনিল করিল যুদ্ধ ক্রোধ করো নাই ॥
যান সীতা মণিহারা ভুজঙ্গিনী প্রায় ।
ক্রন্দন করিয়া তাঁর পিছু দোঁহে যায় ॥
শ্রীরাম-উদ্দেশেতে চলেন তিনজন ।
উপস্থিত হইলেন যথা হেল রণ ॥
দেখিলেন সংগ্রামে পড়িয়া চারিজন ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন ॥
হস্তীঘোড়াঠাট কত পড়েছে অপার ।
দেখিয়া ত জানকী করেন হাহাকার ॥
কাতর হইয়া সীতা করেন ক্রন্দন ।
রামের চরণ ধরি কহেন তখন ॥
হইয়া তোমার পুত্র মারিল তোমারে ।
এ কেবল ঘটে সে আমার কর্ম্মফেরে ॥
মন্দর তোমার বাণে নাহি ধরে টান ।
ছাবালের বাণে প্রভু হারাইলে প্রাণ ॥
সর্ব্বলোকে বলিতেন অবিধবা সীতা ।
আমারে বিধবা করে কেমন বিধাতা ॥

অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন।
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ ॥
শিরে হাত লবকুশ করিছে ক্রন্দন।
মায়ের চরণ ধরি বলিছে বচন ॥
ক্ষমা কর, জননি গো, না কর ক্রন্দন।
মজিলাম তবদোষে মোরা তিনজন ॥
তুমি না বলিলে মাতা রাম হন পিতা।
আপনার দোষে এত হইলে তাপিতা ॥
পিতৃবধ করিয়া পাইনু বড় লাজ।
অগ্নিতে পুড়িয়া মরি প্রাণে নাই কাজ ॥
এই মহাপাপে আর নাহিক নিস্তার।
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি হইব অঙ্গার ॥
সীতা বলে আগে অগ্নি করিব প্রবেশ।
যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও অবশেষ ॥
তিনজন গেলা তারা যমুনার তীরে।
তিনকুণ্ড কাটিলেন দুই সহোদরে ॥
তাহাতে আনিয়া কাষ্ঠ জ্বালিল অনল।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগনমণ্ডল ॥
স্নান করি পরিলেন পবিত্র বসন।
প্রদক্ষিণ করিলেন অগ্নি তিনজনে ॥

বাল্মীকির আগমন ও সসৈন্যে শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণদান

চিত্রকূটপর্ব্বতে বাল্মীকি তপোধন।
দেখিয়া অগ্নির ধূম বিচলিত মন ॥
রক্তেতে তর্পণ করে মুনির বিস্ময়।
তর্পণ করেন সব যেন রক্তময় ॥
মুনি বলে লবকুশ পাড়িল প্রমাদ।
দেশেতে চলেন মুনি করিয়া বিষাদ ॥
ছমাসের পথ এল চক্ষুর নিমেষ।
তিনজনে দেখে অগ্নি করিছে প্রবেশ ॥
অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়াছে মহামুনি দেখে।
হেনকালে গেল মুনি সীতার সম্মুখে ॥
গৃধিনী শকুনি আর শৃগালের রোল।
তপোবনে বহিতেছে রক্তের হিল্লোল ॥
দেখিয়া সীতার প্রতি জিজ্ঞাসেন মুনি।
প্রমাদ পড়িল কিবা কহ সীতা শুনি ॥
জানকী বলেন, প্রভু, না জান কারণ।
লব কুশ তোমার করিল মহারণ ॥
পড়িলেন তাহাতে রাঘব চারিজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন ॥
কেমনে কহিব কথা মুখে না আইসে।
পিতৃবধ করিলেক লব আর কুশে ॥
এতদিনে ভাল ছিনু তোমার প্রসাদে।
ধনুর্বিদ্যা শিখায়ে যে পড়িনু প্রমাদে ॥
তুমি নিজে দিলে মুনি নানা-অস্ত্রশিক্ষা।
ত্রিভুবন যুঝে যদি কারো নাহি রক্ষা ॥
আপনি শ্রী রঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে।
শিশু হয়ে সে রামেরে জিনে দুইজনে ॥
রঘুনাথ বিনা মোর না রবে জীবন।
অগ্নিতে প্রবেশ যাই করি তিনজন ॥
বাল্মীকি বলেন, সীতা, না ত্যজ জীবন।
বাঁচিবেন এখনি রাঘব চারিজন ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন।
উঠিবেন পড়িয়াছে আর যত জন ॥
ক্ষমা দেহ, জানকি, তোমারে বলি আমি।
দুই পুত্র লইয়া আশ্রমে চল তুমি ॥
জানকী বলেন দেখি প্রভুর চরণ।
তবে সে আশ্রমে আমি করিব গমন ॥
এতেক শুনিয়া মুনি বসিলেন ধ্যানে।
ত্রিভুবনে যত কথা মুনি সব জানে ॥
তপোবনে কুণ্ড আছে মৃত্যুজীবনী জল।
মুনি ধ্যান করিয়া সে জানিল সকল ॥

মুনি বলে শিষ্য শুন আমার বচনে।
এই জল ছড়াইয়া দেহ তপোবনে॥
মৃত সৈন্য পড়িয়াছে যত যত দূরে।
তত দূরে ছড়াইয়া দেহ এই নীরে॥
একমন্ত্র পড়ি জল দিলা মহামুনি।
তপোবনে ছড়াইয়া দিলেক তখনি॥
কটকের গায়েতে যতেক লাগে ছড়া।
অসংখ্য কটক উঠে দিয়া অঙ্গঝাড়া॥
মৃত্যুঞ্জীবী জল যদি হৈল পরশন।
শ্রীরামলক্ষ্মণ-আদি উঠিলা তখন॥
উঠিল ছাপ্পান্নকোটি মুখ্যসেনাপতি।
তিনকোটি উঠিলেক মদমত্ত হাতী॥
উঠিল তিরাশীকোটিশ্রেষ্ঠ তাজী ঘোড়া।
যত অক্ষৌহিণী উঠে অঙ্গে দিয়া ঝাড়া॥
সুগ্রীব অঙ্গদ উঠে লয়ে কপিগণ।
ভল্লুক রাক্ষস যত উঠে ততক্ষণ॥
কটকের কোলাহলে হৈল গণ্ডগোল।
মুনি বলে শুন সীতা কটকের রোল॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ-আদি যত যত বীর।
উঠে সৈন্যসামন্ত যত অক্ষতশরীর॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘ্ন।
দূর হৈতে দেখে সীতা পাইল জীবন॥
'রামজয়' করিয়া ডাকিছে কপিগণ।
মুনি বলে শুন সীতা আমার বচন॥
আমি হেথা থাকিলে না হইত এমন।
দুইপুত্র লৈয়া ঘরে করহ গমন॥
লব কুশ সীতা তিনে মুনি নমস্কারি।
লুকাইয়া রহিলেন বাল্মীকির পুরী॥
সীতাকে চিনিয়াছিল পবননন্দন।
পাসরিল বাল্মীকির মায়াতে তখন॥
শ্রীরামের সঙ্গে মুনি করে সম্ভাষণ।
চারিভাই করিলেন মুনিরে বন্দন॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, তোমার প্রসাদে।
রক্ষা পাইলাম সবে পড়িয়া প্রমাদে॥
কিন্তু মুনি জানিতে বাসনা মনে হয়।
কাহার তনয় দুটি দেহ পরিচয়॥
মুনি বলে, রাম, আমি না ছিলাম দেশে।
কাহার তনয় সেই না জানি বিশেষে॥
এখন সে বালকের না পাবে দর্শন।
দেশে লৈয়া আমি দোঁহে করাব মিলন॥
অশ্ব লয়ে রঘুনাথ যাও নিজ দেশে।
যজ্ঞে পূর্ণা দেহ গিয়া অশেষ বিশেষে॥
সকল সহিত রাম চলিলেন দেশে।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

লবকুশকর্তৃক রামায়ণগান

এ সব গাইল গীত জৈমিনি ভারতে।
সম্প্রতি যে কিছু গাই বাল্মীকির মতে।
ঘোড়া আনি কৈলা রাম যজ্ঞ সমাপন।
নানাদেশী ব্রাহ্মণেরে দিলা বহু ধন॥
বড় পরিপাটী যজ্ঞ করেন দুষ্কর।
শিষ্যসহ আইলা বাল্মীকি মুনিবর॥
মুনিরে দেখিয়া রাম সম্ভ্রমে উঠিয়া।
বসিতে আসন দেন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া॥
বারশত শিষ্য আইল মুনির সংহতি।
লবকুশ দুইভাই মিশাইল তথি॥
মুনির মিশালে আছে নাহি পরিচয়।
বিষ্ণু-অবতার দোঁহে রামের তনয়॥
শ্রীরাম বলেন শুন ভরত এখন।
মুনিরে রহিতে দেহ করি আয়োজন॥
লবকুশ দুইভাই মুনির সংহতি।
দুইভাই লৈয়া মুনি করেন যুকতি॥
মুনি বলে, লবকুশ, শুন সাবধানে।
ধনুকসংগীতবিদ্যা পাইলে মোর স্থানে॥

ধনুর্বিদ্যা দেখাইলা আমার গোচর।
বিক্রমে দুর্জ্জয় হও দুই সহোদর ॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে।
শিশু হয়ে তাঁহারে জিনিলা দুইজনে ॥
ধনুর্বিদ্যা তোমরা যে করিলা সুশিক্ষা।
সাক্ষাতে পেলাম আমি তাহার পরীক্ষা ॥
গীতবিদ্যা রামায়ণ শিখিলে দুজন।
শ্রীরামের আগে কালি গেয়ো রামায়ণ ॥
অনেক দ্বীপের রাজা আইল এ স্থানে।
রামায়ণগীত কালি গাইবে দুজনে ॥
দুইভাই কর মোর কবিত্ব প্রচার।
ঘুষিবারে থাকে যেন সকল সংসার ॥
যাহারে প্রসন্ন হন সরস্বতীদেবী।
আমি-আদি করিয়া সকলে তারা কবি ॥
সভা করি বসিবেন শ্রীরাম যখন।
সাবধানে গাইবে তোমরা রামায়ণ ॥
জিজ্ঞাসিবে রাম যবে সভার ভিতর।
বাল্মীকির শিষ্য হেন কহিও উত্তর ॥
আর যুক্তি বলি শুন তোমা দুইজন।
মিষ্টস্বরে উভয়েতে গাহ রামায়ণ ॥
যখন গাহিবে গীত সীতার বর্জ্জন।
না বলিও শ্রীরামেরে কোন কুবচন ॥
জগতের নাথ রাম পরমগর্ব্বিত।
কুকথা কহিতে তাঁরে না হয় উচিত ॥
যখন যাইবে দোঁহে রামের সভায়।
তখন করিবে বেশ তপস্বীর প্রায় ॥
বীরবেশ দেখিয়া পাবেন রাম ত্রাস।
আর বার এড়েন কি জীবনের আশ ॥
বিভাবরী-প্রভাতে উদিত ভানুমান।
দুইভাই করেন বাকল পরিধান ॥
শিরে জটা বান্ধিলেন দেখিতে সুঠাম।
পূর্ণচন্দ্র মুখ বর্ণ দুর্ব্বাদলশ্যাম ॥

হাতে বীণা করি দোঁহে করেন গমন।
মধুর ধ্বনিতে গান বেদ রামায়ণ ॥
হাটে মাঠে গীত গান নগরে বাজারে।
শুনিয়া সুন্দর সবে আপনা পাসরে ॥
কহিছে অমাত্যগণ রামেরে ত্বরিত।
শিশুমুখে মিষ্টগীত শুনিতে উচিত ॥
আনিতে তাদের রাম বলেন আদেশ।
যজ্ঞস্থানে দুইভাই করিল প্রবেশ ॥
বীণা হাতে করি তারা বসিল সভায়।
রামায়ণ শুনিবারে সব লোক যায় ॥
অবসর পাইয়া যজ্ঞের অবশেষে।
বসিলেন শ্রীরাম সভায় শুদ্ধবেশে ॥
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালনিবাসী যত জন।
আগমন করিলে শুনিতে রামায়ণ ॥
বসিল পণ্ডিতগণ জ্ঞানেতে পূরিত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ চারিভিত ॥
দুইভাই গীত গায় বাজাইয়া বীণা।
সর্ব্বলোক গীত শুনে অমৃতের কণা ॥
বীণাযন্ত্র বাজে আর গীত গায় স্বরে।
শুনিয়া সকল লোক আপনা পাসরে ॥
চারিভাই রঘুনাথ গীতে দেন মন।
মোহিত হইল লোক শুনে রামায়ণ ॥
সর্ব্বলোক সে সভায় বলে কাণাকাণি।
রামের আকৃতি দুইশিশু কি না জানি ॥
জটা আর বাকল যে এইমাত্র আন।
আকৃতিপ্রকৃতি দেখি রামের সমান ॥
এই দুই শিশুসহ করিলেন রণ।
শ্রীরামলক্ষ্মণ আর ভরতশত্রুঘন ॥
যুদ্ধ করে ত্রিভুবন না পারে সহিতে।
সংসার মোহিত করে রামায়ণগীতে ॥
তপস্বীর বেশ দোঁহে ধরিল এখন।
শিশু নহে দুইজন সাক্ষাৎ শমন ॥

শ্রীরাম হইতে দুই বালক দুর্জ্জয় ।
শ্রীরামেরে ইহারা করিল পরাজয় ।।
কোন্ বিধি নির্ম্মাণ করিল দুইজনে ।
এত গুণ ধরে কোথা আছে ত্রিভুবনে ।।
এই যুক্তি তারা সব করে সর্ব্বক্ষণ ।
ভুবন মোহিত হৈল শুনে রামায়ণ ।।
যতেক সভার লোক অনুমান করে ।
শ্রীরামের পুত্র এরা কভু নাহি নড়ে ।।
গাইল প্রথম দিনে বিংশতি শিকলি ।
সুরস সুচ্ছন্দ শান্তরস পদাবলী ।।
দুইভায়ের গীত যদি হৈল অবসান ।
শ্রীরাম বলেন রাখ গায়কের মান ।।
শুনিয়া সে শ্রীরামের বচন লক্ষ্মণ ।
অশীতিসহস্রতোলা আনেন কাঞ্চন ।।
গায়কেরে দিলেন পুরিয়া স্বর্ণথালা ।
পীতাম্বর অলংকার আর পুষ্পমালা ।।
উভয় গায়ক বলে শ্রীরঘুনন্দন ।
বস্ত্র অলংকারে কিছু নাহি প্রয়োজন ।।
কি করিবে ধনে বস্ত্রে আর অলংকারে ।
বস্ত্র-অলংকার রাখ আপন ভান্ডারে ।।
শ্রীরাম বলেন হে জিজ্ঞাসি এক বাণী ।
কে রচিল রামায়ণ কহ দেখি শুনি ।।
ইহা যদি শুনে লোক কিবা হয় ফল ।
বিশেষ জানহ যদি কহ এ সকল ।।
এত যদি জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথ ।
উঠে দুইগায়ক যে যোড় করি হাত ।।
দুইশিশু বলে শুন শ্রীরঘুনন্দন ।
জিজ্ঞাসিলা যত কিছু কহি বিবরণ ।।
চতুর্ব্বিংশসহস্র যে শ্লোক-পরিমাণ ।
পঞ্চশত সর্গে এই কাব্যের বাখান ।।
যেই নর শুনিবারে করে অভিলাষ ।
সর্ব্বপাপ ঘুচে তার স্বর্গে হয় বাস ।।

অপুত্রক শুনিলে সে পায় পুত্রবর ।
যে যাহা বাসনা করে পূর্ণ হয় তার ।।
অশ্বমেধ করিলা যে শ্রীরাম এখন ।
এই ফল পায় সে যে শুনে রামায়ণ ।।
তুমি না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর ।
অনাগত পুরাণ রচিলা মুনিবর ।।
অবতার না হইতে বাল্মীকির গাথা ।
আদিকান্ডে শ্রীরাম তোমার জন্মকথা ।।
শ্রীরাম অযোধ্যাকান্ডে পেলে ছত্রদণ্ড ।
রাজ্য হরি নিলা তাহে কৈকেয়ী পাষণ্ড ।।
তব পিতা দশরথ তার বাধ্য হয়ে ।
পাঠায় তোমারে বনে সত্যের লাগিয়ে ।।
অযোধ্যা ছাড়িয়া গেলা তুমি বনবাসে ।
শিরে হাত কান্দে সব স্ত্রী আর পুরুষে ।।
সংসার দেখিয়া শূন্য কান্দে সর্ব্বলোক ।
মরিলেন দশরথ পেয়ে তব শোক ।।
তুমি বনে ভরত সে মাতুলের পাড়া ।
চারিপুত্রসত্ত্বে রাজা হৈল বাসিমড়া ।
তৈলের ভিতরে বাসিমড়া দশরথ ।
অগ্নিকার্য্য কৈল দেশে আসিয়া ভরত ।।
আরণ্যকান্ডেতে সীতা হরে লংকেশ্বর ।
বধিলা রাক্ষস বহু মুখ্য যার খর ।।
দুই শোকে বড় তাপ শ্রীরাম পাইলে ।
কিষ্কিন্ধ্যায় বালি মারি সুগ্রীবে লভিলে ।।
সুন্দরাতে শ্রীরাম সাগর হৈলা পার ।
লংকায় রাবণ বীরে করিলে সংহার ।।
সীতার পরীক্ষা আর রাজা বিভীষণ ।
স্বর্গপিতা সম্ভাষিয়া দেশে আগমন ।।
আসিয়া হইলে তুমি পৃথিবীর রাজা ।
অযোধ্যায় থাকিয়া পালিছ তুমি প্রজা ।।
দশহাজার বর্ষ তব প্রজার পালন ।
ন হাজার বর্ষে বৃদ্ধ রাজার মরণ ।।

হাজার বছর ছিল পিতৃপরমাই ।
পরমায়ু পিতার পাইলে চারিভাই ।।
এগারহাজার বর্ষ করিবে পালন ।
সাতহাজার বর্ষে কর সীতারে বর্জ্জন ।।
গীত গায় যখন মায়ের বনবাস ।
তখন দোঁহার হয় গদগদ ভাষ ।।
দুর্ব্বাসা আসিয়াদ্বারে রহিবেন কোপে ।
লক্ষ্মণেরে বর্জ্জিবেন সেই মুনিশাপে ।।
স্বর্গবাসে যাইবেন লইয়া সংসার ।
ইহা বিনা বাল্মীকি না লিখিলেনআর ।।
তাহারা শিখিল গীত বাল্মীকির স্থানে ।
সংসার মোহিত হয় সে গীতের তানে ।।
শ্রীরাম শুনিয়া সেই রামায়ণগান ।
নিজ পুত্র বলিয়া করেন অনুমান ।।
লবকুশ সঙ্গীত গাইল একমাস ।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ।।

সীতার পাতালে প্রবেশ

একমাসে গীত যদি হইল বিরাম ।
জিজ্ঞাসা করেন তবে দোঁহারে শ্রীরাম ।।
আমি তোমা দোঁহারে জিজ্ঞাসি বিবরণ ।
কোন্ বংশে জম্মিলা বা কাহার নন্দন ।।
লব আর কুশ তবে শ্রীরামসাক্ষাতে ।
ছলে পরিচয় দেন দোঁহে হেঁটমাথে ।।
না জানি পিতার নাম মাতৃনাম সীতা ।
বাল্মীকির শিষ্য মোরা নাহি চিনি পিতা ।।
এই পরিচয় পেয়ে শ্রীরঘুনন্দন ।
দুইপুত্র কোলে করি করেন ক্রন্দন ।।
আর পত্নী না করিলাম নাহিল সন্ততি ।
কোন্ দোষেবর্জ্জিলাম সীতা গর্ভবতী ।।
শ্রীরাম বলেন হে বাল্মীকি জ্ঞানবান্ ।
জান ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান ।।
এতেক জানিয়া তুমি না কহ আমারে ।
পরীক্ষা লইব সীতা আন মম ঘরে ।।
যত লোক আসিয়াছে যেবা না আইসে !
শুনিয়া সীতার কথা আইল হরিষে ।।
স্ত্রী পুরুষ আসিলেক সকল সংসার ।
বৃদ্ধ শিশু কাণা খোঁড়া হৈল আগুসার ।।
কুলবধূ যত আছে রাজার কুমারী ।
সীতার পরীক্ষা শুনি এল সারি সারি ।।
আসিয়া সকল নারী কহে পরস্পর ।
শ্রীরাম জানেন না কি সীতার অন্তর ।।
তবে কেন সীতারে দিলেন বনবাস ।
কেন বা পরীক্ষা লন এ কি সর্ব্বনাশ ।।
এইরূপে বামাগণ করে কাণাকাণি ।
হেনকালে আইলেন বৃদ্ধা তিনরাণী ।।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সতিনী।
রামেরে বুঝান তিন রাজার গৃহিণী ।।
লইয়া পরীক্ষা এক সাগরের পার ।
কি হেতু পরীক্ষা নিতে চাহ আর বার ।।
ধন্য জনকেরে মান্য জানকীর বাপ ।
হেন জনকেরে আর নাহি দিও তাপ ।।
সীতারে জানিহ তিনি কমলা আপনি ।
নাহিক সীতার পাপ জানে সর্ব্বপ্রাণী ।।
সীতারে লইয়া তুমি থাক গৃহবাসে ।
তুষ্ট হয়ে জনক যাউন নিজ দেশে ।।
শ্রীরাম বলেন, মাতা, না কর বিষাদ ।
পরীক্ষা না নিলে দিবে লোকে অপবাদ ।।
মহারাজ জনকের নাহি উপরোধ ।
পরীক্ষা লইলে সবে পাইবে প্রবোধ ।।
রাজা হয়ে স্ত্রীর যদি না করে বিচার ।
স্ত্রীর অনাচারে নষ্ট হইবে সংসার ।।
এত যদি রঘুনাথ বলেন নিষ্ঠুর ।
কান্দিতে কান্দিতে রাণী গেলা অন্তঃপুরে।।

শ্রীরাম বলেন হে বাল্মীকি তপোধন।
আপনি আপন দেশে করুন গমন ।।
সঙ্গে রথ লয়ে যাউক সুমন্ত্র সারথি।
রথে করি সীতারে আনহ শীঘ্রগতি ।।
মহামুনি শ্রীরামের অনুজ্ঞা পাইয়া।
স্বদেশে গেলেন মুনি সুমন্ত্রে লইয়া ।।
মুনির চরণে সীতা করি নমস্কার।
মুনিকে জিজ্ঞাসা করে কহ সারোদ্ধার ।।
পিতাপুত্রে কেমনে হইল পরিচয়।
সে সব কহেন মুনি সীতার আলয় ।।
শুনহ আমার বাক্য জনকদুহিতে।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ যাহা কে পারে খণ্ডিতে ।।
রামের আজ্ঞায় দেশে করহ গমন।
পরীক্ষা দেখিতে এল যত দেবগণ ।।
প্রথমে পরীক্ষা দিলে সংসারে বিদিত।
আবার পরীক্ষা তব ললাটে লিখিত ।।
একঠাঁই হইয়াছে সর্ব্বদেবগণ।
কারো বাক্য না মানেন শ্রীরঘুনন্দন ।।
জানকীরে এইমত কহিলেন মুনি।
সীতার নয়নজল ঝরিল অমনি ।।
মুনির তনয়া-বধূ তাপেতে আকুলি।
সে সবার সঙ্গে সীতা করে কোলাকুলি ।।
বিদায় চাহেন সীতা করি নমস্কার।
মেলানি দেহ মা দেখা নাহি হবে আর ।।
মুনিপত্নী বলে, লক্ষ্মি,ছাড়ি যাহ কোথা।
বুকে শেল রহিল থাকিল মর্ম্মব্যথা ।।
জানকী বলিয়া মোরা না ডাকিব আর।
না শুনিব মধুরর যে বচন তোমার ।।
রথেতে চড়িয়া সীতা করিল গমন।
বাল্মীকির তপোবনে উঠিল ক্রন্দন ।।
মুনিস্থান ছাড়ি যান জানকী সুন্দরী।
যেই দেশে যান তিনি আলো সেই পুরী ।।
নিজ দেশ অযোধ্যায় করিলা গমন।
জয় জয় হুলাহুলি লক্ষ্মী-আগমন ।।
জগতের যত লোক অযোধ্যানগরে।
হেনকালে সীতা গেল সভার ভিতরে ।।
ভূমিতে আছেন সীতা রথ হৈতে উলি।
রূপে পুরী আলো করে ঢাকিছে বিজুলি ।।
কি কব অন্যের কথা যত মুনিগণ।
দেখিয়া সীতার রূপ সবে অচেতন ।।
শ্রীরামচরণ সীতা করিল বন্দন।
বাল্মীকি রামের প্রতি কহেন তখন ।।
চ্যবনের পুত্র যে বাল্মীকি নাম ধরি।
মন দিয়া শুন রাম নিবেদন করি ।।
বহু তপ করিলাম ত্যজি ভক্ষ্য-পানি।
সীতার শরীরে পাপ আমি নাহি জানি ।।
আমি জানি পাপ নাহি সীতার শরীরে।
মহাসতী সীতা আমি জানি নু অন্তরে ।।
সীতা যে পরমসতী জানে এ সংসার।
সীতার চরিত্রে রাম মম চমৎকার ।।
পাপমতি নহে সীতা পরমপবিত্র।
ধ্যানে জানিলাম আমি সীতার চরিত্র ।।
ঘরে লহ সীতায় কি করহ বিচার ।।
লবকুশ দুইপুত্র সীতার কুমার ।।
আমার বচন, রাম, না করিহ আন।
দুইপুত্রে লয়ে রাখ আপনার স্থান ।।
এতেক বলিয়া মুনি কাঁপে বারে বার।
শাপে পুড়ে মরে পাছে সকল সংসার ।।
মুনিপ্রতি শ্রীরাম কহেন যোড়হাতে।
সীতার চরিত্র আমি জানি ভালমতে ।।
অগ্নিশুদ্ধা হইলেন দেববিদ্যমানে।
জানকীরে আনিলাম দেশে তেকারণে ।।
আমি জানি সীতার শরীরে নাহি পাপ।
বিধির নির্ব্বন্ধ এই ঘটিল সন্তাপ ।।

আর কিছু, মহামুনি, না বলিহ মোরে।
সীতার পরীক্ষা লব সভার ভিতরে ॥
শ্রীরাম বলেন সীতা, শুন এ বচন।
দেখ ত্রিলোকের যে আইল সর্ব্বজন ॥
প্রথম পরীক্ষা দিলে সাগরের পার।
দেবগণ জানে তাহা না জানে সংসার ॥
পুনশ্চ পরীক্ষা দিবে সবাকার আগে।
দেখিয়া লোকের যেন চমৎকার লাগে ॥
এতেক শ্রীরাম যদি কহিলা সীতারে।
যোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে ॥
বিনা কার্য্য রঘুনাথ মম এ জীবনে।
প্রবেশ করিব অগ্নি তোমার বচনে ॥
পরীক্ষা দিলাম পূর্ব্বে দেববিদ্যমানে।
দেবেরা বলিলা যাহা শুনিলা আপনে ॥
দেশেতে আনিলা তুমি দিয়া যে আশ্বাস।
অকস্মাৎ মোরে কেন দিলা বনবাস ॥
মহাদেবী হইয়া মুনির ঘরে বসি।
ফলমূল খাই আমি নিত্য উপবাসী ॥
পতিকুলে পিতৃকুলে নাহি পাই স্থান।
অগ্নিতে পরীক্ষা করি কর অপমান ॥
ব্রহ্মা বলিলেন যত শুনিলা আপনি।
মৃত পিতা তোমা কত বুঝালে কাহিনী ॥
সাক্ষাতে শুনিলে তুমি পিতার বচন।
তবে সে আমারে লয়ে দেশে আগমন ॥
কুলবধূ যত নারী সেই থাকে ঘরে।
সভাতে পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে ॥
সর্ব্বগুণ ধর তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া পরীক্ষা নিতে হয় ত উচিত ॥
অদেখা হইব, প্রভু, ঘুচাব জঞ্জাল।
সংসারের সাধ নাহি যাইব পাতাল ॥
আজি হৈতে ঘুচুক তোমার লাজদুখ।
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ ॥

নিরবধি অপবাদ দিতেছ আমারে।
সভায় পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে ॥
জন্মে জন্মে, প্রভু, তুমি হয়ো মোর পতি।
আর কোন জন্মে মোর করো না দুর্গতি ॥
মেলানি মাগি যে প্রভু তোমার চরণে।
ইহা কহিলেন সীতা সভাবিদ্যমানে ॥
সীতার বচন যে শুনিল সর্ব্বলোকে।
লজ্জায় কাতর সীতা পৃথিবীকে ডাকে ॥
মা হইয়া পৃথিবী মায়ের কর কাজ।
এ ঝিয়ের লাজ হৈলে তোমার যে লাজ ॥
কত দুঃখ সহে, মাগো, আমার পরাণে।
সেবা করি থাকি সদা তোমার চরণে ॥
উদরে ধরিলে মোরে তা কি মনে নাই।
তোমার চরণে সীতা মাগে কিছু ঠাঁই ॥
এইমতে করে সীতা পৃথিবীর স্তুতি।
সপ্তপাতালেতে থাকি শুনে বসুমতী ॥
সীতা নিতে পৃথিবী হইলা আগুসার।
সে সপ্তপাতাল হৈতে হৈল একদ্বার ॥
অকস্মাৎ উঠিল সুবর্ণসিংহাসন।
দশদিক আলো করে এ মর্ত্ত্যভুবন ॥
নানাবিধ বসনভূষণ পরিধান।
মূর্ত্তিমতী পৃথিবী রহিলা বিদ্যমান ॥
ঝি বলিয়া পৃথিবী সীতারে ডাকে ঘনে।
কোলে করি সীতারে তুলিলা সিংহাসনে ॥
পরীক্ষা লইতে চান লোকের কথায়।
লোক লৈয়া সুখ রাম করুন হেথায় ॥
মায়ে ঝিয়ে দুইজনে থাকিব পাতালে।
সর্ব্বলোক শুনিল পৃথিবী যত বলে ॥
নাহি চাহিলেন সীতা নিজ ছাওয়ালে।
শ্রীরামেরে নিরখিয়া প্রবেশে পাতালে ॥
পাতালে যাইতে রাম ধরে সীতা-চুলে।
হস্তে চুলমুঠা রৈল সীতা গেল তলে ॥

পাতালেতে প্রবেশিয়া তিলেক না থাকি।
বৈকুণ্ঠে স্বমূর্ত্তি ধরি গেলেন জানকী ॥
বৈকুণ্ঠে গেলেন লক্ষ্মী হৃষ্ট দেবগণ।
অযোধ্যানগরে হেথা উঠিল ক্রন্দন ॥
শ্রীরামের ক্রন্দন হইল অনিবার।
হাহাকারশব্দ করে সকল সংসার ॥
সীতার চরিত্রকথা শুনে যেই লোকে।
পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য হয় পাপ নাহি থাকে ॥
কৃত্তিবাস রচিল কবিত্ব চমৎকার।
গাইল উত্তরাকাণ্ডে চরিত্র সীতার ॥

লবকুশের বিলাপ ও ব্রহ্মাদির উপদেশ

লবকুশ শুনিয়া হাতের ফেলে বীণা।
ভূমে লোটাইয়া কান্দে ভাই দুইজনা ॥
কোথা গেলে জননী গো জনকদুহিতে।
আমরা তোমার শোক না পারি সহিতে॥
তোমাবিনা মাতাগো অন্যকে নাহি জানি।
তুমি বিনা আর কেবা দিবে অন্নপানি ॥
ক্ষুধা হৈলে অন্ন দেহ জল পিপাসায়।
সংসারে দুর্ল্লভ গুণ সে-গুণে তোমায়॥
দশমাস আমা দোঁহে ধরিলে উদরে।
যে দুঃখ পাইলে তাহাকে কহিতে পারে ॥
ছোটকে করিলে বড় লালিয়া পালিয়া।
পলাইলে হেন পুত্র, মাতা, কারে দিয়া ॥
জনকঝিয়ারী তুমি শ্রীরামঘরণী।
কোথা গেলে ফেলে লবকুশের জননি ॥
মাতৃহীন বালক সে সর্ব্বদা অস্থির।
যার মাতা আছে তার সফল শরীর ॥
আজি হৈতে দুইজন হইনু অনাথ।
না নিলে কেন গো মাতা দুইপুত্রে সাথ ॥
পাইয়া বিস্তর দুঃখ গেলে মা পাতালে।
অনাথ করিয়া গেলে এ দুই ছাবালে ॥
লবকুশ কান্দিতেছে লোটাইয়া ধূলি।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ননীর পুতলী ॥
পুত্রের ক্রন্দনে রাম হইয়া কাতর।
অন্তঃপুরে পাঠাইল মায়ের গোচর ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা এ তিনে।
যতেক প্রবোধ দেন প্রবোধ না মানে ॥
মা হইয়া পুত্রের যে হইল নির্দ্দয়।
সে মায়ের তরে কান্দা উচিত না হয় ॥
না পাবে মায়ের দেখা গেল দূর দেশে।
পিতামহী আমরা যে আছি সবিশেষে ॥
দুইনাতি প্রবোধিতে নারে তিনবুড়ী।
প্রবোধ করিতে তবে গেল তিনখুড়ী ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ, বাপু, আর কর্ম্মফলে।
এ সুখ এড়িয়া সীতা পশিল পাতালে ॥
লবকুশ উঠ বাপু, কান্দ কি কারণ।
সীতার সমান হই মোরা তিনজন ॥
মাতৃসঙ্গে তোমাদের না হবে দর্শন।
আমা সবা দেখি, বাপু, সম্বর ক্রন্দন ॥
দুভায়ের নেত্রজলে তিতিল মেদিনী।
প্রবোধ করিতে নারে কোন ঠাকুরাণী ॥
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন তিনজন।
চলিলেন অন্তঃপুরে প্রবোধ কারণ ॥
দুইভায়ে বসাইয়া রত্নসিংহাসনে।
তিনখুড়া প্রবোধেন মধুর বচনে ॥
শুন লব শুন কুশ মোদের বচন।
অস্থির না হও, বাপু, স্থির কর মন ॥
পিতা মাতা ভ্রাতা কার থাকে নিরন্তর।
অনিত্য লাগিয়া কেন হইলা কাতর ॥
কালি বা পরশ্ব, বাপু, হইবে যে রাজা।
অস্থির হইলে, বাপু, কে পালিবে প্রজা॥

গঙ্গা আনিলেন রাজা নাম ভগীরথ।
তাঁর নাম গায় সদা সকল জগৎ ॥
তোমা সবে বর্জিলেন জানকী নিশ্চিত।
সর্ব্বলোকে গাইবেক সীতার চরিত ॥
তিনখুড়া প্রবোধেন প্রবোধ না মানে।
দুইভায়ে লয়ে দিল রামবিদ্যমানে ॥
দুয়ের ক্রন্দনে রাম কান্দেন আপনি।
উভয়ের নেত্রজলে তিতিল মেদিনী ॥
দুয়েরে বাল্মীকিমুনি দেন পাতিয়ান।
সীতাহেতু কান্দিয়া শ্রীরাম হতজ্ঞান ॥
সীতার সমান নারী না হেরি নয়নে।
কি করিব রাজা হয়ে সীতার বিহনে ॥
মোর অগোচরে সীতা লইল রাবণে।
সবংশেতে মরিল সে জানকী-কারণে ॥
আমার সাক্ষাতে সীতা হরিলেন ধরা।
তাহারে খুঁড়িয়া নিব সীতা মনোহরা ॥
যজ্ঞেতে জনকরাজা যজ্ঞভূমি চষে।
পৃথিবীর মধ্যে সীতা উঠিলেন চাষে ॥
চাষভূমি সীতার জন্মের অনুবন্ধ।
তেকারণে বসুমতী শাশুড়ী সম্বন্ধ ॥
আর যত নারী জন্মে ভারতভুবনে।
সীতাহেন নারী নাহি আমার নয়নে ॥
কৃতাঞ্জলি শুন বলি শাশুড়ী গর্বিতা।
না দেহ আমারে দুঃখআনি দেহ সীতা ॥
কাতর হইয়া রাম বলিলেন যত।
তদুত্তর না পাইয়া জ্বলিলেন তত।
শ্রীরাম বলেন, ভাই, আন ধনুর্ব্বাণ।
পৃথিবী কাটিয়া আজি করি খান খান ॥
শাশুড়ী না দিলা তবে এই বাণ যুড়ি।
কেমনে বাঁচিবে তুমি কাহার শাশুড়ী ॥
সীতা নিতে যখন হইলা আগুসার।
তখনি পাঠাইতাম যমের দুয়ার ॥

পৃথিবী কাটিতে রাম পূরেণ সন্ধান।
ত্রাস পেয়ে পৃথিবী হইলা আগুয়ান ॥
দেখিয়া রামের কোপ ব্রহ্মা চিন্তে মনে।
সত্বর আসিলা ব্রহ্মা রাম বিদ্যমানে ॥
বলিলেন, রাম, তুমি বিষ্ণু অবতার।
সংসারে হইল তব গুণের প্রচার ॥
জন্ম না হইতে রাম তোমার চরিত।
অবতার না হইতে হৈল তব গীত ॥
ভূত ভবিষ্যৎ যে সকল মুনি জানে।
সর্ব্বদুঃখ খণ্ডে যেই রামায়ণ শুনে ॥
আদিকবি বাল্মীকি রচিল রামায়ণ।
শুনিলে পাপের ক্ষয় দুঃখ বিমোচন ॥
আপনি, শ্রীরাম, তুমি স্বয়ং নারায়ণ।
পৃথিবীতে তব গুণ গাহে সর্ব্বজন ॥
অনাথের নাথ তুমি সকলের গতি।
পৃথিবী কাটিয়া তুমিরাখিবে অখ্যাতি ॥
তোমার স্মরণেপাপীরপাপনাহিথাকে।
বিকল হইলে, রাম, জানকীর শোকে ॥
ইন্দ্র-আদি করিয়া দেবতা আর ঋষি।
তব সঙ্গে রামায়ণ শুনে ভালবাসি ॥
দেবগণ মুনিগণ বসিয়া কৌতুকে।
মহাসুখে রামায়ণ শুনে সর্ব্বলোকে ॥
বাল্মীকি রচিল যেই অদ্ভুত আখ্যান।
শুনিলে পাপের ক্ষয় দুঃখ-অবসান ॥
এইরূপে ব্রহ্মা প্রবোধেন নানা ছলে।
শ্রীরামেরে পৃথিবী বলেন হেনকালে ॥
শ্রীরাম আমার কোপ কর অনুচিত।
অবশ্য ভুগিতে হয় ললাটে লিখিত ॥
কোন্ দোষে মম কন্যা দিলে বনবাস।
বনবাস দিয়া কেন আন নিজ বাস ॥
আমার নিকটে কন্যা তিলেক না থাকে।
স্বমূর্ত্তি ধরিয়া তিনি গেলেন স্বর্লোকে ॥

বিষ্ণুস্থানে হইলেন আপনি কমলা।
নাগলোকে সঞ্চারিলা সীতা এককলা ।।
মর্ত্ত্যে আছে যত লোক পূজেন দেবতা।
এককলা তথায় সে সঞ্চারিলা সীতা ।।
দৈবযোগে সীতা সঞ্চারিলা তিনলোক।
সীতার লাগিয়া, রাম, কেন কর শোক ।।
এই লোকে সীতা সনে নাহি দরশন ;
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর সঙ্গে হবে সম্ভাষণ ।।
সে সীতা স্পর্শিল যেবা হইলেক সতী।
তাঁহার সমান নহ লক্ষ্মী ভগবতী ।।
এত যদি পৃথিবী রামেরে বলে বাণী।
হেনকালে শ্রীরামেরে প্রবোধেন মুনি ।
সীতার লাগিয়া কেন করহ রোদন।
ভালমতে প্রভাতে শুনিহ রামায়ণ ।।

শ্রীরামের অশ্বমেধযজ্ঞসমাপন ও পুনর্ব্বার রামায়ণগান

ভালমতে প্রভাতকৃত্য করি সমাপন।
বসিলেন শ্রীরাম শুনিতে রামায়ণ ।।
সঙ্গীত শুনিতে রাম বসেন সভায়।
রামের তনয় দুটি রামায়ণ গায় ।।
হাতে বীণা করিয়া ললিত গীত গায়।
শুনিয়া সকল লোক মোহিত সভায় ।।
যজ্ঞ-অবসানে গীত ছিল অবশেষ।
গাইতে লাগিল গীত তাহার বিশেষ ।।
কালপুরুষের সনে রামের দর্শন।
সংসার ছাড়িয়া রাম করিবে গমন ।।
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে।
লক্ষ্মণেরে বর্জ্জিবেন সে মুনির শাপে ।।
বৈকুণ্ঠেতে যাইবেন লইয়া সংসার।
ইহা বিনা বাল্মীকি না লিখিলেন আর ।।
এই গীত শুনি রাম দুঃখিত অন্তরে।
বিদায় করেন সর্ব্বলোকে যজ্ঞ পরে ।।
বিপ্র সব তুষ্ট হৈল শ্রীরামের দানে।
ধনী হয়ে মুনিগণ গেলা নিজ স্থানে ।।
মেলানি করিয়া দেশে যায় বিভীষণ।
সুগ্রীব-অঙ্গদ চলে লয়ে কপিগণ ।।
বিদায় লইয়া চলে পৃথিবীর রাজা।
নানাধনে শ্রীরাম করেন সবে পূজা ।।
জনক রাজারে রাম করেন স্তবন।
যজ্ঞের দক্ষিণা দেন বহুমূল্য ধন ।।
বাল্মীকি প্রভৃতি করি যত মহামুনি।
নিজ স্থানে গেলা সবে করিয়া মেলানি ।।
ব্রহ্মা-আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
সমস্ত উত্তরাকাণ্ডে অপূর্ব্ব কথন ।।
এ উত্তরাকাণ্ডে লবকুশের বাখান।
কৃত্তিবাস গায় গীত অমৃতসমান ।।

সীতাবিরহে শ্রীরামের খেদোক্তি

শ্রীরাম দেখেন শূন্য সীতার বিহনে।
নেত্রনীর শ্রীরামের বহে রাত্রিদিনে ।।
পাত্র মিত্র মাতা ও বিমাতা সহোদর ।।
বিবাহ করিতে রামে বলেন বিস্তর ।।
কত স্থানে আছে কত রাজার কুমারী।
অনুমান করিছে দিবসবিভাবরী ।।
রঘুনাথ করিবেন বিবাহ নিশ্চয়।
না জানি কে ভাগ্যবতী রামপত্নী হয় ।।
এই যুক্তি তারা সবে করে সর্ব্বক্ষণ।
বিবাহে বিমুখ কিন্তু শ্রীরামের মন ।।
'সীতা সীতা' বলি রাম করেন ক্রন্দন।
সীতা বিনা শ্রীরামের অন্যে নাহি মন ।।
সীতা সীতা বলি রাম ডাকেন বিস্তর।
সীতা নাহি শ্রীরামেরে কে দিবে উত্তর ।।

স্বর্ণসীতাপানে রাম একদৃষ্টে চান ।
উত্তর না পেয়ে তাঁর আরো দুঃখ পান ।
জগতের নাথ রাম এমন বিকল ।
তাঁহার ক্রন্দনে লোক কান্দিল সকল ।
সীতারে ভাবিয়া রাম ছাড়েন নিশ্বাস ।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

ভরতকর্ত্তৃক কেকয়দেশে তিনকোটি গন্ধর্ববধ ও শ্রীরামাদির অষ্টপুত্রের রাজ্যাভিষেক

এগার হাজার বর্ষ লোকের পালন ।
পাত্রমিত্র সুখে আছে আরো প্রজাগণ ॥
চারি ভায়ের মা মরে কাল-অবসানে ।
ভাণ্ডার বিলান রাম নানাবিধ দানে ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রাসুন্দরী ।
দশরথ নৃপতির প্রিয় সহচরী ॥
ক্রমে মরিলেন আর সাত শত রাণী ।
নিজালয়ে আনিলেন ক্রমে দণ্ডপাণি ॥
দশরথভূপতির সঙ্গে নানামতে ।
সুখে যায় সুরপুরে চড়ি দিব্যরথে ॥
যাঁর পুত্র ভগবান রাম মহামতি ।
স্বর্গে বাস তাঁর কেবা করয়ে ব্যাহতি ॥
পাত্রমিত্রসহ রাম রত রাজকার্য্যে ।
কেকয়দেশের দ্বিজ আইল সে রাজ্যে ॥
দধিদুগ্ধ আর মধু কলসী কলসী ।
সন্দেশ অমৃততুল্য আনে রাশি রাশি ॥
মৃত পক্ষী জীব জন্তু আনে যত পারে।
অন্য অন্য দ্রব্য যত আনে ভারে ভারে ॥
বসনভূষণ আর নানা-অস্ত্র আনে ।
রাখিল সকল দ্রব্য রাম বিদ্যমানে ॥
লোমশ গন্ধর্ব্বরাজা সর্ব্বলোকে জানে ।
দৌরাত্ম্য আমার রাজ্যে করে রাত্রিদিনে ॥
আপনি আসিয়া তারে করহ দমন ।
অথবা শ্রীরাম তুমি পাঠাও নন্দন ॥
মামার সংবাদ পেয়ে রাম হরষিত ।
ডাক দিয়া ভরতেরে কহেন ত্বরিত ॥
শত্রুজিৎ মামা মোর কে না তাঁরে জানে ।
পাঠাইলেন বার্ত্তা এই দ্বিজবর স্থানে ॥
তিনকোটি গন্ধর্ব্ব সে বড়ই দুর্জ্জয় ।
তাঁর রাজ্য নিতে চাহে বড় পাই ভয় ॥
দুইপুত্র তোমার যে সমরে প্রখর ।
বিক্রমে দুর্জ্জয় তাঁরা দোঁহে ধনুর্দ্ধর ॥
গন্ধর্ব্ব মারিয়া দুইপুত্রে কর রাজা ।
রাজ্য বসাইয়া যে পালহ সুখে প্রজা ॥
আছিল গন্ধর্ব্ব-অস্ত্র রামের প্রধান ।
সেই সে গন্ধর্ব্ব-অস্ত্র তাঁরে দেন দান ॥
দুইপুত্র লইয়া ভরত তথা যান ।
ধায় প্রেতপিশাচ করিতে রক্তপান ॥
সসৈন্যে ভরত যান মাতুলের ঘরে ।
রহিল সামন্তসৈন্য বাটীর বাহিরে ॥
দেখি ভাগিনেয়ে হরষিত শত্রুজিৎ ।
ভোজন করিয়া দোহে বসিল সহিত ॥
এইরূপে প্রভাতা হইল বিভাবরী ।
তিনকোটি গন্ধর্ব্ব আইল ত্বরা করি ॥
চারিভিতে মারে শেল জাঠি ও ঝকড়া ।
অস্ত্রবিন্ধে ভরতের পড়ে হাতীঘোড়া ॥
সাতদিন যুদ্ধ হৈল কারো নাহি জয় ।
দেখিয়া অমরগণে লাগিল বিস্ময় ॥
গন্ধর্ব্ব না মারা যায় অতি ভয়ংকর ।
ভরত গন্ধর্ব্ব-অস্ত্র ছাড়েন সত্বর ॥
একবাণে জন্মিল গন্ধর্ব্ব তিনকোটি ।
ছয়কোটি গন্ধর্ব্বে লাগিল কাটাকাটি ॥
সহজে গন্ধর্ব্বজাতি বড়ই দুর্নীত ।
তাহাতে অধিক যুদ্ধ জ্ঞাতির সহিত ॥

ছয়কোটি গন্ধর্ব্বে উঠিল মহামার ।
গন্ধর্ব্ব- অস্ত্রেতে হয় গন্ধর্ব্বসংহার ।।
গন্ধর্ব্ব মারিয়া বসাইল দেশ এক ।
দুইপুত্রে ভরত করিল অভিষেক ।।
পুষ্করের জন্য রাম দিলা সেই পুরী ।
পুষ্করদেশেতে সে পুষ্কর-অধিকারী ।।
দ্বাদশ বৎসরে বসাইয়া সেই পুরী ।
আইলেন শ্রীভরত অযোধ্যানগরী ।।
মহাললাদে শ্রীরাম করেন সম্ভাষণ ।
শুনিয়া গন্ধর্ব্ব বধ হরষিত মন ।।
শ্রীরাম বলেন যোগ্য ভরতকুমার ।
দুই ভাইপোয়ে দেন রাজ্য-অধিকার ।।
চন্দ্রকেতু-অঙ্গদ এ দুই সহোদর ।
রামের আজ্ঞায় দোঁহে হৈল দণ্ডধর ।।
অঙ্গদ পাইল মল্ল দেশে অধিকার ।
অশ্বদেশ-অধিপতি চন্দ্রকেতু আর ।।
লক্ষ্মণের দুইপুত্র হইলেক রাজা ।
রাজ্য বসাইয়া পালে বিধিমতে প্রজা ।।
শত্রুঘ্নের দুইপুত্র পরম সুন্দর ।
শত্রুঘাতী সুবাহু এ দুই সহোদর ।।
চারি ভাইয়ের অষ্টপুত্র হৈল মহামতি ।
শত্রুঘ্নের দুইপুত্র মথুরাধিপতি ।।
লবকুশ পাইলেন অযোধ্যা-নন্দিগ্রাম ।
অষ্টজনে অষ্টরাজ্য দিলেন শ্রীরাম ।।
এগারহাজার বর্ষ রামের পালনে ।
পাত্রমিত্র-আদি সুখে আছে সর্ব্বজনে ।।
কৃত্তিবাস কবিত্ব অমৃতে আমোদিত ।
গাইল উত্তরাকাণ্ডে রামের চরিত ।।

কালপুরুষের আগমন ও লক্ষ্মণবর্জ্জন

পরে কালপুরুষ সে সংসারবিনাশী ।
অযোধ্যায় প্রবেশিল হইয়া সন্ন্যাসী ।।
সভাতে বসিয়া রাম দুয়ারী লক্ষ্মণ ।
রীতিমত বসিয়াছে পাত্রমিত্রগণ ।।
হেনকালে আসি কালপুরুষ বলিল ।
আমি দূত সে ব্রহ্মার ব্রহ্মা পাঠাইল ।।
লক্ষ্মণ, রামের কাছে কর নিবেদন ।
তাঁহার সহিত আছে কথোপকথন ।।
শ্রীরামের কাছে গিয়া লক্ষ্মণ সম্ভ্রমে ।
যোড়হাত করি তবে জানান শ্রীরামে ।।
আইল ব্রহ্মার দূত দ্বারে আচম্বিতে ।
আজ্ঞা কর, রঘুনাথ, উচিত আনিতে ।।
শ্রীরাম বলেন আন করি পুরস্কার ।
কি হেতু আইল দূত জানি সমাচার ।।
পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বর ।
কালপুরুষেরে নিল রামের গোচর ।।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাম দিলেন আসন ।
যোড়হাতে জিজ্ঞাসেন কহ প্রয়োজন ।।
সে কালপুরুষ বলে শুনহ বচন ।
যে কথা কহিব পাছে শুনে অন্য জন ।।
এ সময়ে যে করিবে হেথা আগমন ।
ব্রহ্মার বচনে তারে করিবে বর্জ্জন ।।
এই সত্য ব্রহ্মার যে করিবে পালন ।
দ্বাররক্ষাহেতু তবে রাখ একজন ।।
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ ।
সাবধানে থাক না আইসে কোন জন ।।
অধিক কি কহিব যে দ্বারপানে চায় ।
তাহাকে ত্যজিব আমি জানিহ নিশ্চয় ।।
এই সত্য করিলাম দূতের গোচরে ।
সাবধানে লক্ষ্মণ রহিবা তুমি দ্বারে ।।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ যে না যায় খণ্ডন ।
কালপুরুষের সঙ্গে হয় সম্ভাষণ ।।
সে কালপুরুষ বলে পরিচয় করি ।
মর্ত্ত্যেতে রহিলে শূন্য বৈকুণ্ঠনগরী ।।

সংসারের লোক নাশি মোর দূতে আনে ।
তোমারে লইতে আমি আইনু আপনে ॥
ব্রহ্মার বচন, রাম, কর অবধান ।
সংসার ছাড়িয়া তুমি চল নিজ স্থান ॥
এগারহাজার বর্ষ অবতার করি ।
ভুলিয়া রহিলা, প্রভু যেমন সংসারী ॥
কহিবার যোগ্য নহে মর্ত্ত্যের ভিতর ।
আমারে কি আজ্ঞা, রাম, বলহ সত্বর ॥
শ্রীরাম বলেন, যম যে কহ এখন ।
সংসার ছাড়িয়া আমি করিব গমন ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে না যায় খণ্ডন ।
ব্রহ্মার মায়াতে দুর্ব্বাসার আগমন ॥
সভা করি দ্বারে বসি আছেন লক্ষ্মণ ।
মুনি বলে গিয়া করি রাম সম্ভাষণ ॥
লক্ষ্মণ বলেন কৃপা কর দাস বলে ।
ব্রহ্মার দূতের সনে আছেন বিরলে ॥
যে কর্ম্ম সাধিবে করি রামসম্ভাষণ ।
আজ্ঞা কর সাধি আমি সেই প্রয়োজন ॥
কুপিল দুর্ব্বাসামুনি লক্ষ্মণের প্রতি ।
লক্ষ্মণের পানে চাহি কহে কোপমতি ॥
লক্ষ্মণ আমার শাপে কার বাপে তরি ।
শাপ দিয়া পোড়াইব অযোধ্যা নগরী ॥
সপ্ত ব্রাহ্মখণ্ড আজি করিব সংহার ।
পোড়াইয়া অযোধ্যা করিব ছারখার ॥
বালক বনিতা বৃদ্ধ আজি করি ধ্বংস ।
দশরথভূপতিরে করিব নির্ব্বংশ ॥
দেখিয়া মুনির কোপ লক্ষ্মণের ত্রাস ।
ভাবেন আমার লাগি হয় সর্ব্বনাশ ॥
বুঝি রাম করিবেন আমারে বর্জ্জন ।
এড়াইতে নারি আমি ললাট লিখন ॥
বর্জ্জন-মরণ দুই একই প্রকার ।
আমাহেতু বংশ কেন হইবে সংহার ॥
আমারে বর্জ্জিলে আমি মরি একজন ।
পিতৃবংশ নাশ করি কিসের কারণ ॥
পূর্ব্বকথা লক্ষ্মণের পড়িলেক মনে ।
এ বর্জ্জন সুমন্ত্র কহিল তপোবনে ॥
কালপুরুষের সঙ্গে রামের কথন ।
মুনিকে লইয়া তথা গেলেন লক্ষ্মণ ॥
কালপুরুষেরে তবে করিয়া বিদায় ।
প্রণাম করেন রাম মুনি দুর্ব্বাসায় ॥
বিনয়ে বলেন রাম কোন্ প্রয়োজন ।
দুর্ব্বাসা বলেন চাহি উচিত ভোজন ॥
একবর্ষ করিয়াছি আমি অনাহার ।
দেহ অন্নব্যঞ্জন যে অমৃত সুসার ॥
দুর্ব্বাসার কথাতে রামের হৈল হাস ।
একবর্ষ কেমনে করিলে উপবাস ॥
শ্রীরাম বলেন মুনি, এ নহে কারণ ।
অনুমানে বুঝি হে মজিল পুরীজন ॥
ভোজন দিলেন রাম অমৃত সুসার ।
ভোজন করিয়া মুনি গেল নিজাগার ॥
শ্রীরাম বলেন মুনি পাড়িল প্রমাদ ।
কেমনে বর্জ্জিব ভাই করেন বিষাদ ॥
কালপুরুষের সঙ্গে আলাপ যখন ।
দুর্ব্বাসার সঙ্গে গেল লক্ষ্মণ তখন ॥
সত্য যদি লঙ্ঘি তবে ব্যর্থ এ জীবন ।
সত্য যদি পালি হয় লক্ষ্মণ বর্জ্জন ॥
লক্ষ্মণে বর্জ্জিতে রাম অত্যন্ত বিকল ।
বশিষ্ঠনারদ-আদি ডাকেন সকল ॥
কেমনে করেন রাম সত্যের পালন ।
সভামধ্যে শ্রীরাম কহেন বিবরণ ॥
শ্রীরাম বলেন সীতা আর রাজ্যধন ।
ইহার অধিক মোর ভাই যে লক্ষ্মণ ॥
সকলি ত্যজিতে পারি জানকী সুন্দরী ।
লক্ষ্মণ বিহনে আমি রহিতে না পারি ॥

মুনিরা বলিছে, রাম, কি ভাবিছ মনে।
সত্য যদি পাল তবে বর্জ্জহ লক্ষ্মণে ॥
যদি সত্য লঙ্ঘ হয় ব্যর্থ এ জীবন।
লক্ষ্মণ বর্জ্জিয়া কর সত্যের পালন ॥
সত্যহেতু তব পিতা তোমাপুত্রে বর্জে।
সত্য পালি মরিয়া গেলেন স্বর্গরাজ্যে ॥
ছত্রদণ্ড ধর তুমি ছেড় অধিবাস।
পিতৃসত্য পালিতে যে গেলে বনবাস ॥
অগ্নিশুদ্ধা এড় সীতা পরমাসুন্দরী।
সীতা এড়ি রাজ্য এড় হয়ে ব্রহ্মচারী ॥
এ সব বর্জ্জিতে, রাম, না কর মন্ত্রণা।
লক্ষ্মণ বর্জ্জিতে কেন এত আলোচনা ॥
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ।
আমারে বর্জ্জিয়া কর সত্যের পালন ॥
সত্য যদি লঙ্ঘ তবে বড় অনাচার।
তুমি সত্য লঙ্ঘিলে যে মজিবে সংসার ॥
যত কিছু আজি, রাম, আমার কারণ।
বুঝিবে তোমার মায়া বল কোন্ জন।
সংসার ছাড়িলে, রাম, ঘুচে মায়ামোহ
দুইভাই কোলাকুলি চক্ষে পড়ে লোহ ॥
সভায় বলেন রাম বর্জ্জিনু লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ পশ্চাতে আমি করিব গমন ॥
শুনি সর্ব্বলোকের চক্ষেতে পড়ে পানি।
চলিল লক্ষ্মণবীর করিয়া মেলানি ॥
এড়েন হাতের বেত্র গাত্র-আভরণ
শ্রীরামেরে প্রদক্ষিণ করিলা লক্ষ্মণ।
বন্দিলেন শ্রীবশিষ্ঠ নারদ চরণ।
আর যত বন্দিলেন কুলের ব্রাহ্মণ ॥
ভরতের পদদ্বয় করেন বন্দন।
ভরত কাতর অতি করেন ক্রন্দন ॥
প্রজাসমূহের প্রতি কহেন লক্ষ্মণ।
সম্প্রীতিতে বিদায় করহ প্রজাগণ ॥

প্রজাগণ বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তোমা বিনা কেমনে হে ধরিব জীবন ॥
লক্ষণ শ্রীরাম পদে করেন প্রণতি।
জন্মে জন্মে থাকে যেন ভক্তি তোমা প্রতি ॥
লক্ষ্মণের বাক্যে রাম হইয়া কাতর।
অচেতন হইলেন নাহিক উত্তর ॥
পাত্রমিত্র প্রতি বীর করিলা মেলানি।
চাহিয়া সবার পানে চক্ষে পড়ে পানি ॥
রাজ্যখণ্ড আদি করি সহ সর্ব্বজন।
সরযূনদীর তীরে করেন গমন ॥
প্রার্থনা করেন তারে করিয়া প্রণাম।
আমাতে প্রসন্ন যেন থাকেন শ্রীরাম।
সরযূর স্রোত বহে অতি খরশান।
লক্ষ্মণ নামিয়া স্রোতে ত্যজিলেন প্রাণ ॥
নরদেহ পরিহরি গেলেন গোলোক।
অযোধ্যানগরে যে বাড়িল মহাশোক ॥
হাহাকার রোদন উঠিল চতুর্দ্দিক।
বিলাপ করেন রাম বর্ণিতে অধিক ॥
আমারে এড়িয়া গেলা কোথায় লক্ষ্মণ।
তোমা বিনা না রাখিব বিফল জীবন ॥
সীতা বর্জ্জিনু আমি লোক-অপবাদে।
তোমারে বর্জ্জিনু ভাই,কোন্ অপরাধে ॥
লক্ষ্মণবর্জ্জনে মোর মিথ্যা এ সংসার।
লক্ষ্মণসমান ভাই না পাইব আর ॥
লক্ষ্মণ বিহনে আমি থাকি কি কুশলে।
যে জলে নামিল ভাই নামিব সে জলে
য দিকে লক্ষ্মণ গেল উত্তর সে দিক।
লক্ষ্মণ বিহনে প্রাণ রাখাই সে ধিক্ ॥
করিলা বিস্তর সেবা হইয়া সদয়।
তোমা বর্জ্জিলাম আমি হইয়া নির্দ্দয় ॥
লক্ষ্মণের মরণে কাতর প্রাণ অতি।
ছত্রদণ্ড ধরিতে না চান রঘুপতি ॥

ভরতে করিতে রাজা শ্রীরামের মতি।
ভরত কহেন কিছু শ্রীরামের প্রতি ॥
এতকাল নানা সুখ করিলাম রাম।
যাইতে তোমার সঙ্গে এবে মনস্কাম ॥
ভরতের কথা শুনি শ্রীরাম উদাস।
হেঁটমাথা করি রাম ছাড়েন নিশ্বাস ।
শ্রীরাম বলেন শুন আমার উত্তর।
শত্রুঘ্নে আনিতে দূত পাঠাও সত্বর ॥
রামের আজ্ঞায় দূত পাঠাইল ত্বরা।
তিনদিবসেতে গেল নগর মথুরা ॥
শত্রুঘ্নের ঠাঁই দূত কহে কাণে কাণ।
চলিল সকল লোক শ্রীরামের সনে ॥
ভরতাদি করিয়া যতেক পুরজন।
শ্রীরামের সঙ্গে স্বর্গে করিবে গমন ॥
রামের বর্জ্জনে ছাড়ে লক্ষ্মণ শরীর।
লক্ষ্মণবর্জ্জনে রাম হলেন অধীর ॥
মহারাজ শত্রুঘ্ন না ভাবিহ মনে।
সত্বরে চলহ তুমি রাম সম্ভাষণে ॥
এত শুনি শত্রুঘ্ন করেন হেঁটমাথা।
পাত্রমিত্রে আনিয়া কহেন সব কথা ॥
সুবাহু পুত্রেরে করেন মথুরায় রাজা।
সাবধানে পালিতে কহেন সব প্রজা ॥
দুই পুত্র প্রতি রাজ্য করি সমর্পণ।
অযোধ্যায় করিলেন যাত্রা শত্রুঘন ॥
তিনদিবসেতে আসি অযোধ্যা নগরী।
প্রণাম করেন শ্রীরামের পদ ধরি ॥
শত্রুঘ্নে দেখিয়া রাম হরষিত মন।
পুনশ্চ রামের পদ বন্দে শত্রুঘন ॥
তোমার চরণ বিনা আর নাহি গতি।
স্বর্গবাসে যাব, প্রভু, তোমার সংহতি ॥
যোড়হস্তে শ্রীরামেরে কহে সর্ব্বলোকে।
তোমার প্রসাদে, রাম, স্বর্গে যাব সুখে ॥
তোমার জীবনে রাম সবার জীবন।
তোমার মরণে, প্রভু, সবার মরণ ॥
শুনিয়া শ্রীরাম করিলেন অঙ্গীকার।
আমার সহিতে চল বাঞ্ছা থাকে যার ॥
জীবনের আশা ছাড়ি সবার এ আশ।
শ্রীরামের সঙ্গে গিয়া করে স্বর্গবাস ॥
তিনকোটি রাক্ষস আইল বিভীষণ।
সুগ্রীব-অঙ্গদ এল সহ কপিগণ ॥
নল নীল আইল সে মন্ত্রী জাম্বুবান।
মহেন্দ্র-দেবেন্দ্র এল বীর হনুমান ॥
আর যত লোক ছিল অযোধ্যানগরে।
যত যত লোক ছিল পৃথিবীভিতরে ॥
স্ত্রীপুরুষ এল সবে অযোধ্যানগরে।
বালবৃদ্ধ-আদি কেহ নাহি রহে ঘরে ॥
রামের নিকটে সবে এল শীঘ্রগতি।
যোড়হাত করি সব রামে করে স্তুতি ॥
কতবার দেখিলাম দেব ত্রিলোচন।
কত কত দেখিলাম সিদ্ধ ঋষিগণ ॥
শুনিলাম গন্ধর্ব্বের গীত মনোহর।
বিদ্যাধরী নৃত্য করে দেখিনু বিস্তর ॥
তোমার বিহনে, রাম, থাকি কোন্ সুখে।
তোমার পাছেতেমোরাযাবস্বর্গলোকে ॥
পৃথিবীর যত লোকে যোড় করে হাত।
একে একে সবারে বলেন রঘুনাথ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন রাজা বিভীষণ।
মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন ॥
হইয়া লঙ্কার রাজা থাক চারিযুগে।
আর কিছু না বলিহআজিমোরআগে ॥
শুন বলি তোমারে যে পবননন্দন।
মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন ॥
যাবৎ আমার নাম থাকিবে সংসারে।
চন্দ্রসূর্য্য যতকাল জগতে প্রচারে ॥

ত্যবৎ থাকহ তুমি হইয়া অমর।
তোমার প্রসাদে মুক্ত হবে চরাচর ।।
হনুমান বলে নাহি চাহি স্বর্গবাস।
তোমার যে গুণ শুনি এই অভিলাষ ।।
শ্রীরাম তোমার নাম হইবে যেখানে।
সেইখানে সুস্থির থাকিব রাত্রিদিনে ।।
হনুপ্রতি বলেন শ্রীকমললোচন।
তুমি আমি একদেহ কবিবা গান ।।
আমা ভক্ত কপি তুমি পরমসুস্থির।
যেই তুমি সেই আমি এই শরীর ।।
ব্রহ্মার বরেতে চারিযুগে চিরজীবী।
আমার বদলে তুমি পালহ পৃথিবী ।।
শুন বলি মহাজ্ঞানী মন্ত্রী জাম্বুবান।
চারিযুগে অমর তুমি ব্রহ্মার কল্যাণ ।।
আরবার হক তব প্রথম যৌবন।
তোমারে জিনিতে না পারিবেকেজন ।।
আরবার আমি যদি হই অবতার।
তব সঙ্গে দেখা তবে হইবে আমার ।।
আর যত মনুষ্য আসুক মোর সনে।
স্বর্গবাসে যাইতে যাহার থাকে মনে ।।
দিলেন শ্রীরাম লবকুশে ছত্রদণ্ড।
হাতে হাতে সমর্পেন যত রাজখণ্ড ।।
হনুমান জাম্বুবান মহেন্দ্র বানর।
লবকুশসনে দেন করিয়া দোসর ।।
বিভীষণে আনি রাম করি সমর্পণ।
লবকুশে রাজা করি করেন গমন ।।

শ্রীরাম, ভরত ও শত্রুঘ্নের স্বর্গারোহণ

সুযাত্রা করিয়া রাম ছাড়েন সংসার।
রাম গেল পৃথিবী হইল অন্ধকার ।।
অযোধ্যা ছাড়িয়া রাম করেন গমন।
বশিষ্ঠনারদ-আদি সঙ্গে মুনিগণ ।।
অবধূত সন্ন্যাসী চলিল সারি সারি।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণ চারি ।।
হাতে লড়ি করিয়া চলিল খোঁড়া কাণা।
শ্রীরামের সঙ্গে যায় না মানিল মানা ।।
স্থাবরজঙ্গম চলে শ্রীরামের সনে।
গাছ পক্ষী না রহে না পশু রহে বনে ।।
ভূতপ্রেতপিশাচ চলিল অন্তরীক্ষে।
হরিষ হইয়া যায় উত্তরের দিকে ।।
রাজাখণ্ড সব গেল হেমন্তপর্ব্বতে।
একচাপে যায় লোক ছয়মাসের পথে ।।
সংসার ছাড়িয়া রাজা যায় লক্ষ লক্ষ।
নপুংসক চলিল যে অন্তঃপুর রক্ষ ।।
চলিল সুগ্রীবরাজা শ্রীরামের মিত।
ছত্রিশকোটি সেনাপতি চলিল ত্বরিত ।।
ব্রহ্মা আনিলেন রথ শ্রীরামে লইতে।
বৈকুণ্ঠে আসিবে প্রভু জগৎ সহিতে ।।
তিনকোটি রথ এল দেবলোকে দেখে।
আকাশ যুড়িয়া রথ রহে অন্তরীক্ষে ।।
জাহ্নবী-সরযূনদী একঠাঁই বহে।
গঙ্গা এড়ি রঘুনাথ সরযূতে রহে ।।
মুক্ত পূর্ব্বপুরুষ যে সরযূ জলে।
গঙ্গা এড়ি রঘুনাথ সরযূতে উলে ।।
সরযূর স্রোত বহে অতি খরশান।
স্রোতে নামি তিনভাই ত্যজিলেন প্রাণ ।।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্পবরিষণ।
সরযূতে তিনভাই ত্যজেন জীবন ।।
নরদেহ ছাড়িয়া গেলেন তিনজন।
বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণু গিয়া দেন শরশন ।।
শ্রীরামভরত ও লক্ষ্মণশত্রুঘন।
মিলি হইলেন একদেহ নারায়ণ ।।
সীতাদেবী আইলেন শ্রীরামের পাশে।
লক্ষ্মীরূপা হইলেন সীতা অবশেষে ।।

বৈকুণ্ঠনাথ যদি আইলা ভগবান।
ব্রহ্মারে ডাকিয়া কিছু কহেন বিধান ॥
আমার সহিত যত আসিয়াছে প্রাণী।
কোথায় থাকিবে তারা কিছুই না জানি ॥
বিরিঞ্চি বলেন শুন রাজীবলোচন।
সন্তান নামেতে স্বর্গ করেছি সৃজন ॥
সেইখানে আসিয়া রহিবে সর্ব্বজন।
বাঞ্ছা করে যেখানে থাকিতে দেবগণ ॥
যেই জন রামায়ণ করিবে শ্রবণ।
পরলোকে এই স্বর্গে করিবে গমন ॥
ভক্ত অনুরূপ স্বর্গ অনেক প্রকার।
গোবিন্দ ভাবিয়া লোক পায় ত নিস্তার।
শ্রীরামের ভক্ত যে পাইল স্বর্গবাস।
ইহা দেখি ব্রহ্মার সে মনে হৈল ত্রাস ॥
চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে করিছেন স্তুতি।
তোমা-দরশনে নাথ পাইনু নিষ্কৃতি ॥
আগমপুরাণ যত মীমাংসাবেদান্ত।
তোমার মহিমা রাম কে পাইবে অন্ত।
আমা হেন কোটি ব্রহ্মা নাহি পায় সীমা।
এমনি অনন্ত তুমি অনন্তমহিমা ॥
পুণ্যবন্দী হয় রামে করিলে স্মরণ।
পাপে পাপী মুক্ত হয় শুনি রামায়ণ ॥
চারিবেদ সহস্র নামে যত ফল হয়।
রামনাম তার কোটিগুণ ফল দেয় ॥
রামনাম লইতে যে করে অভিলাষ।
সর্ব্বপাপে মুক্ত সে বৈকুণ্ঠে করে বাস ॥
অপুত্রক লোক শুনি পায় পুত্রফল।
সপ্তকাণ্ড শুনি পায় অশ্বমেধ ফল ॥
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অমৃতের খণ্ড
এতদূরে সমাপ্ত হইল সপ্তকাণ্ড ॥

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

ব্যাখ্যা ও টীকা

শ্রীরামের সভায় মুনিগণের আগমন ॥

শার্ঙ্গ—শৃঙ্গনির্মিত ধনু। **শ্রবণেতে**—কানেতে। **শ্রীবৎসলাঞ্ছিত**—বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থ দক্ষিণাবর্ত লোমাবলী শোভিত। **চরণে নূপুর……করে ধ্বনি**—রামচন্দ্রের পায়ে পবিহিত নূপুরের শব্দকে পদ্মবনে বিচরণকারী হংসধ্বনির সঙ্গে তুলনা কবা হয়েছে। **সংহতি**—সঙ্গে, সহিত। **চতুর্মুখ**—ব্রহ্মা। **চিত**—চিত্ত। **চারিভিতে**—চতুর্দিকে। **মুনিগণে সমাগত ….সমস্ত কুশল**—আদর্শ নরপতি রামচন্দ্র মুনিঋষিব আপ্যায়নে সদাসতর্ক। প্রাচীন ভারতবর্ষে মুনি-ঋষিরা নৃপতিব চেয়েও সম্মাননীয় ছিলেন। কৃত্তিবাস মূল বাল্মীকি রামায়ণের অনুসাবী এখানে। মূল বামায়ণে আছে—দৃষ্ট্বা প্রাপ্তান্ মুনীং স্তাং স্তু প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ। পাদ্যার্ঘ্যাদিভিরানর্চ গাং নিবেদ্য চ সাদরম্ ॥ **মায়ার প্রবন্ধ**—মায়া-কৌশল। **শমন**—যম। **বিরিঞ্চি**—ব্রহ্মা। **পুরন্দরে**—ইন্দ্রে। **এড়ি**—ত্যাগ করে, ছেড়ে। **বাখান**—প্রশংসা। **কোঙর**—কুমার, পুত্র। **পাঁচালী**—আখ্যান। **শিকলি**—অধ্যায়, ভাগ।

বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ১ম সর্গেব অনুসবণে কৃত্তিবাস তাঁর উত্তরাকাণ্ডের 'প্রথম শিকলি' বচনা করেছেন, তবে আরম্ভে ভিন্নতা লক্ষণীয়। সপার্ষদ রামচন্দ্রের রাজসভা ও তাঁর দেহসৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে কৃত্তিবাস উত্তরাকাণ্ডের সূচনা করেছেন, কিন্তু মূলে তা নেই। মূলে আরম্ভ এরূপ—প্রাপ্তবাজ্যস্য রামস্য রাক্ষসানাং বধে কৃতে। আজগ্মুর্মুনয়ঃ সর্বে রাঘবং প্রতিনন্দিতুম্ ॥ অর্থাৎ রাক্ষসবধের পর রাম রাজ্যলাভ করলে তাঁকে অভিনন্দিত করার জন্য মুনিগণ উপস্থিত হলেন। মূল রামায়ণে উত্তরকাণ্ডের ১ম সর্গে রামের নিকট মুনিদের আগমন, তাঁদের সঙ্গে রামের কথোপকথন ও রামের প্রশ্ন—এই বর্ণিত হয়েছে। কৃত্তিবাসও তাঁর রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের প্রথম শিকলিতে এই কাহিনীই বর্ণনা করেছেন। মূলে অগস্ত্য, অত্রি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি প্রভৃতি বহু মুনির নামোল্লেখ রয়েছে, কিন্তু কৃত্তিবাস অগস্ত্য ব্যতীত আর কোনও মুনির নামোল্লেখ করেননি। মূল রামায়ণে আছে, অগস্ত্যমুনিই রামচন্দ্রের সমস্ত প্রশ্নের উত্তরদাতা। কৃত্তিবাসেও তাই। অগস্ত্য মুনিকে রামচন্দ্রের রাবণ ও কুম্ভকর্ণকে বাদ দিয়ে ইন্দ্রজিতের প্রশংসার কারণ জিজ্ঞাসা মূলেরই অনুসারী। মূলে আছে—ভগবন্তঃ কুম্ভকর্ণং রাবণঞ্চ নিশাচরম্। অতিক্রম্য

মহাবীর্য্যো কিং প্রশংসথ রাবণিম্ ।। অর্থাৎ রাবণ ও কুম্ভকর্ণকে বাদ দিয়ে ইন্দ্রজিতের প্রশংসা কেন ? কৃত্তিবাসও অনুরূপভাবে লিখেছেন—কাটিলে না মরে সে না ধরে কেহ টান। কুম্ভকর্ণ এড়ি ইন্দ্রজিতের বাখান।। দশমুণ্ড কাটিয়া পাইয়াছিল বর। তারে ছাড়ি বাখান কি তাহার কোঙর।। মূলে উত্তরকাণ্ডের ১ম সর্গের যেখানে সমাপ্তি, কৃত্তিবাসের উত্তরাকাণ্ডের প্রথম শিকলিরও সেখানেই সমাপ্তি।

লক্ষ্মণের চতুর্দশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য, নিদ্রাজয় ও উপবাসবৃত্তান্ত ॥

সভাখণ্ড—সভাস্থ যাবতীয় লোক। **আড়ে**—আড়ালে। **নোঙাইল**—নত করল। **রাজীবলোচন**—পদ্মলোচন, পদ্মের মত চোখ যার। **আমি না চিনিনু ……চরণ নূপুর**—রামসীতাসহ বনবাসকালে মুহূর্তের জন্য সীতার মুখাবলোকন দূরের কথা, চরণ ভিন্ন অন্য কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও লক্ষ্মণ দৃষ্টিপাত করেননি, ফলে রাবণ কর্তৃক অপহরণকালে সীতা যে সব অলঙ্কারাদি ঋষ্যমূক পর্বতে নিক্ষেপ করেন, সে-সবের মধ্যে একমাত্র নূপুর ভিন্ন অন্য কোন অলঙ্কার সীতার অঙ্গভূষণ কিনা তা লক্ষ্মণের পক্ষে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। লক্ষ্মণ চরিত্রের অসামান্য ঔজ্জ্বল্য এতে আভাসিত। অবশ্য কৃত্তিবাস এ অংশটুকু মূলের অনুসরণেই লিখেছেন।

তুণ—বাণ রাখবার আধার, পাত্র। **বদন**—মুখ। **বিয়োগ**—মৃত্যু। **সমাচারে**—সংবাদে। **পাতালে……মহীর যেই দিনে**—লঙ্কাকাণ্ডে বর্ণিত মহীরাবণের কথা বলা হয়েছে। মহী (মহীরাবণ) রাবণের অন্যতম পুত্রের নাম, ইনি পাতালে বসবাস করতেন। লঙ্কার ঘোরতর দুর্গতি-মুহূর্তে রাবণ তাঁকে স্মরণ করলে তিনি লঙ্কায় আসেন। পিতাকে বিপন্মুক্ত করার জন্য রাম-লক্ষ্মণকে অপহরণ করে পাতালপুরীতে নিয়ে যান এবং সেখানে বন্দী করে রাখেন। হনুমান পাতালপুরীতে গিয়ে মহীরাবণকে বধ করে রাম-লক্ষ্মণকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেন। মূল রামায়ণে এ বৃত্তান্ত নেই। **নফর**—ভৃত্য। **পাসরিনু**—বিস্মৃত হলাম।

কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের আক্ষরিক অনুসরণ করেননি। মূলের বহু আখ্যানকে যেমন বর্জন করেছেন, তেমন অনেক নতুন কাহিনী সংযোজন করেছেন। লক্ষ্মণের চতুর্দশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য জীবনযাপনের বৃত্তান্ত মূলে নেই, কৃত্তিবাস এটি সংযোজন করেছেন। প্রকারান্তরে ইন্দ্রজিতের শৌর্যবীর্যের অসাধারণত্ব

প্রতিপাদনে জন্যই এ বৃত্তান্তের অবতারণা, ধারণা। এই আখ্যানরচনা কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত নয়। অধ্যাত্মরামায়ণ থেকে এর সূত্র আহৃত। অধ্যাত্মরামায়ণে বলা হয়েছে, দুর্ধর্ষ ইন্দ্রজিৎকে বধ করতে তিনিই সমর্থ, যিনি দ্বাদশ বর্ষ নিদ্রাহারবর্জিত অবস্থায় কাল কাটাবেন—

যস্তু দ্বাদশ বর্ষাণি নিদ্রাহারবিবর্জিতঃ।
তেনৈব মৃত্যুর্নির্দিষ্টো ব্রহ্মণাস্য দুরাত্মনঃ ॥ —লঙ্কাকাণ্ড

রাক্ষসগণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা ॥

প্রাণিগণ বলে .....রাক্ষস—মূল রামায়ণে রাক্ষসকুলের জন্মবৃত্তান্ত ভিন্নরূপ প্রদত্ত। মূলে আছে, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে জল সৃষ্টি করেন। তারপর প্রাণিগণকে সৃষ্টি করে বললেন, তোমরা সযত্নে এই জল রক্ষা কর। একদল বলল 'রক্ষামঃ'—আমরা রক্ষা কবব। ব্রহ্মাব আদেশে তারা রাক্ষস হল। আর একদল বলল, 'যক্ষামঃ'—আমবা পূজা করব, তারা যক্ষ হল।

রক্ষাম ইতি যৈরুক্তং বাক্ষসাস্তে ভবন্তু বঃ।
যক্ষাম ইতি যৈরুক্তং যক্ষা এব ভবন্তু বঃ ॥
—উত্তরকাণ্ড, ৪র্থ সর্গ

কৃত্তিবাস 'রাক্ষস' শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করেননি, দেখা যাচ্ছে। প্রাণিকুল বক্ষা করতে অস্বীকৃত হলে তারা রাক্ষস হয়, এই-ই তিনি বলেছেন। **হেতি নামে… দুরাচারী**—মূলে হেতি ও বিদ্যুৎকুমারীর বিবাহপ্রসঙ্গ নেই। মূলে আছে, হেতি কালের ভগিনী ভয়াকে বিবাহ করেন। এঁদের পুত্র সুকেশ। কৃত্তিবাস হেতি ও বিদ্যুৎকুমারীর সন্তানকে সুকেশ বলেছেন। **গঙ্গাধর**—শিব। **সোসর**—সদৃশ। **মন্দর পর্বতে……ধূর্জটীর বরে**—পিতামাতার পরিত্যক্ত সুকেশ ধূর্জটী অর্থাৎ শিবের বরে মহাবলশালী হন। এখানে কৃত্তিবাস বিশ্বস্তভাবে মূলের অনুসরণ করেছেন। মূলেও নবজাতক সুকেশকে মাতাপিতা কর্তৃক পরিত্যাগের কথা এবং শিবপার্বতীর অনুগ্রহে মহাবলশালী হবার কথা আছে।

উত্তরকাণ্ডের ৪র্থ সর্গের বিষয়ানুসরণ কৃত্তিবাস বিশ্বস্তভাবে করেছেন। মূলের মতই কৃত্তিবাসের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত ও সংহত।

মালী, সুমালী ও মাল্যবানের জন্ম, লঙ্কাপুরীতে রাক্ষসরাজ্য স্থাপন ॥

বিভা কৈল—বিবাহ করল। **উৎকট**—ভয়ানক। **পাণ**—তাম্বুল, পর্ণ-শব্দজাত, পান দেওয়া ও নেওয়ার অর্থ নিয়োগ (appointment). **বেড়া**—বেষ্টিত। **চৌয়ারি**—চার চালের ঘর (চৌরীঘর)। **নেতের**—পট্টবস্ত্রের। **ত্রিকূট গিরির······করিল নির্মাণ**—স্বর্ণলঙ্কার এই সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের পরিচয় মূলেও আছে।

এখানে কৃত্তিবাসের বর্ণনা মূলানুসারী, তবে মূলের আখ্যানকে আগে-পিছে করে নেওয়া হয়েছে। মালী, সুমালী ইত্যাদির সন্তানসন্ততির নামেরও অল্পস্বল্প পরিবর্তন রয়েছে। মূলে আছে, ব্রহ্মার বরে ত্রিভুবন জয় করে তিন ভ্রাতা বিশ্বকর্মাকে তাঁদের আবাসযোগ্য একটি মনোহর পুরী নির্মাণের আদেশ দেন। বিশ্বকর্মা তখন ইন্দ্রাদেশে নির্মিত লঙ্কা নামক পুরীতে তাঁদের বসবাস করতে বলেন। বিশ্বকর্মার নির্দেশমত তিন ভ্রাতা লঙ্কাপুরীতে বসবাস করতে থাকেন। এই লঙ্কায় বসবাসকালে তিন ভ্রাতার বিবাহ এবং পুত্রকন্যাদির জন্ম হয়। কৃত্তিবাসে বলা হয়েছে, তিন ভ্রাতার বিবাহহেতু রাক্ষস-বংশের বিস্তার ঘটে এবং সে কারণে তাঁদের বাসযোগ্য স্থানের প্রয়োজন হয়। ভ্রাতৃত্রয়ের নির্দেশে বিশ্বকর্মা তখন বাসোপযোগী লঙ্কাপুরী নির্মাণ করেন। উত্তরকাণ্ডের ৫ম সর্গের অনুসরণে এই অংশ রচিত। উত্তরকাণ্ডের ২য় ও ৩য় সর্গের বৃত্তান্ত কৃত্তিবাস এর পরে এনেছেন। মূলে এই ২য় ও ৩য় সর্গে রামচন্দ্রের জিজ্ঞাসায় অগস্ত্য রাবণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা-প্রসঙ্গে তাঁর পূর্বপুরুষ ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্যের কথা, তৎপুত্র বিশ্রবার কথা এবং তৎপৌত্র রাবণের বৈমাত্রেয় অগ্রজ কুবেরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। পরে কৃত্তিবাস-বর্ণিত সুকেশ ও মালী, সুমালী ইত্যাদি তিন ভ্রাতার প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন।

গজকচ্ছপের বৃত্তান্ত ॥

থুয়ে গেল—রেখে গেল। **দাওয়া**—পাওনার দাবী। **জিনে**—জেতে। **যতনে করিয়া······অকারণ**—অর্থের সদ্ব্যবহার না হলে তার কোন মূল্য নেই—এই প্রাজ্ঞ বচন অর্থোপার্জনকারী সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। উপার্জিত অর্থকে ভোগে কিংবা ত্যাগে ব্যয় না করে সঞ্চিত করে রাখা নিতান্ত মূঢ়তা মাত্র—এ সার বচন আমাদের জীবনে গ্রহণীয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ থেকে এ জাতীয় নীতিশিক্ষাতে বাঙ্গালীর জীবনবোধ একদা পরিপুষ্ট হত।

চাপানে—পেষণে। **সদন**—আবাস। **ছিণ্ডিব**—ছিঁড়ে ফেলব। **তরাস**—সন্ত্রাস। **প্রজাপতি**—ব্রহ্মা। **বিরস**—বিষণ্ণ।

মূল রামায়ণে এই গজকচ্ছপের বৃত্তান্ত নেই। কৃত্তিবাস সাধারণ গ্রাম্য শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের মুখাপেক্ষী হয়ে কিছু কিছু কৌতুককর বৃত্তান্ত সংযোজন করেছিলেন। বাল্মীকির আক্ষরিক অনুবাদ পরিবেশন তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। মাঝে মাঝে এ জাতীয় মনোহর আখ্যান জুড়ে তাঁর রামপাঁচালীকে সরস ও মধুর করেছেন। কাহিনীটির সরসতা ও সাবলীলতা আমাদের গল্পরসপিপাসু চিত্তকে অনায়াসে মুগ্ধ করে।

মালীর মৃত্যু এবং সুমালী ও মাল্যবানের পাতালপ্রবেশ ॥

জাঠা—অস্ত্রবিশেষ। **যক্ষ**—দেবযোনিবিশেষ। **কিন্নর**—অশ্বমুখ-নরশরীর। **নাহি আঁটে রণ**—যুদ্ধে তিষ্ঠাতে পারে না। **টুটে**—ভাঙ্গে, দূরীভূত হয়। **যতি**—তপস্বী। **কটক-ঠাট**—সৈন্যশ্রেণী। **পট্টিশ**—অস্ত্রবিশেষ। **তোমর**—ছুঁড়ে মারবার দণ্ডবিশেষ। **দুহাতিয়া**—দু'হাত দিয়ে ব্যবহার করতে হয়, এমন। **বাড়ি**—দণ্ড। **ঝঞ্ঝনা**—বজ্র। **চিকুর**—বিদ্যুৎ। **কুপিয়া……উভরড়ে**—মালী, সুমালী ও গরুড়বাহন বিষ্ণুর ভয়ঙ্কর যুদ্ধের চিত্রটি স্বল্পকথায় অপূর্ব অঙ্কিত। মালী সুমালী ও দুই ভ্রাতা একযোগে বিষ্ণুকে আক্রমণ করল। দুহাতিয়া বাড়ি দিয়ে তারা মুহুর্মুহু বিষ্ণুর বাহন গরুড়কে আঘাত করতে লাগল। ঘন ঘন অস্ত্রপ্রহারের দ্রুততা ও তীব্রতায় মনে হতে লাগল যেন বজ্র ও বিদ্যুৎ একযোগে মুহুর্মুহু গরুড়ের উপর বর্ষিত হচ্ছে। দুই ভ্রাতার অস্ত্রপ্রহারে কাতর ও অতিষ্ঠ গরুড় দ্রুতবেগে বিষ্ণুকে নিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করল। মূলেও আছে—ললাটদেশেঽভ্যহনদ্ বজ্রেণেন্দ্রো যথাচলম্। গদয়াভিহতস্তেন মালিনা গরুড়ো ভৃশম্।। রণাৎ পরাঙ্মুখং দেবং কৃতবান্ বেদনাতুরঃ। পরাঙ্মুখে কৃতে দেবে মালিনা গরুড়েন বৈ ॥ উত্তরকাণ্ড, ৭ম সর্গ। **উভরড়ে**—দ্রুতবেগে। **ভঙ্গ**—পলায়ন। **উলটিয়া গরুড়ে আইল**—গরুড় ফিরে এল। **মালসাট**—বাহুতে চাপড় মেরে আস্ফালন।

এই বৃত্তান্ত মূলের উত্তরকাণ্ডের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম সর্গের বিশ্বস্ত অনুসরণ বলা চলে। তবে মূলে নারদ ও ব্রহ্মার বৃত্তান্ত নেই। মূলে আছে, বিষ্ণুর সকাশে রাক্ষসদের সম্পর্কে দেবতাদের অভিযোগের কথা মাল্যবান জানতে পেরে ভ্রাতাদের জানায়। ভ্রাতারা পরামর্শ করে দেবতাদের আক্রমণ করে। দেবতাদের সাহায্যার্থে বিষ্ণু তখন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কৃত্তিবাস ঘটনাকে ঈষৎ পরিবর্তিত করেছেন।

কৃত্তিবাসে দেখা যাচ্ছে, তিন ভ্রাতা প্রথমে বিষ্ণুকে এবং পরে দেবগণকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। এই ব্যতিক্রমটুকু ভিন্ন বাকী অংশ মূলানুগ। মূলের বিস্তৃত যুদ্ধবর্ণনা অবশ্য কৃত্তিবাসে সংক্ষিপ্ত।

কুবেরের জন্ম, তপস্যা ও লঙ্কায় রাজত্ব ॥

কেলি—ক্রীড়া। **অনূঢ়া**—অবিবাহিতা। **নিষ্কৃতি**—মুক্তি। **মহারথা**—মহাবীর। **পুরন্দর**—ইন্দ্র। **বাখান**—বর্ণনা। **শ্রীনিবাস**—বিষ্ণু।

মূল রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে ২য় ও ৩য় সর্গে এই কুবের বৃত্তান্ত আছে। এখানে অগস্ত্যমুনি আদিতে কুবের-বৃত্তান্ত বলে পবে রাক্ষস-বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। কৃত্তিবাস মূলের বর্ণনার ক্রমভঙ্গ করে প্রথমে রাক্ষসবৃত্তান্ত বলেছেন। মূলের বর্ণনা কোথাও সংক্ষেপ কবেছেন, আবার কোথাও বিস্তৃত করেছেন। পুলস্ত্যমুনির বর্ণনা মূলে একটু বিস্তৃত কিন্তু কৃত্তিবাস মাত্র দুটি ছত্রে তা সেরেছেন। কৃত্তিবাস পুলস্ত্যমুনির বিবরণ একপ দিয়েছেন—মহামুনি পুলস্ত্য যে ব্রহ্মার নন্দন। ব্রহ্মার সমান মহাতপে তপোধন ॥ মূলে আছে—পুবা কৃতযুগে রাম প্রজাপতিসুতঃ প্রভুঃ। পুলস্ত্যো নাম ব্রহ্মর্ষিঃ সাক্ষাদিব পিতামহঃ ॥ নানুকীর্ত্যা গুণাস্তস্য ধর্মতঃ শীলতস্তথা। প্রজাপতেঃ পুত্র ইতি বক্তুং শক্যং হি নামতঃ ॥ প্রজাপতিসুতত্বেন দেবানাং বল্লভো হি সঃ। ইষ্টঃ সর্বস্য লোকস্য গুণৈঃ শুভ্রৈর্মহামতিঃ ॥ কৃত্তিবাস তৃণবিন্দু কন্যার আচার-আচরণে যে প্রগল্‌ভতার চিত্র এঁকেছেন, মূলে কিন্তু তা নেই। মূলে দেখা যায়, সখীদের সঙ্গে হাস্যরসে যোগ দিলেও পুলস্ত্যের তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার কোন সজ্ঞান অভিপ্রায় তার ছিল না।

রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম, তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি ॥

দুহিতে—কন্যাকে। **মরাল**—রাজহংস। **কটি**—কোমর। **হরিণাক্ষী**—হরিণের মত চোখ যার। **নিকষা তাহার······করিল প্রণাম**—নিকষার সৌন্দর্য-বর্ণনা অতি মনোহর। প্রথাসিদ্ধ আলঙ্কারিক বর্ণনার অনুসৃতি হলেও বক্ষঃসৌন্দর্য বর্ণনায় কবির নিজস্বতা লক্ষণীয়। মূলে 'নিকষা'-র নাম 'কৈকসী' রয়েছে এবং কোনরূপ দেহবর্ণনা নেই। **সাবিত্রী···আশীর্বাদ করি**—মাল্যবান রাক্ষস হলেও তার পুরাণাদিজ্ঞানের পরিচয় এই বাক্যে মেলে। বস্তুতঃ, কৃত্তিবাস রাক্ষসজাতিকে একেবারে ধর্মাধর্মহীন দুরাচারী করে আঁকেননি। **পিতার······লজ্জিতা**—নিকষা রাক্ষসী হলেও তার মানবিক গুণটুকু লক্ষণীয়। নারীসুলভ লজ্জারক্তিমতাটুকু

নিঃসন্দেহে সুন্দর প্রকাশিত। **সুবদনী**—সুন্দর মুখ যার, সুমুখী। **আলয়েতে**—গৃহেতে। **বারিধারা**—অশ্রুধারা। **সাপটিয়া ধরি**—দৃঢ়রূপে জাপটে ধরে। **গলিতপত্র**—ঝরা পাতা। **ছয় রিপু**—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য। **সৃষ্ট**—সৃষ্টি, সৃষ্ট জগৎ। **চরাচর**—জঙ্গম-স্থাবর, সমস্ত জগৎ। **খেচর**—আকাশচারী, পক্ষী। **পিশাচ**—পিশিত অর্থাৎ কাঁচা মাংস যাদের অশন বা খাদ্য তারা পিশিতাশন বা পিশাচ, প্রেতবিশেষ। **বিষধর**—সর্প। **ধর্মেতে···এই বর**—মূলের আক্ষরিক অনুবাদ বলা চলে। মূলে বিভীষণ 'ধর্মে মম মতির্ভবেৎ' এই বরই ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করেছেন। **সম্বন্ধে হয় নাতি**—ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য। পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবা। বিশ্রবার পুত্র কুম্ভকর্ণ—অতএব ব্রহ্মার সম্পর্কে নাতি। **একেশ্বর**—একাকী।

মূল রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৯ম-১০ম সর্গের একটু-আধটু ব্যতিক্রম ভিন্ন কৃত্তিবাস হুবহু অনুসরণ করেছেন। তিন ভ্রাতার কঠোর তপস্যার যে বিবরণ দিয়েছেন, তা মূলেও অনুরূপ আছে। কালিদাসের কুমারসম্ভবে বর্ণিত উমার তপস্যার ঈষৎ প্রচ্ছায়া কৃত্তিবাসের বর্ণনায় লক্ষণীয়। কৃত্তিবাসে আছে—কঠোর তপস্যা তারা করে তিনজন। বৃক্ষের গলিত পত্র করয়ে ভক্ষণ॥ কুমারসম্ভবে (৫ম সর্গ/২৮শ শ্লোক) আছে—গাছের ঝরাপাতা দ্বারা ক্ষুন্নিবারণ তপস্বীর সবচেয়ে কঠিন তপস্যার দৃষ্টান্ত। তপস্বিনী উমার তপস্যা এত কঠোর ছিল যে, উমা ঝরা পাতাটি পর্যন্ত ভক্ষণ করতেন না। এ কারণে তাঁর অপর নাম হয়েছিল 'অপর্ণা'। মূলে আছে, তপস্যারত তিন ভ্রাতার কাছে ব্রহ্মা একবার মাত্র এসেছিলেন এবং তাঁদের ঈপ্সিত বরদান করেছিলেন। কৃত্তিবাস ব্রহ্মার বরদান বিষয়ে একটু ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। কৃত্তিবাসে রাবণের কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মার দুবার আগমনের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। প্রথমবারে রাবণ অমরত্ব প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা তা দিতে অস্বীকার করেন। রাবণ বর না নেওয়ায় ব্রহ্মা ফিরে যান। রাবণ পুনরায় কঠোর তপস্যা করলে ব্রহ্মা দ্বিতীয়বার আগমন করেন এবং রাবণকে তাঁর ঈপ্সিত বরদান করেন। দেবী সরস্বতীর প্রভাবে কুম্ভকর্ণের অনেক বর্ষ নিদ্রাপ্রার্থনা এবং ব্রহ্মার তা পূরণ মূলানুসারী। রাবণের প্রার্থনায় ব্রহ্মার প্রদত্ত বরের সংশোধন—'ছয় মাস নিদ্রা একদিন জাগরণ' উত্তরকাণ্ডে না থাকলেও মূল রামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডে ৬১তম সর্গে আছে। যুদ্ধকাণ্ডে এবংরূপ বর্ণনা মেলে—ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে দেখে ভয় পেয়ে বললেন, তুমি মৃতকল্প হয়ে শুয়ে থাকবে। এই কথা শুনে রাবণ বললেন, ইনি

আপনার পৌত্র, একে এমন শাপ দেওয়া আপনার অন্যায়। তখন ব্রহ্মা বললেন, কুম্ভকর্ণ ছয় মাস ঘুমিয়ে থেকে একদিন জাগবে।

রাবণ কর্তৃক লঙ্কারাজ্য-অধিকার, রাবণাদির বিবাহ ও মেঘনাদের জন্ম ॥

তনয়—পুত্র। **কোল**—আলিঙ্গন। **কনক**—স্বর্ণ। **অনাবাসে**—গৃহহীন-ভাবে, নিরাশ্রয়ভাবে। **ঠাকুরাল**—প্রভুত্ব, রাজত্ব। **সভা**—সকলের। **দণ্ডধর**—রাজা। **নাগ**—সর্প। **বৈমাত্রেয় ভাই……দণ্ডধর**—দেবতা ও দৈত্যদের পিতা কশ্যপমুনি। ইনি অদিতি ও দিতিকে বিবাহ করেন। অদিতির গর্ভে ইন্দ্রাদি দেবতার জন্ম এবং দিতির গর্ভে দৈত্যাদির জন্ম। দৈত্যেরা প্রকৃতপক্ষে দেবরাজ ইন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

নোঙাইল—নত করল। **পিরীত**—মিত্রতা, সখ্য। **দ্বন্দ্বে**—কলহে। **অংশাঅংশি**—ভাগ। **রাবণের……না জানে**—মূলে আছে, রাবণের ব্রহ্ম-শাপের কথা বিশ্রবার কাছে ময়দানব জানা সত্ত্বেও আপন কন্যার সঙ্গে রাবণের বিবাহ দেন। **মৃগয়া**—শিকার। **শেলপাট**—শল্যাস্ত্র। **ত্রিংশৎ**—ত্রিশ। **যোজন**—চার ক্রোশ। **প্রমাদ**—বিষাদ।

উত্তরকাণ্ডের ১১শ সর্গের অনুসরণে 'রাবণ কর্তৃক লঙ্কারাজ্য-অধিকার' অধ্যায়টি রচিত। কৃত্তিবাসের বর্ণিত আখ্যান মূলেরই অনুরূপ। এই অধ্যায়ের আরম্ভ ও উপসংহার সম্পূর্ণ মূলানুসারী। কৃত্তিবাসের আরম্ভ—সুমালী শুনিয়া ……তারা উঠিল ত্বরিত। মূলে আছে—সুমালী বরলব্ধাং স্তু জ্ঞাত্বা চৈনান্ নিশাচরান্। উদতিষ্ঠদ্ ভয়ং ত্যক্ত্বা সানুগঃ স রসাতলাৎ॥ কৃত্তিবাসের উপসংহার —মন্ত্রণা করিয়া·· করিল রাজা লঙ্কার ভিতরে। ১১শ সর্গের উপসংহারেও আছে— সা চাভিষিক্তঃ ক্ষণদাচরৈস্তদা নিবেশয়ামাস পুরীং দশাননঃ।

উত্তরকাণ্ডের ১২শ সর্গের অনুসরণে রাবণাদির বিবাহ ও মেঘনাদের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত। মূলে তিন ভ্রাতাসহ শূর্পণখার বিবাহকথা আছে, কৃত্তিবাসে তা নেই। কৃত্তিবাসে কেবল তিন ভ্রাতার বিবাহের বিবরণ আছে। মূলে 'মেঘনাদ' এই নামকরণের কারণ এবংরূপ প্রদত্ত—রুদতা সুমহান মুক্তো নাদো জলধরোপমঃ। জড়ীকৃতা চ সা লঙ্কা তস্য নাদেন রাঘব॥ পিতা তস্যাকরোন্নাম মেঘনাদ ইতি স্বয়ম্। কৃত্তিবাস এক্ষেত্রে বলেছেন—মেঘের গর্জনে গর্জে লঙ্কার ভিতরে। দেবদানব ত্রিভুবন কাঁপে তার ডরে॥ কুম্ভকর্ণের জন্য পুরীনির্মাণের বিবরণটুকু উত্তরকাণ্ডের ১৩শ সর্গের প্রথমাংশ থেকে গৃহীত।

কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধে রাবণের জয়লাভ ॥

পিঙ্গল—কপিশ। **অক্ষৌহিণী**—পুরাণে ৬৫,৬১০ অশ্ব; ২১,৮৭০ গজ; ২১,৮৭০ রথ এবং ১০৯,৩৫০ পদাতি-সমন্বিত সেনাকে 'অক্ষৌহিণী' বলা হয়। **ঝকড়া**—ক্ষেপণীয় অস্ত্রবিশেষ। **চির**—বিদীর্ণ। **খাণ্ডা**—খাঁড়া। **খরশান**—তীক্ষ্ণ, ধারাল। **আওয়াসের**—আবাসের, রাজপ্রাসাদের। **গড়ে**—দুর্গে। **রথ হৈতে ···গরুড়ের ঝম্প**—সাপের শত্রু গরুড়। কুবের-সেনাপতি যোগবৃদ্ধকে ধরার জন্য রাবণের প্রচেষ্টাকে গরুড়ের সাপ ধরার প্রচেষ্টার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। উপমাটি প্রথাসিদ্ধ নয়, ফলে এর নতুনত্ব রসচমৎকারিত্বে মনোহারী। **আউদর চুলী**—আলুলায়িত কেশা। **ভগ্নদূত**—যে পদাতি যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে রাজাকে গিয়ে পরাজয় সংবাদ জানায়। **অপার্য্যপক্ষেতে**—অন্য উপায় না থাকায়। **দোহাতিয়া**—দুই হাত পরিমাণযুক্ত। **শার্দুল**—ব্যাঘ্র। **রক্তেরাঙা······সমূলে**—যুদ্ধে পরাজিত ও ভূপাতিত রক্তাক্তদেহ কুবেরের বর্ণনাটি অতীব সুন্দর। উৎপাটিত বৃক্ষ যেমন সমূলে ভূপতিত হয়, তেমনই রাবণের দুর্জয় অস্ত্রপ্রহারে কুবেরও ভূপাতিত।

এই অংশ উত্তরকাণ্ডের ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ সর্গের অনুসরণে রচিত। রাবণের দুরাচারের কথা জেনে কুবেরের তৎসকাশে দূতপ্রেরণ, রাবণ কর্তৃক দূতবধ, কুবের-পুরী আক্রমণ, যুদ্ধে কুবের-সেনাপতি মণিভদ্র ও কুবেরের পরাজয়, কুবেরের পুষ্পক-রথ অধিকার ইত্যাদি ঘটনা মূলের অনুসরণে বর্ণিত। মূলের যুদ্ধ-বর্ণনায় যে গম্ভীর সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে, কৃত্তিবাসে অবশ্য তা পাওয়া যায় না। মূলে পুষ্পক রথটির নির্মাণবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে, কৃত্তিবাসে কেবল রথটির নামোল্লেখমাত্র রয়েছে।

রাবণের প্রতি নন্দীর অভিশাপ এবং রাবণ কর্তৃক কৈলাস উত্তোলনের চেষ্টা ॥

আগুসার—অগ্রসর। **নড়ে**—যায়। **গোড়া**—মূল। **কৃত্তিবাস**—শিব। কৃত্তি অর্থাৎ বাঘছাল বাস অর্থাৎ বস্ত্র যাঁর।

উত্তরকাণ্ডের ১৩শ সর্গের অনুসরণে রচিত। মূলের বর্ণনা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। কৃত্তিবাস এখানে বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করেছেন তবে আখ্যান সম্পূর্ণ মূলানুগ। মূলে 'রাবণ' নামের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে এরূপ—পর্বতপিষ্ট হয়ে দশানন দারুণ 'রাব' অর্থাৎ শব্দ করলে মহাদেব বললেন, তোমার ভয়ানক শব্দে ত্রিলোকস্থিত

প্রাণিকুল ভীত হয়েছে—তাই তুমি 'রাবণ' নামে প্রসিদ্ধ হবে। মূলে রাবণকে শঙ্করের বরদান এবং 'চন্দ্রহাস' নামক অস্ত্র-প্রদানের উল্লেখ আছে, কৃত্তিবাসে তা নেই।

বেদবতীর প্রতি রাবণের অত্যাচার এবং রাবণকে তাহার শাপ-প্রদান॥

এ'ড়িয়া—পরিত্যাগ ক'রে। **অবধান**—শ্রবণ। **হিমাংশুবদনা**—চাঁদের মত মুখ যার, চন্দ্রমুখী। **জাতুধান**—রাক্ষস।

উত্তরকাণ্ডের ১৭শ সর্গের অনুসরণে রচিত। বেদবতী ও রাবণের কথোপকথনে মূলের ক্রম রক্ষিত। মূলে বেদবতীর সীতারূপে জন্মগ্রহণের অদ্ভুত বৃত্তান্ত আছে, কৃত্তিবাসে তা নেই। মূলে আছে—বেদবতী অগ্নিতে দেহত্যাগের পর পদ্মফুলের মধ্যে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। রাবণ পদ্মমধ্যবর্তিনী কন্যাকে গ্রহণ করে নিজগৃহে আনে। কন্যাটি রাবণের বিনাশের কারণ হবে—মন্ত্রী এই কথা বলাতে রাবণ তাকে সাগরমধ্যে নিক্ষেপ করে। তারপর ঐ কন্যা ভূমিদেশ প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করতে থাকে। রাজা জনকের ভূমিতে হলাকর্ষণকালে হলাগ্রভাগে আবির্ভূত হয়।

মরুত্তরাজার যজ্ঞানুষ্ঠান ও রাবণের নিকট পরাজয় স্বীকার॥

সর্প যেন……তার্ক্ষ্য পাখী—সাপের শত্রু তার্ক্ষ্য পাখী অর্থাৎ গরুড। গরুড-দর্শনে সাপেরা ভয়ে পালায়। সাপের কাছে গরুড যেমন ভয়ঙ্কর, দেবতাদের কাছে রাবণও তেমনি ভয়ঙ্কর। রাবণকে দেখে দেবতারা তাই আত্মগোপন করতে থাকে। দেবতার সঙ্গে সাপের এবং রাবণের সঙ্গে তার্ক্ষ্য পাখীর তুলনা করা হয়েছে এখানে। **কাঁকলাস**—গিরগিটি। **খণ্ডে**—দূরীভূত হয়। **যেইজন যোগাইবে……অপার**—মৃত মানুষের আত্মার মঙ্গল কামনায় আমাদের দেশে কাককে আহার্য দেবার প্রথা রয়েছে। একে 'কাকবলি' বলে। বাল্মীকি রামায়ণে এই বিষয়ে ইঙ্গিত থাকায় সামাজিক প্রথা হিসাবে সেকালেও বর্তমান ছিল, ধারণা।

উত্তরকাণ্ডের ১৮শ সর্গের অনুসরণে রচিত। রাবণ কর্তৃক মরুত্তরাজার যজ্ঞস্থলে গমন, যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত দেবতাদের রাবণের ভয়ে পশুপক্ষীদেহে আত্মগোপন, রাবণের নিকট মরুত্ত রাজার পরাজয়স্বীকার, রাবণের যজ্ঞক্ষেত্রত্যাগ ও দেবতাদের

স্ব স্ব মূর্তিধারণ ও ময়ূর হংসাদিকে বরদান ইত্যাদি ঘটনা মূলেরই মত। কোন কোন ক্ষেত্রে মূলের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ লক্ষণীয়।

রাবণকর্তৃক অনরণ্যবধ ও রাবণকে তাহার অভিশাপ প্রদান ॥

বোলে—শব্দে। **ফাঁফর**—কিংকর্তব্যবিমূঢ়। **রাবণের গা……পর্বতশিখরে**—পর্বতের সঙ্গে উপমিত হওয়ায় রাবণের বিরাটত্ব সুন্দর দ্যোতিত হয়েছে। পর্বত-গাত্রে প্রবাহিত গঙ্গার সঙ্গে রাবণের যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দেহনিঃসৃত রক্তধারার তুলনা করা হয়েছে এখানে।

উত্তরকাণ্ডের ১৯শ সর্গে অনরণ্যবৃত্তান্ত আছে। কৃত্তিবাস কিয়দংশে মূলের পরিবর্তন করেছেন। মূলে অনরণ্য বৃদ্ধ, অথর্ব হয়ে পড়েছিলেন এমন কোন উল্লেখ দূরেব কথা, ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। অথচ কৃত্তিবাস রাজা অনরণ্যের এরূপ পরিচয় দিয়েছেন—প্রাচীন বয়স রাজা মাংসে চক্ষু ঢাকে। ভ্রূদ্বয় তুলিয়া বান্ধি রাজা সব দেখে॥

কার্তবীর্য্যার্জ্জুনের হস্তে রাবণের পরাজয় ॥

মায়ারণ……অনেক অন্তর—সম্মুখ যুদ্ধ ও মায়া যুদ্ধের মধ্যে দুস্তর প্রভেদ বর্তমান। দুই পক্ষের যুদ্ধে এক পক্ষের যোদ্ধা যদি মায়াশক্তিতে অদৃশ্য থাকে কিংবা বারে বারে দেহরূপ পরিবর্তন করে তবে অন্যপক্ষের যোদ্ধার সংগ্রাম করা দুঃসাধ্য। যুদ্ধকালে রাবণ মায়াশক্তিতে আশ্রয় নেবার জন্য দুর্জয় হয়ে ওঠে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে রত হলে রাবণের সর্বত্র জয়লাভ দুষ্কর হত। **নর্মদা**—দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত নদী, পবিত্র সাত নদীর অন্যতম। **নাগফুল……সুন্দর**—বাল্মীকি বর্ণিত বিন্ধ্যপর্বতের নিসর্গ-সৌন্দর্যের অপরূপতা না ফুটে উঠলেও কৃত্তিবাসের সহজ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবর্ণনা চিত্তহারী। মূল রামায়ণের নানা স্থানে প্রকৃতির বিচিত্র রূপের যে মনোহর ছবি বাল্মীকি অঙ্কিত করেছেন, তা সত্যই অনুপম। **কেশরী**—সিংহ। **উলিল**—নেমে এল। **মধ্যাহ্নকালের……রবি**—সূর্য আপন ধর্মানুসারে মধ্যাহ্নকালে প্রখর কিরণমালায় পৃথিবীকে তাপিত করছিলেন। রাবণকে দেখেই ভীতিবশতঃ খরতর কিরণতেজ সংহরণ করলেন। দুঃসহ তাপদানের জন্য পাছে সূর্যকে আক্রমণ করে—এই ভয়েই বোধহয় সূর্যের তেজসংহরণ। মূলেও আছে—তীক্ষ্ণতাপকরঃ সূর্য্যো নভসো মধ্যমাস্থিতঃ। মামাসীনং বিদিত্বৈব চন্দ্রায়তি দিবাকরঃ॥

মেখলা—কটিভূষণ। **পসারে**—প্রসারিত করে। **দীঘল**—সুদীর্ঘ। **জাঙ্গাল**—বাঁধ। **কাঁকালি**—কোমর। **পাথার**—সুগভীর জলরাশি। **এড়ি দিল পানি**—জল ছেড়ে দিল। **কাতে কাতে**—গোপনে। **হাতের উপরে ······স্রোতে**—কার্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহস্র হাত। সহস্র হাত দিয়ে গোপনে নর্মদার জল রোধ করলে জল বিপরীতমুখী স্রোতে বইতে থাকে। সহস্র হস্তের বাঁধে বাধা পেয়ে নিরুদ্ধ জলরাশি স্ফীত, উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে দু'কূল প্লাবিত করে। **নিষ্ঠা বার্তা**—সঠিক সংবাদ। **ভেটিতে**—সাক্ষাৎ করতে। **বোলে**—কথায়। **সরল প্রতি······তবে যার দেখা**—কার্তবীর্য্যার্জ্জুনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চমৎকার আভাসিত। শাস্ত্রে রণনীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যুদ্ধে যদি কেউ শাঠ্য অবলম্বন করে, তবে 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'। ন্যায়যুদ্ধে কার্তবীর্য্যার্জ্জুন ন্যায় রণনীতি পালন করেন, আবার যুদ্ধে কেউ কুটিলতার আশ্রয় নিলে তিনিও কুটিলতা অবলম্বন করেন। কার্তবীর্য্যার্জ্জুনের সঙ্গে সংগ্রামে তাঁর এই বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া সম্ভব। **দূত কহে রড়ে**—দূত দৌড়ে গিয়ে বলে। **রাজনিতম্বিনী**—রাজমহিষী। **ভূধর**—পর্বত। **ছয়শত যোজন শরীর······অজগরে**—মূলে কার্তবীর্য্যার্জ্জুনের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধের মনোরম বর্ণনা আছে। কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে বীররসের চিত্রণে তেমন সাফল্যলাভ করেননি। এক্ষেত্রে কিন্তু অনুপ্রাস-প্রয়োগে, উপযুক্ত শব্দ নির্বাচনে যুদ্ধের ঝঞ্ঝনা কিছুটা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন, ধারণা। **হুলাহুলি**—আনন্দকোলাহল। **সান্ধাইল**—প্রবেশ করল। **কক্ষতলি**—বগলে। **দশাস্য**—রাবণ, দশ আস্য অর্থাৎ মুখ যাঁর। **পুটাঞ্জলি**—যুক্ত করে অঞ্জলি। **সন্বিধান** আদেশ। **ঝাট**—শীঘ্র। **নিগড়**—শৃঙ্খল। **দাঁড়াকু**—বেড়ি। **চামে**—চামড়ায়। **বলাবল······আপনি প্রহরী**—কার্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাজ্যশাসনে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা পূর্ণমাত্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। চুরি-ডাকাতির কোন বালাই ছিল না। ফলে কোটাল, প্রহরী নিয়োগের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তাঁর এমন প্রবল প্রতাপই ছিল যে, হারানো ধনের অধিকারীরা তাঁর নাম স্মরণ করলেই তাদের হারানো ধন ফিরে পেত। **পূরিত**—পূর্ণ। **অনিত্য শরীর······কিবা কথা**—মানুষের ধনজনযৌবন সবই অনিত্য। একদিন কালের করালগ্রাসে সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কার্তবীর্য্যার্জ্জুনের মত প্রতাপশালী নৃপতিকেও একদিন ভৃগুবরের হস্তে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। সুতরাং যাঁরা জীবন-যৌবন চিরস্থায়ী মনে করেন, তাঁরা বৃথাই তা মনে করেন। কোন কিছুই এ জগতে নিত্য নয়—এ আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত।

উত্তরকাণ্ডের ১৯শ সর্গ পর্যন্ত যে ঘটনা বিবৃত, কৃত্তিবাস তা ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করেছেন। ১৯শ সর্গের পর থেকে মূলের ঘটনার ক্রমপারম্পর্য কৃত্তিবাসে অনুসৃত হয়নি। অনরণ্যবৃত্তান্তের পর মূল রামায়ণে যমলোক-অভিযান বর্ণিত। তারপর নিবাতকবচগণের সঙ্গে যুদ্ধ, ইন্দ্রলোক জয় ইত্যাদি বর্ণনার পর কার্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রসঙ্গ বর্ণিত। কৃত্তিবাস ১৯শ সর্গের পরে বর্ণিত মূলের ঘটনার অনুসরণ না করে একেবারে ৩১শ সর্গের অনুসরণে কার্তবীর্য্যার্জ্জুনবৃত্তান্ত উপস্থাপিত করেছেন। মূলের ৩১শ-৩৩শ সর্গের অনুসরণে এই দুটি অধ্যায় রচিত। মূল আখ্যায়িকা থেকে কৃত্তিবাস বিচ্যুত হননি, তবে বর্ণনা আপনার মত করে করেছেন। কার্তবীর্য্যার্জ্জুনের হস্তে বন্দী রাবণের কারাগারে যে দুর্গতির চিত্র কৃত্তিবাসে মেলে, তার বিন্দুমাত্রও মূলে নেই। মূলে এইটুকু মাত্র আছে—রাক্ষসাং স্ত্রাসয়ামাস কার্তবীর্য্যার্জ্জুনস্তদা। রাবণং গৃহ্য নগরং প্রবিবেশ সুহৃদ্বৃতঃ॥ অর্থাৎ রাক্ষসদের ভীত করে বন্ধুপরিবৃত হয়ে বন্দী রাবণকে সঙ্গে করে কার্তবীর্য্যার্জ্জুন নগরে প্রবেশ করলেন।

বালিহস্তে রাবণের লাঞ্ছনা, বালিকর্তৃক রাবণের বন্ধনমোচন॥

সিংহনাদ—যোদ্ধাদিগের আস্ফালনসূচক শব্দ। **দশমুণ্ড**—দশমাথা। **যে বীর ······রাশি রাশি**—অহঙ্কারে প্রমত্ত হয়ে যারা বালির সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিল, তাদের অনিবার্য পরিণতি ঘটেছিল মৃত্যু। সেই মৃত যোদ্ধাদের কঙ্কালস্তূপ বালির অমিত পরাক্রমের চিহ্নস্বরূপ হয়ে শোভমান। **দুয়ারী**—দ্বাররক্ষক। **সূর্যের······জ্বলে**—বালির তেজোদীপ্ত মুখের বর্ণনা চমৎকার অঙ্কিত। **নেহালে**—লক্ষ্য করে। **শশারু**—খরগোস। **সর্পদরশনে······গর্জন**—গরুড় সাপের চিরশত্রু। সাপের দর্শনমাত্রেই গরুড় যেমন গর্জে ওঠে, রাবণকে দেখে বালিও তেমনি গর্জন করতে থাকে। এখানে সাপের সঙ্গে রাবণের এবং বালির সঙ্গে গরুড়ের উপমাটি খুবই সার্থক। সাপ যেমন গরুড়ের কাছে হীনবল, রাবণও বালির কাছে তেমনি হীনবল—ব্যঞ্জনায় আভাসিত। **রড়**—দৌড, ছুট। **অকটবিকট**—ছটফট, হাসফাঁস। **এড়ে**—মুক্ত করে। **পরখি**—পরীক্ষা করি। **লাঙ্গুড়ে**—লেজে। **বলে······মিতা করি**—বালি মহাপরাক্রমশালী সন্দেহ নেই—তবে রাবণও যথেষ্ট শক্তিশালী। রাবণের সঙ্গে বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হলে বালির শক্তি আরও বাড়বে—যুগল বীরের পরাক্রমে ত্রিভুবন শঙ্কিত থাকবে। আর বালি যদি

রাবণকে হত্যা করে তাহলে বালির শক্তি 'টুটা' অর্থাৎ কমে যাবে—তার একক শক্তিতে ত্রিভুবন ততটা ভীত হবে না।

উত্তরকাণ্ডের ৩৪শ সর্গের অনুসরণে রচিত। মূলের বালি ও রাবণবৃত্তান্ত একটু সংক্ষিপ্ত। কৃত্তিবাসে তা বিস্তৃত। মূলের বালির তেজোদীপ্ত মূর্তি কৃত্তিবাসে পূর্ণমাত্রায় অক্ষুন্ন রয়েছে। কোন কোন সমালোচক কৃত্তিবাসের অঙ্কিত বানর-চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন—'বানরগণ একেবারেই শাখামৃগ, বালি, সুগ্রীব, হনুমানাদি শাখামৃগত্বের উর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই।' কিন্তু এ মন্তব্য অযথার্থ। বালি জাতিতে 'শাখামৃগ' হতে পারে কিন্তু তার বাহুবল ও তপোবলের যে অসামান্য পরিচয় এখানে বর্ণিত হয়েছে, তাতে 'শাখামৃগত্বের উর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই' বলা চলে কি? রাবণকেও বালির উদ্দেশে বলতে হয়েছে—'তোমা হেন বীর আমি কোথাও না দেখি।' রাবণের সঙ্গে সংগ্রামের মধ্যেও তার পূজাহ্নিকে নিষ্ঠা বিস্ময়কর —'চারিসাগরের সন্ধ্যা ধ্যান নাহি নড়ে'।

যমলোকে রাবণের অভিযান, রাবণের নিকট যমের পরাজয়॥

জরায়—বার্ধক্যে। **লোকপাল**—দিকপাল। **জিনে**—জয় করে। **ছোট জিনে……ঘাটী**—প্রথমে দুর্বল ও ক্ষুদ্রকে জয় ক'রে পরে সবল ও বৃহৎকে জয় করলে তাতে মহিমা বাড়ে—শক্তি ও পরাক্রমের ক্রমোৎকর্ষ এতে সূচিত হয়। কিন্তু সবল ও বৃহৎকে জয় করার পর দুর্বল ও ক্ষুদ্রকে জয় করলে তাতে কোন মহিমা বাড়ে না এবং তার 'ঘাটি' অর্থাৎ লাঘব হয়। **কুড়ি পাটি……ভাদ্র মাসে**—ভাদ্র মাসে চারিদিকে প্রস্ফুটিত অজস্র কেয়াফুলের সঙ্গে রাবণের দশমুখের হাসির তুলনাতে কৃত্তিবাসের সুচারু কবিত্বশক্তির পরিচয় নিহিত। গতানুগতিক সংস্কৃত অলঙ্কারের ভারমুক্ত উপমাটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সরস। **অবিবাদে**—যেখানে কোন কিছু বিবাদ নেই। **বিসম্বাদ**—কলহ, ঝগড়া। **থানা**—সেনাদল। **ভাজন**—পাত্র। **দেব পিতৃভক্ত……লঙ্কেশ্বর**—নরকে পাপীর দুঃখভোগ ও ধার্মিকদের সুখভোগ এদেশের চিরন্তন কবিকল্পনা। যাঁরা আজীবন মহৎ ও পুণ্যকর্মের অধিকারী, তাঁরা যমপুরীতে সুখশান্তির চির-ভোগকারী। যমপুরীর চারিটি দ্বার—তন্মধ্যে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দ্বার পুণ্যবান, ধার্মিক ও সজ্জন ব্যক্তিদের আশ্রয়াগার। মূল রামায়ণে 'যমপুরী'তে এই চারিটি দ্বারের কোন উল্লেখ নেই। কবি মধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গে যে নরকচিত্র রচনা করেছেন—তাতে কৃত্তিবাসের অনুকরণ লক্ষণীয়। মধুসূদন প্রেতপুরীর পূর্ব,

পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—এই চারিটি দ্বারের এবং প্রথম তিনটি ধার্মিকের ও চতুর্থটি পাপীবর্গের জন্য যে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা (ধর্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে। উত্তর, পশ্চিম, পূর্বদ্বারে) করেছেন, তা হুবহু কৃত্তিবাসেরই অনুসৃতি। কৃত্তিবাসী রামায়ণখানিও না পড়ে আমরা মধুসূদনের নরকবর্ণনায় 'ডিভাইনা কমেডিয়া'র কবি দান্তের আবেশ দেখি। কৃত্তিবাসে আছে—পূর্ব আর পশ্চিম দুয়ার যে উত্তর। তিন দ্বারে ধার্মিক লোক দেখে ত বিস্তর ॥ **যমের দক্ষিণ দ্বার……শমনের তাপ**—এই অংশে পাপাচারীদের যমপুরীতে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাভোগের কথা বলা হয়েছে। এই নরকের চিত্র মূল রামায়ণেই আছে—তবে মূলের চিত্র সংক্ষিপ্ত, কৃত্তিবাসে বিস্তারিত। কৃত্তিবাস নরকে পাপাচারীদের যে লোমহর্ষক পীড়নের কাহিনী দিয়েছেন, তার পাশে বাল্মীকির দণ্ডভোগের বর্ণনা ম্লান ও নিষ্প্রভ মনে হয়। খুবসম্ভব নরকের বিভীষিকা-বর্ণনের মধ্যে কৃত্তিবাস রাবণের দুর্মতি দেখাবার ও তার পাপীচিত্তে অনুতাপ জাগাবার আয়োজন করেছেন (গার মাংস জ্বলে পরিত্রাহি ডাকে পাপী। তাহা দেখি রাবণ হইল অতি তাপী)। মূল রামায়ণে কর্মফলতত্ত্বের ভিত্তিতে পাপীর শাস্তিভোগের চিত্র আছে, তবে তা সংক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্ত। পক্ষান্তরে কৃত্তিবাসে কর্মফলভোগের চিত্রতালিকা যেমন বিস্তৃত, তেমনই সুবিন্যস্ত। পরধনহরণ, কামাসক্তি, বিচারীর অবিচার ছাড়াও সেখানে আছে (১) শরণার্থীর প্রাণহরণ, (২) মিথ্যা শাপ বা মিথ্যা কথন, (৩) দেবতা-ব্রাহ্মণের বস্তু অপহরণ, (৪) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিগ্রহ, (৫) মিথ্যা সাক্ষ্যদান, (৬) অতিথি-অবজ্ঞা, (৭) 'একজন দান করে অন্যে হয় হাতা' (অপহারক), (৮) অপরের গৃহদাহ, (৯) উভয়ের ন্যায়ে এক পক্ষে পক্ষপাতী, (১০) 'হারানেরে জিনায় যে হইয়া সাপক্ষ', (১১) 'লোকে পীড়া দিয়া যে তুষিয়াছে ঈশ্বর', (১২) 'যে জন করিয়া ঋণ না করে শোধন', (১৩) পরহিংসা করে যেবা সুজনের নিন্দে'—ইত্যাদি সামাজিক জীবনে বহু সম্ভাব্য অপকর্মের শাস্তিভোগের আলেখ্য। নীতিপরায়ণ কৃত্তিবাস স্পষ্ট করে বলেছেন,—"ছোট করুক বড় করুক যত করে পাপ। পাপানুসারেতে ভুঞ্জে শমনের তাপ ॥" বলা বাহুল্য, মূলের তুলনায় সুকৃতির ফলভোগের চিত্রও কৃত্তিবাসে অনুরূপ প্রশস্তায় রচিত। কবি মধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গে নরকবৃত্তান্ত রচনায় কৃত্তিবাসের কাছে গভীরভাবে ঋণী ছিলেন। কৃত্তিবাস তাঁর 'যমপুরী' বর্ণনায় যমের দক্ষিণ দ্বারের যে 'ঘোর অন্ধকার' ও 'দিনরাত্রি একাকার'-এর সংবাদ দিয়েছেন, তারই প্রেক্ষিতে মধুসূদন লিখেছেন—'তমোময় যমদেশে', 'অদূরে

ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত', 'নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা,' 'অন্ধকারময় পুরী' ইত্যাদি। দক্ষিণ দুয়ারের বর্ণনায় মধুসূদন পাপীর দণ্ডভোগ কেন্দ্ররূপে চৌরাশি নরককুণ্ড, রৌরব ও কুম্ভীপাক, এই যে তিনটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এর মধ্যে 'রৌরব' প্রসঙ্গ বাল্মীকি থেকে ও আর বাকী দুটি কৃত্তিবাস থেকে আহৃত—

কৃত্তিবাস— চৌরাশী সহস্র কুণ্ড দক্ষিণ দুয়ারে।
নরকে ডুবায়ে সব যমদূতে মারে ॥

মধুসূদন— দক্ষিণ দুয়ার এই ; চৌরাশি নরক—
কুণ্ড আছে এই দেশে।

কৃত্তিবাস— যেই যত পরদার করেছে কৌতুকে।
কুম্ভীপাকে পড়ি সেই ডুবিছে নরকে ॥
সুতপ্ত তৈলের কুণ্ড অগ্নির উথাল।
তাহাতে ধরিয়া ফেলে যায় গাব ছাল ॥

মধুসূদন— চল, রথি, চল দেখাইব
কুম্ভীপাকে ; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
পাপীবৃন্দে যে নরকে।

এছাড়া, বিভিন্ন কুকর্মের শাস্তির বর্ণনাতেও মধুসূদনের কৃত্তিবাসের অনুকরণ সুস্পষ্ট।

কাঁফর—অসহায়। **রবির নন্দন**—যম, পিতা সূর্য ও মাতা সংজ্ঞা। **শমনেরে**—যমেরে। **দণ্ডধর**—যম, ইনি কালদণ্ড ধারণ করে থাকেন। **তিতিল**—আর্দ্র হল।

উত্তরকাণ্ডের ২১শ ও ২২শ সর্গের অনুসরণে কৃত্তিবাসে রাবণের যমপুরী আক্রমণ ও নরকদর্শন বর্ণিত হয়েছে। মূলের বিষয়ানুগত্য যথাযথ, তবে বর্ণনায় কৃত্তিবাস যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। উত্তরকাণ্ডের ২২শ সর্গের অনুসরণে যম ও রাবণের যুদ্ধবৃত্তান্ত এবং রাবণের নিকট যমের পরাজয় চিত্রিত হয়েছে। মূলে যুদ্ধের যে ভয়ঙ্কর রূপ ফুটে উঠেছে, কৃত্তিবাসে তা মোটামুটি অক্ষুণ্ণ আছে বলা চলে।

রাবণের নিকট বাল্মীকির পরাজয় ॥

রাম নাম·····পাপী সাবধান—শ্রীচৈতন্য যে নামমাহাত্ম্য প্রচার করেন তার পূর্বাভাস কৃত্তিবাসে মেলে, অবশ্য যদি প্রক্ষিপ্ত না হয়ে থাকে। কৃত্তিবাসের

রামায়ণে যে রাম-নামের মাহাত্ম্য প্রচারিত, চৈতন্যের হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রচারের অনুসরণে কৃত্তিবাসে তা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। **সাজনি**—সজ্জা। **বেড়ে**—বেষ্টন করে।

মূল রামায়ণে রাবণের সঙ্গে বাসুকির যুদ্ধের উল্লেখমাত্র আছে। মূলে আছে—স তু ভোগবতীং গত্বা পুরীং বাসুকিপালিতাম্। কৃত্বা নাগান্ বশে হৃষ্টো যযৌ মণিময়ীং পুরীম্ ॥—উত্তরকাণ্ড, ২৩শ সর্গ, ৫ম শ্লোক। অর্থাৎ রাবণ বাসুকি-পালিত ভোগবতীপুরীতে প্রবেশ করে নাগগণকে বশীভূত করত হৃষ্টমনে মণিময় পুরীতে গমন করল। কৃত্তিবাস এই ঘটনার ইঙ্গিতটুকুমাত্র গ্রহণ করে রাবণ ও বাসুকির যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

রাবণের নিপাতক সহ যুদ্ধ ও মৈত্রী, রাবণের বরুণপুরী বিজয় ॥

ডর—ভয়। **দুর্ধর**—দুর্জয়। **দুই হস্তী······অবসাদ**—রাবণ ও প্রতিপক্ষ নিপাতকের শৌর্যবীর্য হস্তী, সূর্য ও সিংহের তুলনায় চমৎকার ব্যঞ্জিত। **সংহতি**—সঙ্গে।

মূল রামায়ণে যমের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধবৃত্তান্তের পর নিবাতকবচগণের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধপ্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। কৃত্তিবাস মূলের ক্রম রক্ষা করেননি। উত্তরকাণ্ডের ২৩শ সর্গের অনুসরণে রাবণের সঙ্গে নিপাতক ও বরুণের যুদ্ধ কৃত্তিবাস বর্ণনা করেছেন। মূলের মতই কৃত্তিবাসের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত বলা চলে। মূলের 'নিবাতকবচ' নামটি কৃত্তিবাসে 'নিপাতক' হয়েছে।

বলির সঙ্গে যুদ্ধে রাবণের লাঞ্ছনা ॥

আশে—অভিলাষে, বাসনায়। **আজানুলম্বিত**—হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত। **চতুষ্টয়**—চারি। **তাড়িতজড়িত**—বিদ্যুৎজড়ানো। **কৌস্তুভ**—নারায়ণের বক্ষোভূষণ মণি। **বীর মধ্যে······দিবস রজনী**——বলির দ্বাররক্ষাকারী স্বয়ং নারায়ণ। নারায়ণ সমস্ত জগতের কারণ—তিনি বীরাগ্রগণ্য, তিনি সমস্ত তপোধনের শ্রেষ্ঠ। তাঁতেই ত্রিভুবনের সৃষ্টি ও বিলয়, তিনি দিবারাত্রির স্রষ্টা। **তুণ্ডে**—মুখে। **খণ্ডে**—দূর হয়। **উচ্ছিষ্ট······লাজ**—কৃত্তিবাস রাবণের চরম লাঞ্ছনার চিত্র এখানে এঁকেছেন। বাল্মীকির রাবণ এখানে কিয়ৎপরিমাণে বিকৃত আঁকা হয়েছে, ধারণা। খুবসম্ভব শ্রোতাসাধারণের মনে হাস্যরসসৃষ্টির উদ্দেশ্যে কৃত্তিবাস এ ধরণের কৌতুককর পরিস্থিতি রচনা করেছেন। মূল রামায়ণে বন্দীত্ব দূরের কথা, এমনকি বলির সঙ্গে সংঘর্ষের কোন উল্লেখ নেই। মোটকথা, বলি-রাবণ বৃত্তান্ত নেই।

উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ত অংশে বলির সঙ্গে রাবণের সাক্ষাতের **কথা পাওয়া** যায়, কিন্তু কোন সংঘর্ষের বিবরণ নেই।

মান্ধাতার সহিত রাবণের যুদ্ধ ও মৈত্রী ॥

পৃথ্বীলীলা—জগতের লীলা। **অবতার**—নিক্ষেপ। **সম্বিত**—সংজ্ঞা। **সপ্তদ্বীপপতি**—পৃথিবীপতি। **ত্রিদশগণে**—দেবতাগণে। **সম্বর**—সংহরণ কর।

রাবণ ও মান্ধাতাবৃত্তান্ত মূল রামায়ণে নেই। উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ হিসাবে যে কটি সর্গ পাওয়া যায় তার একটিতে রাবণ ও মান্ধাতার রণবৃত্তান্ত আছে। এই প্রক্ষিপ্ত অংশের সঙ্গে কৃত্তিবাসের প্রদত্ত ঘটনার আনুপূর্বিক সাদৃশ্য আছে। কেবল কৃত্তিবাসের 'পূর্বমুনি' স্থলে প্রক্ষিপ্ত অংশে 'পর্বতমুনি' নাম মেলে এবং মূলে আছে, পুলস্ত্য ও গালবমুনির নির্দেশে মান্ধাতা ও রাবণের মৈত্রী ঘটে। কৃত্তিবাসে তৎস্থলে আছে, ব্রহ্মার নির্দেশে এবং ভার্গবমুনির দৌত্যে এই মৈত্রী ঘটে।

রাবণ কর্তৃক চন্দ্রলোক জয় ॥

মেরু—সুমেরু পর্বত। **রাবণ কটক······করি সমাপন**—কৃত্তিবাস এখানে রাবণের যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে সচবাচর ধারণানুযায়ী রাবণকে নরমাংসাহারী শোণিতপ্রিয় বর্বর রাক্ষসমাত্র বলে মনে হয় না। গঙ্গাস্নান, নিত্যনৈমিত্তিক পূজার্চনাদির অনুষ্ঠানকারী রাবণের শুচিশুভ্র মূর্তি অঙ্কন করে কৃত্তিবাস এই ধারণার ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। কৃত্তিবাস রাবণকে এখানে মানবিক ধর্মে মণ্ডিত করে তুলেছেন। **আড়েদীঘে**—দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে। **জাড়**—শৈত্যবোধ। **আড়**—অবশ। **সর্বলোকে বন্দে······জগতে আনন্দ**—দ্বিতীয়ার চাঁদদর্শন শুভসূচক। আকাশে উদিত দ্বিতীয়ার চন্দ্রোদ্দেশ্যে প্রণাম জানানোর প্রথা দেখা যায়। পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদের আলোকে সারা পৃথিবী আলকোদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতের পৃথিবীর সৌন্দর্য মনে অপার বিমুগ্ধতার সঞ্চার করে।

রাবণ কর্তৃক চন্দ্রলোক-জয় মূল রামায়ণে নেই। উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গে এই বৃত্তান্ত মেলে। প্রক্ষিপ্ত অংশে রাবণ ও চন্দ্রবৃত্তান্ত খুবই সংক্ষিপ্ত। কৃত্তিবাস রাবণ ও চন্দ্রের যুদ্ধবর্ণনাকে যথেষ্ট বিস্তারিত করেছেন।

রাবণের কুশদ্বীপে গমন ও মহাপুরুষের সহিত দ্বন্দ্ব ॥

জানকীবল্লভ—জানকীর বল্লভ অর্থাৎ স্বামী, রামচন্দ্র। **পুরুষপ্রবর**—পুরুষপ্রধান। **উথাড়িয়া পড়ে**—ঠিকরে পড়ে। **অষ্ট বসু**—আপ বা সাবিত্র,

ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, ধর, প্রত্যূষ, প্রভাব বা প্রভাস এই আটজন স্বর্গবাসী বসু। **বহিছে সাগর সপ্ত পুরুষ উদরে**—সেই মহাপুরুষের অভ্যন্তরে লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ, জল—এই সপ্ত পদার্থময় সাতসমুদ্র প্রবাহিত। **দশ দিকপাল**—পূর্বাদি দশদিকের রক্ষক; ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋর্ত, বরুণ, বায়ু, কুবের, শিব, ব্রহ্মা, অনন্ত—এই দশজন।

মূল রামায়ণে এ বৃত্তান্ত নেই। উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গে 'রাবণের পাতাল প্রবেশ' শীর্ষক যে বৃত্তান্ত আছে—তাই-ই কৃত্তিবাসে 'রাবণের কুশদ্বীপে গমন ও মহাপুরুষের সহিত দ্বন্দ্ব' শিরোনামায় বর্ণিত। মূলেরই অনুসরণে মহাপুরুষের সঙ্গে রাবণের দ্বন্দ্ব ও রাবণের পরাজয় বিবৃত হয়েছে। কৃত্তিবাস কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারে মূলের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন—যেমন, কৃত্তিবাসের রাবণের উক্তি—ব্রহ্মার প্রসাদে মোর কারে নাহি ডর। তুমি হে আমারে মার তবে সে মরণ। তোমা বিনা অন্য হাতে না মরে রাবণ' ।।—স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত সর্গের নিম্নোক্ত শ্লোকের হুবহু অনুবাদ—অমরোঽহং সুরশ্রেষ্ঠ তেন মাং নাবিশদ্ভয়ম্। তথাপি চ ভবেন্মৃত্যুস্ত্বত্তোনান্যতঃ প্রভো ॥

সূর্পণখার বৈধব্য, রাবণের স্বর্গ জয় করিতে গমন ॥

মিশালে—সঙ্গে। **রাঁড়ী**—বিধবা। **স্বতন্ত্রা**—স্বাধীনা। **করে এনু**—করে এলাম। **ন্যাস**—পূজা জপ প্রভৃতির প্রথমে বিঘ্ননাশহেতু বিবিধ কর্তব্য বিশেষ। **অধিষ্ঠান**—আবির্ভাব। **পরিতোষ**—সন্তুষ্ট। **অগোচর**—অদৃশ্য। **বীরদাপে**—বীরদর্পে। **মুড়েমুড়ে**—মুণ্ডে মুণ্ডে অর্থাৎ ঘেঁষাঘেঁষি করে। **কনকরচিত**—স্বর্ণনির্মিত।

উত্তরকাণ্ডের ২৪শ সর্গে সূর্পণখার বৈধব্যবৃত্তান্ত পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস মোটামুটি মূলেরই অনুসরণ করেছেন। মূলের বর্ণনাও এরূপ সংক্ষিপ্ত। 'রাবণের স্বর্গ জয় করিতে গমন' উত্তরকাণ্ডের ২৫শ সর্গের অনুসরণে রচিত। কৃত্তিবাস ঘটনার বিন্যাসে ঈষৎ পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। মূলে আছে, রাবণ প্রথমে নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থলে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারপর বিভীষণের কাছে কুম্ভনসীহরণ সংবাদ পান। কৃত্তিবাস এক্ষেত্রে প্রথমে মধুদৈত্যকর্তৃক কুম্ভনসীহরণবৃত্তান্ত রাবণের গোচরে এনেছেন এবং পরে নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থলে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ বর্ণনা করেছেন। কৃত্তিবাস বাল্মীকি অঙ্কিত কঠোর তপস্যাকারী ইন্দ্রজিতের আলেখ্য যথাযথ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এখানে। মূলেরই ভাবকল্পনায় ঋদ্ধ হয়ে কৃত্তিবাস বলেছেন—অনাহারে যজ্ঞশালে রাত্রিদিন থাকে। দ্বাদশ বৎসর স্ত্রীর মুখ নাহি

দেখে ॥ যজ্ঞ সমাপ্তির পরেই পিতার স্বর্গবিজয়ের অভিযানে অংশীদার হয়ে ইন্দ্রজিৎ যাত্রা করেন—সেখানেও তাঁর জিতেন্দ্রিয় তপঃসিদ্ধ রূপটি চমৎকার স্ফুটিত—নারীসম্ভাষণে পুত্র নাহি গেল লাজে। যজ্ঞস্থল হৈতে বীর যুঝিবারে সাজে ॥

মধুদৈত্যের সহিত রাবণের মিলন ॥

একেশ্বরী—একাকিনী। **ভাষে**—বলে। **ভাগে**—পালায়। **আলুলিত চুল**—এলোচুল। **গড়ের**—দুর্গের। **প্রধানকুটুম্ব……মম ভ্রাতা**—কৃত্তিবাস বাঙালীর সামাজিক জীবনে ভগ্নীর বর ও ভগ্নীর ভ্রাতার পারস্পরিক মধুর সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন। এখনও গ্রামবাংলায় 'ভগ্নীর ভ্রাতা' প্রধান কুটুম্ব হিসাবে সম্বোধিত হয়ে থাকে। **ভুঞ্জায়**—ভোগ করায়, খাওয়ায়।

মূল রামায়ণে কুম্ভনসী, মধুদৈত্য ও রাবণের বৃত্তান্ত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। উত্তরকাণ্ডের ২৫শ সর্গে এই বৃত্তান্তের পরিচয় আছে। মধুর নিদ্রা যাওয়া, রাবণের নিকট আশ্বাস পেয়ে কুম্ভনসীর মধুর সমীপে গমন, কুম্ভনসীর অনুরোধে মধুর রাবণের নিকট বশ্যতা স্বীকার, মধুর আচরণে রাবণের সন্তোষ, মধুব গৃহে রাবণের আতিথ্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ মূলে বর্ণিত থাকলেও কৃত্তিবাস তা বহুগুণে বিস্তারিত করেছেন। মূলে রাবণ-ভগিনীর নাম কুম্ভীনসী—কৃত্তিবাসে তা কুম্ভনসী।

রাবণ কর্তৃক অমরাবতী আক্রমণ ॥

উভেতে—উচ্চতায়। **ওর**—অপর পার, অবধি বা সীমা, বিদ্যাপতিতে 'হামারি দুখের নাহি ওর'। **খিল**—অর্গল। **হুড়কা**—ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করার খিল। **চৌতারা**—চত্বর, মহল। **খেদাড়িয়া দেহ**—তাড়িয়ে দাও, বিতাড়িত কর।

উত্তরকাণ্ডের ২৭শ সর্গের বিষয়ানুসরণে এই অংশ বর্ণিত। মূলে স্বর্গপুরীর কোন বর্ণনা নেই। চিরানন্দময় স্বর্গের রূপচিত্র কৃত্তিবাসের স্বাধীন অঙ্কনশক্তির পরিচয়। দেবতাদের বিষ্ণুসমীপে গমন ও দেবতাদিগকে বিষ্ণুর আশ্বাস মূলানুগ।

রাবণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ও পরাজয় ॥

রণে আইলেন……দেবে লাগে ডর—গলায় মুণ্ডমালা, হাতে খর্পর আদ্যাশক্তির চামুণ্ডামূর্তি অতি ভয়ঙ্কর। এই ভয়ঙ্কর মূর্তিদর্শনে সাধারণ নরবানর, যক্ষরক্ষ তো দূরের, দেবতারা পর্যন্ত ভীত হন। **লেখাজোখা**—হিসাব। **দুই সৈন্য……গঙ্গা**—হতাহত সৈন্যের রক্তধারার সঙ্গে ভাদ্রমাসের বর্ষাপ্লাবিত গঙ্গার

সঙ্গে তুলনা যুদ্ধের ভয়াবহতা ও তীব্রতাকে ব্যঞ্জিত করে। **বিম্বক**—বুদ্বুদ। **পারণা**—উপবাসের পর প্রথম আহার গ্রহণ। **যুদ্ধছল**—যুদ্ধের ভাণ।

জীবি—বাঁচিবি। **পরলোকে……রক্ষা**—মৃত্যু হলে ত্রিভুবনের জীবমাত্রকেই যমপুরীতে যেতে হয়। দেবরাজপুত্র জয়ন্তের রাবণের হাতে মৃত্যু হলে নির্ঘাৎ যমপুরীতে তাকে যেতে হত এবং যমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হত। কিন্তু যেহেতু যমপুরীতে যমরাজ জয়ন্তকে দেখেননি, সেহেতু জয়ন্ত জীবিত—যমরাজ দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করেন। **নিবসতি**-নির্বসতি, বাসশূন্য। **বাড়া**—অধিক। **গুঁড়া**—চূর্ণ। **বিভোল**—বিহ্বল, বিবশ। **ছড়**—দাগ, আঁচড়। **লুকি**—লুক্কায়িত। **ধানুকী**—ধনুর্ধর। **দেয়ান**—সভা, দরবার। **আচম্বিতে**—অকস্মাৎ, হঠাৎ। **সন্ধি**—সন্ধান, গোপন রহস্য। **তোর বাণে……তোর নাম হৈল ইন্দ্রজিৎ**—কৃত্তিবাস মেঘনাদ চরিত্রাঙ্কনে যথেষ্ট দরদ ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন। চরিত্রবান, গুণবান, তপোবলে ও বাহুবলে দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিৎ তাঁর কর্মকৃতিতে আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তথাকথিত বর্বর রাক্ষসচরিত্র হিসাবে কখনও প্রতিভাত হয় না। বীরত্বে, তেজস্বিতায়, যুদ্ধবিক্রমে ও ন্যায়নীতির মাহাত্ম্যে ত্রিভুবনবিজয়ী বীরের গৌরব তাঁর যথার্থই প্রাপ্য। নিজ ভুজবলে ইন্দ্রকে পরাজিত ও বন্দী করার কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবেই একক। দেবদৈত্যজয়ী এই অমিতশক্তিধরের শৌর্যে মুগ্ধ হয়ে পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং লঙ্কায় আগমন করে তাঁকে বরদানে কৃতার্থ ও তৃপ্ত হয়েছেন। অবশ্য কৃত্তিবাস-অঙ্কিত জিতেন্দ্রিয়, মহাবলী ইন্দ্রজিৎ চরিত্র আদিকবিরই প্রতিচ্ছায়ামাত্র। ব্রহ্মা যে কারণে মেঘনাদের ইন্দ্রজিৎ নামকরণ করেন—তা মূলেরই ধ্বনি। মূলে আছে—অয়ঞ্চ পুত্রোঽতিবলস্তব রাবণ বীর্য্যবান্। জগতীন্দ্রজিদিত্যেব পরিখ্যাতো ভবিষ্যতি। এখানে ব্রহ্মা রাবণকে সম্বোধন করে কথাগুলি বলেছেন। কৃত্তিবাসে দেখা যায়, ব্রহ্মা সরাসরি ইন্দ্রজিতকে বলেছেন। **সন্বিধান**—ব্যবস্থা, আদেশ। **সহস্রলোচন**—হাজার চোখ যাঁর, ইন্দ্র।

উত্তরকাণ্ডের ২৭শ-৩০শ সর্গের অনুসরণে 'রাবণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ও পরাজয়' বর্ণিত হয়েছে বটে কিন্তু কৃত্তিবাস মূলের যথেচ্ছ পরিবর্তন করেছেন। বিষয়ের মিলটুকু ভিন্ন বাদবাকী কৃত্তিবাসের স্বাধীন রচনাশক্তির প্রকাশে উজ্জ্বল। ইন্দ্র কর্তৃক রাবণবন্ধন মূলে একটি শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। কৃত্তিবাস সেক্ষেত্রে ইন্দ্রকর্তৃক রাবণকে বন্ধন ও লাঞ্ছনা, ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক পিতার বন্দীদশা থেকে উদ্ধার ইত্যাদি সংযোজন করেছেন। মূলে আছে, ব্রহ্মার কাছে

অমরত্ব চেয়ে সফলমনোরথ না হলে ইন্দ্রজিৎ বললেন তবে এই বর দিন - যখন আমি যথাবিধি পূজা করে যুদ্ধে যাব তখন আমার জন্য অগ্নি থেকে অশ্বসমেত রথ উঠে আসবে, সেই রথে থাকলে আমি অবধ্য হব। যদি অগ্নিপূজার জপ হোম শেষ না করেই যুদ্ধে যাই, তবে আমি বধ্য হব। কৃত্তিবাসে আছে, মেঘনাদ অমরত্ব প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা তা দিতে অসম্মত হন এবং নিজ থেকেই বলেন— ত্রিভুবন জিনিলে যে যজ্ঞের ফলেতে। এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোর করিবে যে জন। সেই জন হবে তোর বধের ভাজন ॥ ইন্দ্রের যুদ্ধে পরাজয় ও বন্দীত্ব দশার কারণ মূল রামায়ণে যেরূপ নির্দেশিত, কৃত্তিবাস তা-ই যথারীতি গ্রহণ করেছেন। কৃত্তিবাস ইন্দ্রের পাপ দূরীকরণের উপায় হিসেবে রামনাম জপের যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা বলা কঠিন। কোন কোন সমালোচক এসব অংশ পরবর্তীকালের যোজনা বলে অভিমত পোষণ করেন।

হনুমানের বিবরণ ॥

ভানুমান—সূর্য। **কেটা**—কোনজন। **হিঙ্গুলে**—রসসিন্দুর। **পবন ছাড়িল……অচেতন**—বায়ুর অপর নাম জীবন। বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হওয়ায় সমস্ত জগৎ সংজ্ঞাহীন, মূর্চ্ছাতুর হয়ে পড়ল। **জীবী**—জীবকুল। **মারুতি**—মরুৎ অর্থাৎ বায়ুর পুত্র, হনুমান। **পাসর**—ভুলে যেও।

'হনুমানের বিবরণ' উত্তরকাণ্ডের ৩৫শ ও ৩৬শ সর্গের অনুসরণে রচিত। মূলে আছে, অগস্ত্যমুনির মুখে বালীবৃত্তান্ত শুনে রামচন্দ্র মহাবলশালী হনুমান সম্পর্কে জানার জন্য কৌতূহলী হন। রামের কৌতূহল দূর করার জন্য অগস্ত্য 'হনুমানবৃত্তান্ত' বলা শুরু করেন। কিন্তু কৃত্তিবাসে মূলের ক্রম রক্ষিত হয়নি। হনুমানবৃত্তান্ত একটানা বলে যাবার পর খাপছাড়াভাবে রাবণবৃত্তান্ত বলা হয়েছে। মূলের হনুমানবৃত্তান্ত বেশ বিস্তৃত। কৃত্তিবাসে সে তুলনায় ঈষৎ সংক্ষিপ্ত। হনুমানের পরাক্রম সম্পর্কে মূলে রামচন্দ্র যে সুদীর্ঘ প্রশস্তি উচ্চারণ করেছেন, কৃত্তিবাসে তা নেই। হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত সুন্দরাকাণ্ডেও আছে। জাম্বুবান হনুমানের জন্মরহস্য প্রকাশ করেছেন সেখানে। অগস্ত্যমুনি জাম্বুবানেরই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন বলা চলে। মূলে আছে, হনুমানবৃত্তান্ত বলার পর অগস্ত্যমুনি আদি রামচন্দ্রের বিদায় গ্রহণ করে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেন। কৃত্তিবাসও হনুমানবৃত্তান্ত শেষে অগস্ত্যমুনির বিদায় ঘটিয়েছেন—দুই বর্ষ ধরি পূর্ব বৃত্তান্ত কহিয়া। স্বদেশে গেলেন মুনি বিদায় লইয়া ॥ মূল রামায়ণে

উত্তরকাণ্ডে রাবণের বৃত্তান্ত ও রামচন্দ্র-সীতা কাহিনী প্রায় সমান স্থান অধিকার করেছে। কৃত্তিবাসও তাঁর উত্তরকাণ্ডে রাবণবৃত্তান্ত এবং রামচন্দ্র-সীতা কাহিনীকে সমান স্থান দিয়েছেন। মোটামুটিভাবে মূলের উত্তরকাণ্ডের বিষয়বস্তুকে কৃত্তিবাস প্রায় বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন দেখা যায়। চরিত্রচিত্রণ ও বর্ণনাতে **অবশ্য** কিছুটা স্বাধীনতা লক্ষণীয়।

রামসীতার জন্য বিশ্বকর্মার প্রমোদভবন নির্মাণ ও তাহাতে রামসীতার বাস ॥

রাজ্যের ঈশ্বর—রাজ্যের প্রভু, রাজ্যের শাসক। **পীড়ি**—বেদিকা, বসার আসন। **চন্দ্রোদয় হয়……আকাশ উপরে**—আকাশে চন্দ্রোদয়ে যেমন সারা আকাশ আলোয় ঝলমল করে, তেমনই মনোহর উদ্যানের অপরূপ শোভায় পুরীও ঝলমল করে। বিশ্বকর্মা নির্মিত উদ্যানের রূপৈশ্বর্য কৃত্তিবাস সুন্দর ফুটিয়েছেন। **নিদাঘকালেতে চৈত্র……ঋতুরাজ দেখি**—অশোকবনে ঋতুচক্রের আবর্তনে প্রকৃতির যে বিচিত্র রূপমাধুরী কৃত্তিবাস বর্ণনা করেছেন, তা বাংলাদেশেরই প্রকৃতির চিত্র। গ্রীষ্মের দারুণ দাবদাহ, বর্ষার প্রমত্ত বারিধারা, শরতের নির্মল আকাশ, শীতের নারিকেল ইত্যাদি ফলসম্ভার বাংলাদেশের প্রকৃতিচিত্র স্মরণ করায়। ঋতুতে ঋতুতে বিরহবেদনায় মানুষের মনের রঙ যে বদলায় তার পরিচয় মূল রামায়ণে সীতাবিরহবেদনায় প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের, মানবচরিত্রের ও মানবহৃদয়ের যে সুগভীর যোগ বর্তমান, আদিকবির রচনায় তা পরিস্ফুট। রামসীতার বনবিহারে প্রকৃতির পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের রঙ বদলানোর একটি ক্ষীণ ছবি কৃত্তিবাস তুলে ধরেছেন।

মূল রামায়ণে অগস্ত্য-আদি মুনিগণকর্তৃক রাবণবৃত্তান্তবর্ণনা ও মুনিগণের বিদায় গ্রহণের পর পাঁচটি সর্গে (৩৭শ ৪১শ সর্গ) রামচন্দ্রের রাজ্যশাসনাদিবৃত্তান্ত বর্ণিত। কৃত্তিবাস এ অংশ সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। ৪২শ সর্গের অনুসরণে অশোকবনে রামসীতার বিহার বর্ণনা করেছেন। মূলের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, কৃত্তিবাসে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত।

ভদ্র নামক মন্ত্রীর নিকট শ্রীরামের সীতা সম্বন্ধে জনাপবাদ শ্রবণ ॥

বৃহন্দ—মহল। **দেয়ানে**—দরবারে। **পাত্র সে……কয়**—মূল রামায়ণে ভদ্র চরিত্র এধরণের অঙ্কিত নয়। রামচন্দ্রের স্নেহবাক্য ও আশ্বাস পেয়ে ভদ্র সীতাপবাদবৃত্তান্ত গোচর করেন। **কালি**—কলঙ্ক।

মূল রামায়ণের ৪৩শ সর্গের অনুসরণে কৃত্তিবাস এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মূলেও রামচন্দ্র-ভদ্র সংলাপ খুবই সংক্ষিপ্ত।

সীতার বনবাস ॥

মেলানি—বিদায়। **পানি**—অশ্রু। **নির্বন্ধ**—নির্ধারণ। **সীতারে চাহিয়া বলে……রাম লিখিত রাবণ**—সীতাবর্জনের ঘটনায় কৃত্তিবাস রাবণের চিত্রাঙ্কনের যে অজুহাত দেখিয়েছেন, তা বোধ করি, কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত। মূলরামায়ণে বা অন্যত্র এর উৎস মেলে না। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও তাঁর 'সীতা' নাটকে অনুরূপ ইঙ্গিত কৃত্তিবাসের প্রেরণাতেই দিয়েছেন, ধারণা। **নেতের অঞ্চল**—পট্টবস্ত্রের অঞ্চল। **আইস দেবর আজি……বিরস বদন**—বাঙালীর পারিবারিক জীবনের একটি মনোরম ছবি এখানে ফুটে উঠেছে। সীতাকে নির্বাসনবার্তা জানাবার জন্য লক্ষ্মণ উপস্থিত হলে সীতা সরলমনে দেবরের সঙ্গে ভ্রাতৃজায়াসুলভ পরিহাস করেছেন। এ একেবারে বিশুদ্ধ বাংলাদেশের গ্রামবাংলার দেবর-বৌদির জীবন্ত ছবি। **স্বরূপ**—যথার্থ, খাঁটি।

দুর্বল হইল লোক……ফল—সীতার বনবাসের সংবাদে প্রকৃতির বিষণ্ণতার যে চিত্র কৃত্তিবাস এঁকেছেন, তা মূল রামায়ণে সহানুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্রের অনুসরণে রচিত। রামায়ণে সীতাপহরণকালে প্রকৃতির মৌন বেদনার একটি অপরূপ আলেখ্য বাল্মীকি রচনা করেছেন (অরণ্যকাণ্ড)। প্রকৃতিকে জড়বস্তু রূপে না দেখে তাকে প্রাণময় করে দেখার মধ্যেই এই সহানুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্র রচনার মৌল প্রেরণা নিহিত। ভারতীয় সাহিত্যে রামায়ণেই বোধ হয়, প্রকৃতিতে মানবসুলভ অনুভূতি আরোপের প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

কাহিনী অংশে কৃত্তিবাস বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসারী হলেও লক্ষণীয় যে, বহুক্ষেত্রেই কাহিনী পরিবর্তিত, সম্প্রসারিত করেছেন। কোথাও অংশবিশেষ পরিত্যাগ করে নতুন কাহিনী সংযুক্ত করেছেন। 'সীতার বনবাস' অধ্যায়ে এর সবিশেষ দৃষ্টান্ত মেলে। উত্তরকাণ্ডের ৪৬শ-৪৯শ সর্গের ক্ষীণ অনুসরণ ভিন্ন প্রচুর স্বাধীনতা এখানে নিয়েছেন। মূলে আছে, ভদ্রমুখে সীতাপবাদ শুনে রামচন্দ্র ব্যথিত হৃদয়ে ভ্রাতৃবর্গকে ডেকে সীতাত্যাগের সঙ্কল্প জানান এবং বিনাপ্রতিবাদে তাঁদের তা মেনে নিতে আদেশ করেন। রামচন্দ্রের সঙ্কল্পে অটল যে চরিত্র আদিকবি এখানে এঁকেছেন তা অপূর্ব। কৃত্তিবাসে দেখা যায়, শুধু ভদ্রমুখে সীতাপবাদ শুনেই ত্যাগের কোন সিদ্ধান্ত রামচন্দ্র গ্রহণ করেননি। সরোবরে স্নানের

ঘাটে রজকজামাই ও শ্বশুরের কথোপকথন এবং স্বহস্তে অঙ্কিত রাবণের চিত্রোপরি সীতার শয়ান মূর্তি দেখে সীতাত্যাগের বিষয়ে রামচন্দ্র দৃঢ়চিত্ত হন। কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র মূলের তুলনায় দুর্বল চরিত্র-রূপে প্রতিভাত হয়। এখানে যে রজকবৃত্তান্ত রয়েছে, তা মূল রামায়ণে নেই। খুবসম্ভব পদ্মপুরাণ (পাতালখণ্ড, ৩য় অধ্যায়) এর উৎস। এই পুরাণে আছে যে, রজকের মুখে সীতাপবাদ শুনে রামচন্দ্র সীতা-বিসর্জন দেন। মূল রামায়ণে রামচন্দ্রের আদেশ ভ্রাতৃবর্গ নির্বিরোধে মেনে নিয়েছেন, দেখা যায়। কৃত্তিবাসে লক্ষণীয়, ভ্রাতারা বিশেষ করে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আদেশ নির্বিচারে মেনে নেননি। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তুলে রামের সঙ্গে ঈষৎ যুক্তি তর্ক করেছেন। খুবসম্ভব এক্ষেত্রেও পদ্মপুরাণ (পাতালখণ্ড, ৩১শ অধ্যায়) এর উৎস। কৃত্তিবাসের লক্ষ্মণ এ ক্ষেত্রে অনেকটা রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। বাল্মীকির লক্ষ্মণ সে তুলনায় একেবারে আদর্শায়িত চরিত্র। মূলে সীতাসহ লক্ষ্মণের গঙ্গাপার, সীতাকে বিসর্জনসংবাদ জ্ঞাপন, সীতার তা শ্রবণে মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছাভঙ্গে রামচন্দ্রের জন্য সংবাদদান ইত্যাদি ঘটনা অনেকটা বিস্তারে বর্ণিত, কৃত্তিবাসে বহুলাংশে সংক্ষিপ্ত। এই অংশে সীতা চরিত্রের এক অপরূপ জ্যোতির্ময় আলেখ্য মূলে ফুটে উঠেছে। দুঃখবেদনার পরম মুহূর্তেও সীতার চরিত্রে নীচতা বা অপরকে দোষদেবার কোন প্রচেষ্টা নেই। পক্ষান্তরে তিনি রামের জন্য ব্যাকুল। রামের জন্য তদ্গত প্রাণ। তাঁকে পরিত্যাগ করার জন্য রামচন্দ্রের যাতে কোন নিন্দাবাদ না হয়, সেদিকে সদাসর্তক। পরিত্যক্ত হয়েও প্রাণ দিয়ে পতির প্রিয় কার্য সাধনের জন্য দৃঢ়চিত্তা (প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ ভর্তুঃ কার্য্যংবিশেষতঃ)। এই অংশে কৃত্তিবাসে সীতাচরিত্র ঈষৎ কোপস্ফুরিতা, রামচন্দ্রের আদেশ প্রসন্নচিত্তে গ্রহণে অপারগা। মূলের পতিগতপ্রাণা সীতাচরিত্রের অবিস্মরণীয় মহিমা অবশ্য কৃত্তিবাস ক্ষুণ্ণ করেননি।

শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্ণসীতা নির্মাণ ॥

নড়ে—প্রস্থান করে। **বহুয়ারী**—বৌ, বধূ। **মেদিনীনন্দিনী**—পৃথিবীর কন্যা। সীতা ভূতল থেকে সমুত্থিত হন, তাই তাঁকে 'মেদিনীনন্দিনী' বলা হয়েছে।

রঘুবংশে……অনরণ্যে—রঘুবংশীয় অনরণ্য নামক রাজার রাজত্বকাল থেকেই সুরথি সারথ্য কর্মে নিযুক্ত। **যেমন সীতার……করে**—বিশ্বকর্মা নির্মিত সীতার স্বর্ণপ্রতিমা একেবারে নিখুঁত, অনবদ্য গড়ন। যথার্থই সীতা বলে ধারণা হয়, কিন্তু একটিই তার ত্রুটি—এই মূর্ত্তি, নিস্পন্দ, নির্বাক।

উত্তরকাণ্ডের ৪৯শ-৫২শ সর্গের ক্ষীণ অনুসরণ এই অংশে দেখা যাবে। বাল্মীকি কর্তৃক সীতাকে আশ্রয়দান, সুমন্ত কর্তৃক সীতাবিসর্জনের গূঢ়রহস্য উন্মোচন মূলানুযায়ী বলা চলে। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের সুবর্ণসীতা নির্মাণের যে ব্যাখ্যা কৃত্তিবাস দিয়েছেন, মূলে তা নেই। মূলে আছে, অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও পত্নীসহ যজ্ঞকর্ম পালন বিধি থাকায় ও রামচন্দ্র দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ না করায় সীতার সুবর্ণ প্রতিকৃতি নির্মাণ করেন। সীতাপরিত্যাগ করে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হলে বাল্মীকি রামচন্দ্রের হৃদয়-ব্যথাকে প্রকাশ করেছেন বটে, তবে তাতে সুতীব্র আর্তি-হাহাকার প্রকাশ পায়নি। কিন্তু রোদনপ্রবণ বাঙালী জাতির স্বভাবকে কবি কৃত্তিবাস তাঁর রামচন্দ্রে সঞ্চারিত করেছেন, দেখা যায়। সীতাবিরহে রামচন্দ্রকে বারংবার চোখের জল ফেলতে দেখা যায়। লক্ষ্মণ সীতাকে পরিত্যাগ করে রামচন্দ্রের সামনে উপস্থিত হলে কৃত্তিবাসের বর্ণনা—লক্ষ্মণ বলেন

তুমি করিলে বর্জন। আপনি বর্জিয়া কেন করহ রোদন ॥

কালিঞ্জর রাজার বিবরণ ॥

পালে—যূথে। **তত্ত্ব**—সন্ধান। **হুড়াহুড়ি**—ঠেলাঠেলি। **কাঁকলাস**—গিরগিটি। **ভূপে**—রাজাকে। **কমণ্ডলু**—জলপাত্র। **পরনিন্দা......বিষম নরক**—সন্ন্যাসী সমস্ত জাগতিক বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হন। তাঁর অন্তরে কোন ঈর্ষা, ক্রোধ, বিদ্বেষ স্থান পেতে পারে না। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি সন্ন্যাসীর অন্তরে ক্রোধ ইত্যাদি রিপুর সঞ্চার ঘটে, তবে তাঁর তপোভ্রষ্টতা অবিসংবাদিত। **মাতঙ্গ পৃষ্ঠে**—হস্তিপৃষ্ঠে। **কৌপীন**—পরিধানের ক্ষুদ্র বস্ত্রবিশেষ।

মূল রামায়ণে উত্তরকাণ্ডের ৪৫শ সর্গে রাজা নৃগের যে বৃত্তান্ত আছে, তারই অনুসরণে কৃত্তিবাস রাজা মৃগেশ্বরের কাহিনী এবং প্রক্ষিপ্ত সর্গে যে কুকুর ও কালিঞ্জরের ব্রাহ্মণ মঠাধিপতি বৃত্তান্ত রয়েছে তারই অনুসরণে 'কালিঞ্জর রাজার বিবরণ' কাহিনী বর্ণনা করেছেন। রাজা মৃগেশ্বরের কাহিনী আনুপূর্বিক রাজা নৃগের কাহিনীরই ভাষান্তর বলা চলে। কেবল 'নৃগ' স্থলে 'মৃগ' এই নামকরণ করা হয়েছে। 'কালিঞ্জর রাজার বিবরণে' কাহিনীর ঈষৎ পরিবর্তন লক্ষণীয়। কৃত্তিবাস কুকুরের বৃত্তান্তটি মোটামুটি মূলেরই মত রেখেছেন। কিন্তু 'কালিঞ্জর রাজার বিবরণ' মূলে কালঞ্জরের এক মঠের কুলপতির বিবরণ। 'মঠাধিপতি' কৃত্তিবাসে 'রাজা' রূপে পরিবর্তিত। মূলের ঘটনা নিম্নরূপ—

কুকুর রামচন্দ্রের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়ে জানাল, সর্বার্থসিদ্ধ নামে এক ভিক্ষু

ব্রাহ্মণ তাকে প্রহার করেছে। রামচন্দ্র কুকুরকে অযথা প্রহার করার জন্য সেই ভিক্ষুকে দণ্ডদানে উদ্যোগী হলে কুকুর বলল, ভিক্ষু ব্রাহ্মণকে কালঞ্জরের কুলপতির পদ দিন। রামচন্দ্র কুকুরের ইচ্ছা পূর্ণ করলে সভাসদদের কৌতূহলে কুকুর বলল—আমি পূর্বে কালঞ্জরের কুলপতি ছিলাম। সযত্নে দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবা ইত্যাদি করা সত্ত্বেও কৌলপত্যের ফলে এই ঘোর নীচ দশা পেয়েছি। এই ভিক্ষুও একদিন কৌলপত্যের এই নীচ দশা পাবে—তাই কুলপতি করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি।

শত্রুঘ্ন কর্তৃক লবণ দৈত্য বধ ॥

সম্ভাসনে—সকলের সঙ্গে। **পতন**—নিহত। **যুঝার**—যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ। **এড়িলেক**—নিক্ষেপ করল। **লব মেখে……কুশ রাখে**—সীতার যমজ পুত্র হবার কথা শুনে বাল্মীকি নবজাতকদ্বয়কে 'লব' অর্থাৎ গরুর পুচ্ছের লোম ও 'কুশ' অর্থাৎ কুশঘাস দিয়ে মার্জনা করতে বলেন। 'লব' ও 'কুশ' দ্বারা মার্জিত হওয়ায় যথাক্রমে নবজাতকদ্বয়ের নাম রাখা হয় লব ও কুশ। মূলে আছে, বাল্মীকি কুশগুচ্ছ দিয়ে ভূতরক্ষোবিনাশিনী 'রাখি' রচনা করে বৃদ্ধাদের বললেন—যে অগ্রজ তার গাত্র এই মন্ত্রপূত কুশগুচ্ছের অগ্রভাগ দিয়ে মার্জনা কর, তার নাম 'কুশ' হবে। যে পরে জাত তার গাত্র লব বা কুশগুচ্ছের অধোভাগ দিয়ে মার্জনা কর, তার নাম 'লব' হবে। **জাঠা**—যষ্টি, লাঠিগাছা। **বাহুড়িয়া**—ফিরে এসে। **সান্ধায় মেদিনী**—পৃথিবীর ভেতরে প্রবেশ করে। **নাচনি**—নৃত্য। **পত্তন**—প্রতিষ্ঠা। **অতিথি আসরে**—অতিথিকে যেরূপ যত্ন করা হয়, সেরূপ সমাদরে।

সুগন্ধি কোমল অন্ন……সকল কটক—ভোজনবিলাসী বাঙ্গালী স্বভাবের পরিচয় কবি কৃত্তিবাসের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। কবি কৃত্তিবাস দেবদানব রাক্ষস, বানর যাদের কথাই বলুন না কেন, ভোজনের কথাটা কোথাও ভুলেননি। যে সব ভোজ্যদ্রব্যের উল্লেখ করেছেন তা বস্তুতঃ বাংলাদেশের রসনালোভন খাদ্যসামগ্রী।

বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের ৬০শ-৭২শ সর্গ মোট তেরটি সর্গের বিষয়ানুসরণে 'শত্রুঘ্নকর্তৃক লবণদৈত্য বধ' অধ্যায়টি রচিত। মূল বর্ণনার অল্পস্বল্প ব্যতিক্রম ভিন্ন কৃত্তিবাস যথাযথ অনুসরণ করেছেন। মূল রামায়ণে বাল্মীকি কর্তৃক সুদাসপুত্র কল্মাষপাদের যে বৃত্তান্ত কথিত হয়েছে (৬৫শ সর্গ) কৃত্তিবাস তা বর্জন করেছেন। মান্ধাতাবৃত্তান্ত কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের সভাতে ভার্গবমুনির মুখে শুনিয়েছেন। মূলে কিন্তু শত্রুঘ্ন পথিমধ্যে চ্যবনমুনির নিকট এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত

হন। মূলে আছে, বাল্মীকির আশ্রমে বিশ্রামকালে শত্রুঘ্ন সীতার যমজপুত্র হবার সংবাদ জানতে পারেন। কিন্তু কৃত্তিবাসে বলা হয়েছে—শত্রুঘ্নের নিকট সীতার পুত্র হবার সংবাদ গোপন রাখা হয়।

শ্রীরামকর্তৃক শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদে অকালমৃত বিপ্রপুত্রের জীবনলাভ ॥

পুষি—পালন ক'রে। **মড়ক**—মহামারী। **অশ্রুনীরে**—চোখের জলে। **রাজদ্বার**—রাজসভা। **অকালে অনধিকারে······মরে**—শাস্ত্রবিধান-অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের শাস্ত্রানুশীলন, তপঃসাধন ইত্যাদি নির্দিষ্ট করা রয়েছে। এতে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে শূদ্র জাতির তপঃসাধন অনাচরণীয়। ত্রেতায় রামচন্দ্রের রাজত্বকালে শূদ্র তপঃসাধন করার জন্যই ব্রাহ্মণ-সন্তানের অকালমৃত্যু ঘটেছে। শূদ্রের অধিকার বিধি লঙ্ঘন করার জন্যই রামচন্দ্রের রাজত্বে এই কলঙ্ক। **তুণ্ড**—ঠোঁট।

মূল রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে লবণদৈত্যবধ-বৃত্তান্তের পরে শূদ্র শম্বুক-বৃত্তান্ত মেলে। কৃত্তিবাসও 'লবণদৈত্যবধ' ঘটনার পরে শূদ্র শম্বুক ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করেছেন। উত্তরকাণ্ডে ৭৩শ-৭৮শ সর্গে শূদ্র শম্বুকবৃত্তান্ত আছে। কৃত্তিবাস দু-একটি ক্ষেত্রে স্বল্প পরিবর্তন ছাড়া মোটামুটি মূলের অনুসরণ করেছেন। যেমন, ব্রাহ্মণের পুত্রের অকাল মৃত্যুকালে যে বয়স মূলে বলা হয়েছে, কৃত্তিবাসে তা বর্ক্ষিত হযনি। মূলে ব্রাহ্মণের পুত্রের মৃত্যুকালে বয়স ১৩ বৎসর ১০মাস ২০ দিন ছিল বলে ধারণা। মূলে আছে, 'পঞ্চবর্ষসহস্রকম্'—'বর্ষ' শব্দের অর্থ 'দিন' ধরাই বাঞ্ছনীয় তা নাহলে 'অপ্রাপ্তযৌবনম্' কথার সঙ্গে সঙ্গতি থাকে না। মূলের শ্লোকটি এই—অপ্রাপ্তযৌবনম্ বালং পঞ্চবর্ষসহস্রকম্। অকালে কালমাপন্নং মম দুঃখায় পুত্রক ॥—৭৩।৫ কৃত্তিবাসে ব্রাহ্মণের সন্তানের মৃত্যুকালীন বয়স পাঁচ বৎসর ছিল বলা হয়েছে। কৃত্তিবাসের বর্ণনা এবংরূপ—বৃথা গর্ভে ধরি পুত্র পঞ্চবর্ষ পুষি। অকালে মরিল পুত্র রামরাজ্যে বসি ॥ মূলে আছে, রামচন্দ্রের হাতে মৃত্যু হলেও শম্বুকের স্বর্গলাভ ঘটল না—'স্বর্গভাঙ্ নহি শূদ্রোঽয়ং ত্বৎকৃতে রঘুনন্দন'। কৃত্তিবাস কিন্তু বিপরীত বলেছেন। সর্বজীবের মুক্তিদাতা ভক্ত-বৎসল রামচরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে কবি কৃত্তিবাস শম্বুকের স্বর্গ-প্রাপ্তির কথা বলেছেন—হইল রামের হাতে তপস্বী বিনাশ। স্বর্ণ বিমানেতে চড়ি গেল স্বর্গবাস ॥ শূদ্র শম্বুককে হত্যা বর্তমানকালের রীতিনীতির বিচারে হয়তো নিন্দনীয়

তবে অতীতকালের অতি প্রাচীন সমাজের এসব ঘটনার বা কবিকল্পনার নিরপেক্ষ বিচার করতে পারি এমন দেশকালজ্ঞ আমরা নই।

গৃধিনী ও পেচকের কলহ ॥

কোন্দল—কলহ। **একত্তর**—একত্রে, একসঙ্গে। **চড়া**—চড়ুই। **মৎস্যরঙ্ক**—মাছরাঙা। **কঙ্ক**—কাঁকপাখী। **সারস সারসী……কাষ্ঠঠোকরিয়া**—এই অংশে যে পক্ষীবিবরণ আছে, তা বিশেষভাবে বাংলা দেশেরই চিত্র। কৃত্তিবাসী রামায়ণের বহু ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক দৃশ্য ও দৈনন্দিন জীবনের বিশেষ পরিচয় আছে। **প্রলয় হইল যবে সৃষ্টির সংহারে ····নানা জাতি**—কৃত্তিবাস সৃষ্টিতত্ত্বের যে বর্ণনা দিয়েছেন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল-কাব্যাদিতে তা পরিদৃষ্ট হয়। সৃষ্টির আদিতে সব জলময় ছিল—এ পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদেও লক্ষিত হয়। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে নাসদীয় সূক্তে বলা হয়েছে—সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না—না সৎ, না অসৎ; দিন ও ছিল না, রাত্রিও ছিল না। সমস্তই চিহ্নবর্জিত, তমোভূত, জলমগ্ন ছিল। এই 'অসৎ' অর্থাৎ কিছু না থাকা থেকে হিরণ্যগর্ভ জন্মালেন। তাঁর থেকেই সৃষ্টির বিকাশ। **পক্ষিযোনি**—পাখী। **বিমানেতে**—আকাশগামী যানেতে।

'গৃধিনী ও পেচকের কলহ' মূল রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে যে কটি প্রক্ষিপ্ত সর্গ মেলে, তার একটিতে বর্ণিত রয়েছে। মোটামুটিভাবে এই উপাখ্যানটিকে মূলের 'গৃধ্র ও উলুক (পেচক) সংবাদ'—এর অনুসারী বলা যেতে পারে। মূল রামায়ণে সৃষ্টিতত্ত্বের নিম্নরূপ বিবরণ আছে—"রাম বললেন, পুরাণে আছে পূর্বে সমস্ত জগৎ জলময় ছিল, ভূতাত্মা বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত ব্রহ্মাণ্ডকে জঠরে ধারণ করে সমুদ্রে সুপ্ত ছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর নাভি থেকে উদ্ভূত হয়ে পৃথিবী বায়ু পর্বত, বৃক্ষ এবং সমস্ত জীব সৃষ্টি করলেন। তারপর বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই দানব উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মাকে আক্রমণ করলে ব্রহ্মা বিকট শব্দ করলেন। বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে দুই দানবকে বধ করলেন। তাদের মেদে পৃথিবী প্লাবিত হল। তারপর বিষ্ণু মেদিনীকে শোধিত করে বৃক্ষে পূর্ণ করে দিলেন।" কৃত্তিবাস সৃষ্টিতত্ত্বের যে বিবরণ দিয়েছেন, কিয়দংশে মূলানুগ মাত্র। মূলে আছে, গৃধ্র ও উলুক রামচন্দ্রের রাজসভায় গিয়ে বিচার প্রার্থনা করে। কৃত্তিবাসে আছে, পথিমধ্যে রামচন্দ্রকে দেখে গৃধিনী ও পেচক তাদের কলহে রামচন্দ্রকে মধ্যস্থতা করতে বলে।

মৃতাহারী দৈত্যরাজ্যের কথা ॥

অমরভুবন—স্বর্গলোক। **অঘোর**—গহন, গভীর। **পাখালিল**—প্রক্ষালন করল।

মূল রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে আছে, শূদ্র শম্বুক বধের পর রামচন্দ্র অগস্ত্যমুনির আশ্রমে যান এবং সেখানে শবাহারী এক নরপতির বিবরণ শোনেন। কৃত্তিবাস মূলেরই অনুসরণে রামচন্দ্রের শম্বুকবধের পর অগস্ত্যাশ্রমে গমন বর্ণনা করেছেন, তবে পথিমধ্যে এক গৃধিনী ও পেচকের কলহে রামচন্দ্রের বিচারকের দায়িত্ব পালনের উল্লেখ করেছেন। মূলে এ বৃত্তান্ত থাকলেও ঠিক এই দুই ঘটনার মাঝখানে কোন উল্লেখ নেই। উত্তরকাণ্ডের ৭৬শ-৭৯শ সর্গের বিষয়ানুসরণে 'মৃতাহারী দৈত্যরাজের কথা' বর্ণিত। মূলে শবাহারী রাজার নাম 'শ্বেত' এবং তিনি বিদর্ভদেশের অধিপতি ছিলেন, এরূপ উল্লেখ আছে। এই ঈষৎ পরিবর্তন ভিন্ন বাকী ঘটনা মূলানুগ, তবে বর্ণনা মূলের তুলনায় বিস্তৃত।

শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প ॥

কমললোচন—বিষ্ণু, এখানে রামচন্দ্র। **আখণ্ডল**—ইন্দ্র। **প্রকারে**—কৌশলে। **দোসর**—সঙ্গী।

মূল বামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৮৩শ-৮৬শ সর্গেব অনুসরণে কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্কল্পের কথা বর্ণনা করেছেন। আরম্ভ মূলানুগ। মূলে আছে, রামচন্দ্র প্রথমে রাজসূয় যজ্ঞ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ভরত তাতে 'পৃথিবীর রাজন্যবর্গের বিনাশ হতে পারে' এই কথা বলে রামচন্দ্রকে তা করতে নিষেধ করেন। ভরত রামচন্দ্রকে বলছেন—স ত্বমেবংবিধং যজ্ঞমাহর্তাসি কথং নৃপ। পৃথিব্যা রাজবংশানাং বিনাশো যত্র দৃশ্যতে ॥—৮৩।১৩ কৃত্তিবাসেও অনুরূপভাবে আছে—এত শুনি তিন ভাই করে হাহাকার। রাজসূয় যজ্ঞে হয় সবংশে সংহার ॥ ভরতের নিষেধবাক্যে রামচন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে বিরত হলেন। কৃত্তিবাস এই পর্যন্ত মূলানুসরণ ক'রে পরে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে কোথায় কে বিপন্ন হয়েছিল তার একটি দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়েছেন, যা মূলে নেই। এ অংশ সম্পূর্ণভাবে কৃত্তিবাসের কল্পনাপ্রসূত। এর পরে মূলে আছে, বৃত্রাসুর বধ করে ব্রহ্মহত্যার যে পাপ ইন্দ্রে বর্তেছিল, তা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলে দূর হয়েছিল, এ তথ্য লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে জানালে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে আগ্রহী হন। কৃত্তিবাসও মূলের অনুসরণে ইন্দ্রের বৃত্রবধ, ব্রহ্মহত্যাপাপ, অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রহ্মহত্যাপাপক্ষালন

এবং রামচন্দ্রের অশ্বমেধ :নর সঙ্কল্পের কথা লিখেছেন। এই অংশে কৃত্তিবাস মূলের প্রতি বিশ্বস্ত।

শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ ॥

বিশায়ের—বিশ্বকর্মার। **যজ্ঞকুণ্ড**—যজ্ঞাগ্নিস্থাপনার্থ কুণ্ড। **মেখলা**—হোমকুণ্ডের উপরিস্থিত মাটির বেষ্টনী। **আওয়ারী**—বাড়ী। **গাঁথনি**—গ্রন্থনা। **তণ্ডুল**—চাল। **শ্রীফলের কাঠ**—বেলকাঠ।

মূলরামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৯১শ সর্গের অনুসরণে 'শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞের আরম্ভ' বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মূলের তুলনায় কৃত্তিবাসের বর্ণনা বহুল বিস্তৃত। কৃত্তিবাস যজ্ঞশালার যে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন কিংবা অতিথি-অভ্যাগতের যে সুদীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন তা মূলে নেই। মূল রামায়ণে রামচন্দ্রকৃত অশ্বমেধ যজ্ঞের মহিমার বর্ণনা আছে। মূলে আছে—রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে 'দান কর, ভোজন কর, পান কর, লেহন কর' ছাড়া অন্য শব্দ হচ্ছে না। রাক্ষস ও বানরেরা শত সহস্র লোককে উত্তম ভক্ষ্য ও ভোজ্য দান করছেন···স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্ন ও বস্ত্রাদি নিরন্তর প্রদত্ত হলেও তাদের শেষ দেখা গেল না'। কৃত্তিবাসে এই যজ্ঞ-মহিমাটুকু নেই।

শত্রুঘ্নের দিগ্বিজয়, লবকুশের যজ্ঞাশ্ববন্ধন, লবকুশের সহিত যুদ্ধে শত্রুঘ্নের পতন, লবকুশের সহিত যুদ্ধে ভরত ও লক্ষ্মণের পতন, লবকুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধায়োজন, লবকুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধ, শ্রীরামের বিলাপ, লবকুশের সহিত যুদ্ধে শ্রীরামের পরাজয়, সীতার নিকট লবকুশের যুদ্ধবার্তা কথন, সীতার বিলাপ ও প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প, বাল্মীকির আগমন ও সসৈন্যে শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণদান ॥

তুরঙ্গ—ঘোড়া। **শোয়ার**—আরোহী। **জলদমণ্ডলে**—মেঘসমূহে। **ঝারা**—ঝালর। **সন্ধি**—সন্ধান। **বায়ুগতি**—বায়ুবেগে। **কোটে**—স্থানে। **প্রয়াণ**—প্রস্থান। **পূর্ণা**—পূর্ণাহুতি। **উদ্দেশ**—সন্ধান। **সাধ**—ইচ্ছা। **মো সবার সনে**—আমাদের সঙ্গে। **বাট**—পথ। **শোণিতের**—রক্তের। **টুটি**—পশ্চাৎপদ হই। **উখড়িয়া পড়ে**—দূর হতে ছিটকে এসে পড়ে। **জরজর**—জর্জর, ক্ষতবিক্ষত। **বরিষে**—বর্ষণ করে। **সৌমিত্রি**—সুমিত্রার নন্দন। শত্রুঘ্নের মাতার নাম সুমিত্রা। **এড়াইল**—কোনরকমে প্রাণ বাঁচাল।

সান্ধাইল বুকে—বুকের ভেতরে ঢুকল। **মুখ্য**—প্রধান। **অধিষ্ঠান**—উপস্থিত, হাজির। **সম্বরি**—সংবরণ ক'রে, থামিয়ে। **মহারোল**—চীৎকার। **থুয়ে গেল**—রেখে গেল। **বাক্‌ছলে**—বাক্‌চাতুরীতে। **দূর্বাদল শ্যাম**—দূর্বা ঘাসের মত গায়ের রঙ। **যমক**—যমজ। **তাহা শুনি……অন্তরে তরাস**—লব ও কুশের প্রশ্নে ভরত ও লক্ষ্মণ বাইরে পরিহাসভঙ্গী করলেও অন্তরে শত্রুঘ্নের মত বীরকে বধ করেছে বলে ভীত, কম্পিত। **তিমির**—আঁধার। **ওর**—তুলনা। **লক্ষ্মণজিৎ**—লক্ষ্মণকে জয়কারী। **উথাল**—বন্যা, স্রোত। **বাহুড়িয়া**—ফিরে। **অজয়জিৎ**—দুর্জয়কেও জয় করতে সমর্থ। **ব্যাজ**—বিলম্ব। **প্রতারে**—ঠকায়। **কৃতাঞ্জলি**—যোড়হাতে। **ছাবালের**—বালকের। **বাকল**—গাছের ছাল। **তিনকোটি চলে……তিনকোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ**—কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে 'বহু' বোঝাতে যে কোন সংখ্যা ব্যবহার করেছেন। বহুদিন তপস্যা বলতে দশহাজার বৎসর তপস্যা, বহুদিন রাজত্ব বলতে ষাটহাজার বৎসর রাজত্ব। বহু সেনা বলতে—তিনকোটি, ত্রিশকোটি, আশীকোটি—কোন সম্ভাব্য অসম্ভাব্যের বালাই রাখেননি। সাধারণ গ্রাম্য শ্রোতা অবশ্য এই সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত না—এটাই কবির পক্ষে সুবিধা ছিল। **কটক হইল পার…… কটকের পদভরে**—এত অসংখ্য সেনা নদী পার হয়েছে যে, নদী পার হবার কালে তাদের পায়ে পায়ে যে জল লেগেছে, তাতে নদী শুকিয়ে গেছে। এ এক অতিরঞ্জিত বর্ণনার দৃষ্টান্ত বলা চলে। **পাড়িবা প্রমাদ**—বিপদের সৃষ্টি করবে। **বেড়ো**—বেষ্টন করো। **দুই ভিতে**—দুদিকে। **যুঝে**—যুদ্ধ করে। **কপি**—বানর। **পাদপ**—গাছ। **চোখ চোখ**—তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ। **কদলীবৃক্ষ**—কলাগাছ। **এনু**—এলাম। **বিরথী**—রথহীন। **চিকুর বাণ**—বিদ্যুৎবাণ। **সাঙ্গি**—কোন দণ্ডের সঙ্গে ঝুলিয়ে দুই বা চারিজনে বাহিত করে। **দ্বারে না সান্ধায়**—দরজায় ঢোকে না। **হিল্লোল**—ঢেউ। **উতরোলী**—উদ্বিগ্না, ব্যাকুলা। **মৃত্যুজীবী**—যা মৃতকে বাঁচায়। **পাসরিল**—বিস্মৃত হল।

মূল রামায়ণে সভ্রাতৃক রামচন্দ্রের সঙ্গে লবকুশের যুদ্ধবৃত্তান্ত নেই। কবি কৃত্তিবাস নিজেই একথা স্বীকার করে বলেছেন—'এসব গাইল গীত জৈমিনি ভারতে'। লবকুশের যুদ্ধবিবরণ বিস্তৃতভাবে জৈমিনি ভারত (২৯-৩৬শ অধ্যায়) এবং পদ্মপুরাণ (পাতালখণ্ড) প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে। কৃত্তিবাস তাহা-ই অনুসরণ করেছেন। লবকুশযুদ্ধবৃত্তান্তের মধ্যে যে নাটকীয়তা ফুটে উঠেছে, তা পরম

উপভোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, কৃত্তিবাস নানা পুরাণ থেকে বাঙ্গালীর পক্ষে মুখরোচক অনেক নতুন কাহিনী জুড়েছেন এবং শ্রোতাদের যা রোচনীয় হবে না তা বাদ দিয়েছেন।

লবকুশ কর্তৃক রামায়ণ গান ॥

সংহতি—সঙ্গে। **তথি**—তাহাতে। **বিভাবরী**—রাত্রি। **ভানুমান**—সূর্য। **পীতাম্বর**—নীল বস্ত্র। **তৈলের ভিতরে……আসিয়া ভরত**—দশরথের মৃত্যুকালে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বনগমন করেছিলেন, ভরত ছিলেন মাতুলালয়ে। মুখাগ্নি ও দাহাদিক্রিয়া অনুষ্ঠানে ভরতকে মাতুলালয় থেকে না আনা পর্যন্ত দশরথের শব তৈলের মধ্যে সংরক্ষিত করা হয়েছিল। **পিতৃপরমাই**—পিতৃ-পরমায়ু।

জৈমিনি ভারতের অনুসরণে সভ্রাতৃক রামচন্দ্রের সঙ্গে লবকুশযুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণনার পর কৃত্তিবাস আবার বাল্মীকিকেই অনুসরণ করেছেন। মূল রামায়ণে আছে, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে লবকুশসহ বাল্মীকি উপস্থিত হন এবং বাল্মীকির নির্দেশে ভ্রাতাদ্বয় রামায়ণ গান শোনান। মূলে আছে (উত্তরকাণ্ড, ৯৩তম সর্গ)—রামস্য ভবনদ্বারি যত্র কর্ম চ কুর্বতে। ঋত্বিজামগ্রতশ্চৈব তত্র গেয়ং বিশেষতঃ॥ অর্থাৎ রামচন্দ্রের গৃহদ্বারে ও যেস্থানে যজ্ঞ হচ্ছে, সেখানে গিয়ে ঋষিদের সামনে রামায়ণ গান করো। কৃত্তিবাসেও এরই অনুকরণ—গীতবিদ্যা রামায়ণ শিখিলে দুজন। শ্রীরামের আগে কালি গেয়ো রামায়ণ॥ আক্ষরিকভাবে অনুসরণ না হলেও মোটামুটিভাবে মূল রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৯৩ ও ৯৪তম সর্গের বিষয়বস্তুকেই কৃত্তিবাস অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। লবকুশের নির্লোভ চরিত্র, যা মূলে রয়েছে, কৃত্তিবাস তা বজায় রেখেছেন। মূলে আছে, রামচন্দ্রের ধনদানের নির্দেশে দুই ভ্রাতা এবংরূপ বলেছেন—বন্যেন ফলমূলেন নিরতৌ বনবাসিনৌ। সুবর্ণেন হিরণ্যেন কিং করিষ্যাবহে বনে॥ অর্থাৎ আমরা বনবাসী, ফলমূল খেয়েই জীবিকানির্বাহ করি—সুবর্ণ নিয়ে কি করব? কৃত্তিবাসেও অবিকলভাবে লব ও কুশ বলেছেন—কি করিবে ধনে বস্ত্রে আর অলঙ্কারে। বস্ত্র অলঙ্কার রাখ আপন ভাণ্ডারে॥

সীতার পাতাল প্রবেশ ॥

কমলা—লক্ষ্মী। **তনয়া**—কন্যা। **মেলানি**—বিদায়-কালীন প্রীতিসম্ভাষণ। **উলি**—নেমে এসে। **বিজুলি**—বিদ্যুৎ। **ছাওয়ালে**—পুত্রে।

মূল রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৯৫, ৯৬ ও ৯৭তম সর্গের অনুসরণে বর্ণিত।

মূলের সীতাচরিত্রের যে ধৈর্য্যশীলা সর্বংসহারূপ কৃত্তিবাসেও তাই অনুসৃত। তবে মূলে সীতার মুখে রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে কোন তিরস্কার বর্ষিত হয়নি—কৃত্তিবাসের সীতা তাঁর বারংবার পরীক্ষা গ্রহণের জন্য রামচন্দ্রকে ভর্ৎসিত করেছেন। কৃত্তিবাসের সীতার চরিত্রে ঈষৎ উগ্রতার আভাস এখানে লক্ষণীয়।

লবকুশের বিলাপ ও ব্রহ্মাদির উপদেশ ॥

ছাবালে—সন্তানে। **পুতলী**—পুতুল। **তিতিল**—আর্দ্র হল। **পাতিয়ান**—আশ্বাস, সান্ত্বনা ॥ **অনুবন্ধ**—উদ্যম, চেষ্টা। **যজ্ঞেতে জনক রাজা……শাশুড়ী সম্বন্ধ**—রাজা জনক হলকর্ষণকালে ভূমি থেকে সীতাকে প্রাপ্ত হন। ভূমি থেকে প্রাপ্তা বলে বসুমতী সীতার জননী। বসুমতীর কন্যা সীতাকে রামচন্দ্র বিবাহ করায় বসুমতী সম্পর্কে রামচন্দ্রের শাশুড়ী। মূল বামায়ণেও (উত্তরকাণ্ড, ৯৮তম সর্গ) রামচন্দ্র বলছেন 'কামং শ্বশ্রূর্মমৈব ত্বং ত্বৎসকাশাত্তু মৈথিলী। কর্ষতা ফালহস্তেন জনকেনোদ্ধৃতা পুরা ॥' অর্থাৎ পূর্বে হলহস্ত জনক কর্ষণ করতে করতে তোমার গর্ভ থেকে সীতাকে লাভ করেছিলেন বলে তুমি আমার শ্বশ্রূ।

মূল রামায়ণে সীতার পাতাল প্রবেশে রামচন্দ্রের বিলাপ বর্ণিত হয়েছে। লবকুশের কোন বিলাপ বর্ণিত হয় নি। লবকুশের বিলাপ কৃত্তিবাসের কবিকল্পনার ফল। মাতৃহারা অবোধ বালকদের আর্তি স্বাভাবিকভাবে করুণ ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন ও পুনর্বার রামায়ণ গান, সীতাবিরহে শ্রীরামের খেদোক্তি ॥

প্রভাতকৃত্য—প্রভাতের করণীয় কাজ। **বিহনে**—অভাবে।

সীতার পাতালপ্রবেশের পর রামচন্দ্রের নির্দেশে লবকুশের পুনরায় রামায়ণ গান উত্তরকাণ্ডের (৯৯তম সর্গ) অনুসরণেই বর্ণিত। রামচন্দ্রের সীতাবিরহসন্তপ্ত রূপটি কৃত্তিবাস চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন এখানে। মূলেও (উত্তরকাণ্ড ৯৯তম সর্গ) সীতাবিয়োগকাতর রামচন্দ্রের অনুরূপ চিত্র আঁকা হয়েছে। রামচন্দ্র পুনরায় দার পরিগ্রহ না করে সীতার স্বর্ণমূর্তির সাহায্যেই যজ্ঞের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করেছেন—ন সীতায়াঃ পরাং ভার্য্যাং বব্রে স রঘুনন্দনঃ। যজ্ঞে যজ্ঞে চ পত্ন্যর্থং জানকী কাঞ্চনীভবৎ ॥ অর্থাৎ প্রত্যেক যজ্ঞে যখন ধর্মপত্নীর আবশ্যকতা দেখতেন, তখন তিনি স্বর্ণের সীতাপ্রতিমা নির্মাণ করে যজ্ঞাদি নির্বাহ করতেন।

ভরতকর্তৃক কেকয়দেশে তিনকোটি গন্ধর্ববধ ও শ্রীরামাদির অষ্টপুত্রের রাজ্যাভিষেক ॥

দণ্ডপাণি—যম। **ব্যাহতি**—নিবারণ, নিষেধ। **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ। **প্রভাতা হইল**—ভোর হল। **দুর্নীত**—দুর্বিনীত। **মহামার**—হৈ চৈ, গণ্ডগোল।

মূল রামায়ণে (উত্তরকাণ্ড ১০০, ১০১ ও ১০২তম সর্গে) ভরতের গন্ধর্বদেশ আক্রমণের ও রামাদির পুত্রের রাজ্যাভিষেকের বৃত্তান্ত আছে। কবি কৃত্তিবাস মূলেরই অনুসরণে এই বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

কালপুরুষের আগমন ও লক্ষ্মণবর্জন, শ্রীরাম ভরত ও শত্রুঘ্নের স্বর্গারোহণ ॥

দুয়ারী—দ্বাররক্ষক। **বিরলে**—নির্জনে। **কুপিল**—ক্রুদ্ধ হল। **বনিতা**—স্ত্রীলোক। **সুসার**—সুন্দর, সারবান্। **বর্জে**—ত্যাগ করে। **এড়**—ত্যাগ কর। **লোহ**—অশ্রু। **বাঞ্ছা**—ইচ্ছা। **লড়ি**—লাঠি। **খরশান**—ক্ষুরধার। **দুন্দুভি**—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

মূলের আরম্ভের অনুরূপ কৃত্তিবাস সূচনা করেছেন। কৃত্তিবাসে আছে—পরে কালপুরুষ সে সংসারবিনাশী। অযোধ্যায় প্রবেশিল হইয়া সন্ন্যাসী ॥ রামায়ণেও (উত্তরকাণ্ড, ১০৩তম সর্গ) আছে—কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রামে ধর্মপরেস্থিতে। কালস্তাপসরূপেণ রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥ অর্থাৎ রামচন্দ্রের এভাবে বহুদিন কেটে গেল। এরপর একদিন কাল তাপসবেশে রাজদ্বারে এসে হাজির হলেন। উত্তরকাণ্ডের মোট আটটি সর্গের (১০৩-১১০তম সর্গ) বিষয়বস্তু এই 'শিকলিগুলিতে' মূলানুগ-ভাবে বর্ণিত। কালপুরুষের রামচন্দ্রের সন্নিধানে আগমন, রামচন্দ্রকে ব্রহ্মার সংবাদকথন এবং রামচন্দ্রের তা পালনে অঙ্গীকার, দুর্বাসার আগমন, দুর্বাসার শাপ ভয়ে দ্বারী লক্ষ্মণের রামের নিকট গমন, প্রতিশ্রুতিমত লক্ষ্মণবিসর্জন, লক্ষ্মণের দেহত্যাগান্তে রামচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ আকাঙ্ক্ষা, তৎসংবাদে অযোধ্যাআগত বিভীষণ ও হনুমানকে পৃথিবীতে অবস্থানের জন্য রামচন্দ্রের আদেশ, ভরত ও শত্রুঘ্ন সহ সরযূজলে স্নানপূর্বক তনুত্যাগ—বাল্মীকির এই ক্রমপারম্পর্য কৃত্তিবাস আশ্চর্য-জনকভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করেননি। সুতরাং এইক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ মোটেই প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু অন্যস্থলে কৃত্তিবাস মূলের বর্ণিত বিষয়বস্তুর মধ্যে যেমন নিজস্ব কল্পনা-সৃষ্ট কাহিনী বা অন্য কোন পুরাণ-কাহিনী সংগ্রথিত করেছেন, উত্তরকাণ্ডের সমাপ্তিপর্বে তা করেননি।

মূল রামায়ণে একেবারে শেষ সর্গে (১১১তম) রামায়ণ-পাঠ ও রামগান শ্রবণ ও কীর্তনের যে মাহাত্ম্য বর্ণিত, কৃত্তিবাস তারই প্রতিধ্বনি করেছেন।

মূলে আছে—অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো লভতে ধনম্।

সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত পাদমপ্যস্য যঃ পঠেৎ ॥
পাপান্যপি চ যঃ কুর্য্যাদহন্যহনি মানবঃ ॥
পঠত্যেকমপি শ্লোকং পাপাৎ স পরিমুচ্যতে ॥...
চিন্তয়েদ্ রাঘবং নিত্যং শ্রেয়ঃ প্রাপ্তুং য ইচ্ছতি।
শ্রাবয়েদিমাখ্যানং ব্রাহ্মণেভ্যো দিনে দিনে ॥
যস্ত্বিদং রঘুনাথস্য চরিতং সকলং পঠেৎ।
সোঽসুক্ষয়ে বিষ্ণুলোকং গচ্ছত্যেব ন সংশয়ঃ ॥
পিতা পিতামহস্তস্য তথৈব প্রপিতামহঃ।
তৎপিতা তৎপিতা চৈব বিষ্ণুং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥
চতুর্ব্বর্গপ্রদং নিত্যং চরিতং রাঘবস্য তু।
তস্মাদ্ যত্নবতা নিত্যং শ্রোতব্যং পরমং সদা ॥
শৃণ্বন্ রামায়ণং ভক্ত্যা যঃ পাদং পদমেব বা।
স যাতি ব্রহ্মণঃ স্থানং ব্রহ্মণা পূজ্যতে সদা ॥

কৃত্তিবাসে আছে—যেইজন রামায়ণ করিবে শ্রবণ।

পরলোকে এই স্বর্গে করিবে গমন ॥...
পুণ্য বৃদ্ধি হয় রামে করিলে স্মরণ।
পাপে পাপী মুক্ত হয় শুনি রামায়ণ ॥
চারিবেদ সহস্রনামে যত ফল হয়।
রামনামে তার কোটি গুণ ফলোদয় ॥
রামনাম লইতে যে করে অভিলাষ।
সর্বপাপে মুক্ত সে বৈকুণ্ঠে করে বাস ॥
অপুত্রক লোক শুনি পায় পুত্রফল।
সপ্তকাণ্ড শুনি পায় অশ্বমেধ ফল ॥